সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী সংখ্যা ৮০

হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
ও
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
১৩৩৯

মূল্য		বাঁধাই	কাগজের মলাট
	পরিষদের সদস্য-পক্ষে	২৲	১।০
	শাখা-পরিষৎ-সদস্য-পক্ষে	২।০	১৸০
	সাধারণের পক্ষে	২॥০	২৲

শ্রীপতি প্রেসে—১ হইতে ৪ ফর্ম্মা,
অবশিষ্টাংশ
২নং বেথুন রো, ভারত মিহির যন্ত্র হইতে
শ্রীযুগলচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

সম্পাদকীয় নিবেদন

'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ১৩৩৫ সালের ২৯এ আষাঢ় তারিখে যে প্রস্তাব বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সমক্ষে উপস্থাপিত ও পরিষৎ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, এত দিনে, সুদীর্ঘ চারি বৎসর কাল পরে, তাহা পূর্ণ হইল।

এই চারি বৎসর মধ্যে যে উদ্দেশ্যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল, দৈব-দুর্ব্বিপাকে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম জন্ম-দিবসের স্মারক-স্বরূপ লেখমালার প্রবন্ধাবলী তাঁহাকে উৎসর্গীকৃত করিবার কথা ছিল। গভীর পরিতাপের বিষয়, অনপনেয় অভাব ও অনুপপত্তি হেতু সমগ্র প্রবন্ধাবলী মুদ্রিত হইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবদ্দশায় তাঁহাকে অর্পণ করা ঘটিয়া উঠিল না। বিগত ১৩৩৮ সালের ১লা অগ্রহায়ণ দিবসে শাস্ত্রী মহাশয় দেহরক্ষা করেন। তবে আমাদের পক্ষে এইটুকু আত্ম-প্রসাদের বিষয় যে, লেখমালা-গ্রন্থের প্রথম খণ্ড শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রীচরণে অর্পণ করা সম্ভবপর হইয়াছিল, তিনি পরিষদের এই উপহার সাদরে স্বীকার করিয়াছিলেন. সমগ্র প্রবন্ধমালা প্রকাশে বিলম্ব দেখিয়া, পরিষৎ-নিযুক্ত 'হরপ্রসাদ-বর্দ্ধাপন-সমিতি' ১৩৩৭ সালের ১৩ই বৈশাখ তারিখে স্থির করেন যে, প্রাপ্ত প্রবন্ধের যতগুলি তত্তাবৎ মুদ্রিত হইয়াছিল, সেইগুলিকে লইয়া সংবর্দ্ধন-লেখমালার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হউক, এবং এই মুদ্রিত ও প্রকাশিত প্রথম খণ্ড, তথা প্রাপ্ত অবশিষ্ট অমুদ্রিত প্রবন্ধ, শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে অর্পিত হউক। তদনুসারে ১৩৩৮ সালের ১৪ই ভাদ্র তারিখে প্রাতে পরিষৎ-সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া পরিষদের প্রতিনিধি-স্বরূপ কতকগুলি কর্ম্মী ও সদস্য (ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অধুনা স্বর্গত রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, ডাক্তার শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাশ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা প্রভৃতি ছিলেন।) শাস্ত্রী মহাশয়ের পটলডাঙ্গাস্থিত বাটীতে মিলিত হইয়া লেখমালার মুদ্রিত প্রথম খণ্ড ও

অমুদ্রিত দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধাবলি কারুকার্য্য-খচিত একখানি রৌপ্য-পাত্রে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে মাল্য-চন্দন-বিভূষিত করেন, ও ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহাকে শুদ্ধ খদ্দরের ধুতি ও চাদর উপহার দেন, এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের সময়োপযোগী প্রশস্তিবাদ করেন। অতঃপর কবিরাজ-শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ একখণ্ড মোহর উপহার দেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সুচিত্রিত শঙ্খ ও পদ্ম উপহার দেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ শাস্ত্রী মহাশয়কে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ও যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করেন, এবং সমাগত সজ্জনগণকে মিষ্টমুখ করান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ক্ষুদ্র হইলেও আন্তরিকতায় পূর্ণ ছিল বলিয়া সকলেরই মনোজ্ঞ হইয়াছিল। আমরা ঈপ্সিত পাত্রের নিকট এই ভাবে অর্পণ করিতে সমর্থ হওয়ায় লেখমালার প্রস্তুতকরণ ও মুদ্রাপণ কথঞ্চিৎ সার্থক হইয়াছে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের বয়স ও তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার অনুরাগী মিত্র ও স্নেহাস্পদগণের যে সদা-জাগ্রত আশঙ্কা ছিল, তাহা সমূলক প্রমাণিত হইল। প্রস্তাবিত জন্মদিবস-স্মারক গ্রন্থ কার্য্যতঃ এক্ষণে তাঁহার স্মৃতি-তর্পণের উপায়ন-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙ্গালী জাতির পূর্ব্ব কথা, তথা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও চর্য্যা আলোচনায় শাস্ত্রী মহাশয় অনন্যসাধারণ প্রতিভা এবং কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি যথাশক্তি চিরস্থায়ী করিবার জন্য পরিষৎ চেষ্টিত হইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের তিরোধানের প্রায় [illegible] মাস পরে 'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা'র এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ দ্বারা আমরা কার্য্যগত্যা হরপ্রসাদ-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতির প্রস্তাবিত কার্য্যেরই উদ্বোধন করিতেছি।

পুস্তক সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এক্ষণে যাঁহাদের উৎসাহ ও সহায়তা ভিন্ন এই গ্রন্থ প্রস্তুত ও প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না, তাঁহাদিগকে আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে তথা ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের নিজ পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। পরিষদের ১৩৩৫ সালের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি প্রথমেই শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবটি সোৎসাহে গ্রহণ করেন। সমিতির সদস্যগণের এই আগ্রহ, অনুষ্ঠানটিকে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান প্রেরণা দেয়। তৎপরে সম্পাদকদ্বয়ের প্রবন্ধের জন্য আহ্বান বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রেরিত হইলে, যে-সকল মনীষী প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়া প্রস্তাবটিকে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের নিকট বিশেষ

ধন্যবাদার্হ। তদনন্তর এই গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধ-লেখকগণের ও দাতৃগণের নাম পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীতে প্রবন্ধকারগণের নাম যথারীতি দেওয়া হইয়াছে, এবং নিম্নে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য দাতৃগণের নাম প্রদত্ত হইল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ 'হরপ্রসাদ-বর্দ্ধাপন-সমিতি'-র সদস্যরূপে কার্য্য করেন,—

১। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এম্. এ., ডি. এস্-সি., পি-এইচ. ডি.

২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম্. এ, বি. এল.

৩। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

৪। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

৬। ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম. এস্-সি, এম্ ডি, এফ. জেড. এস.

৭। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ, ডি. লিট্.

৯। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম্. এ., বি. এল, পি-এইচ্. ডি.—(আহ্বানকারী)।

ইঁহারা সকলেই যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য সম্পাদকদ্বয় প্রত্যেকেরই নিকট ঋণী। এতদ্ভিন্ন পরিষদের অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাশ সংবর্দ্ধন-লেখমালার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত ও প্রকাশিত বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরেজী প্রবন্ধ ও পত্রিকার তালিকা তথা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী পুস্তকের মুখবন্ধে দিবার কথা স্থির হয়। এই তালিকা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম্. এ. ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়-দ্বয় প্রস্তুত করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের বা তাঁহার পুত্রগণের প্রস্তুত কোনও সম্পূর্ণ তালিকা ছিল না; সুতরাং সুপরিচিত ও অল্পপরিচিত পত্রিকাদি হইতে যথাসাধ্য অন্বেষণ করিয়া প্রবন্ধ-পঞ্জী প্রস্তুত করা হইয়াছে। হয়তো পৃথক্ প্রকাশিত বহু বাঙ্গালা ও ইংরেজী প্রবন্ধ, এবং আমাদের দৃষ্টি পথের অন্তরালে অবস্থিত পত্র-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ আমাদের এই তালিকায় অনুল্লিখিত রহিয়া গেল। আশা করি, সুধীবৃন্দ এই বিষয়ে ত্রুটী পাইলে মার্জ্জনা করিবেন। অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া যাঁহার নানাবিষয়িণী সাহিত্য ও ইতিহাস সেবা চলিয়াছিল, তাঁহার সেই সেবার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করার গুরুত্ব আশা করি, সকলেই উপলব্ধি করিবেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী লিখিবার চেষ্টা আমরা করি নাই,

সে কার্য্য ভবিষ্যতে কোনও যোগ্যতর ব্যক্তি করিবেন। উপস্থিত আমরা তাঁহার বহুকর্ম্মময় জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত দিগ্‌দর্শনী মাত্র উপস্থাপিত করিতেছি।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা'র জন্য ভূমিকা রচনা করিয়া দিয়া এই লেখমালার বিশেষ গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। এই অবসরে আমরা তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

বিশেষ দুঃখের সহিত আমাদের জানাইতে হইতেছে যে, দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য যাঁহারা প্রবন্ধ দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম লেখক অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন।

বর্দ্ধাপন-সমিতির ও আমাদের কর্ত্তব্য পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গ হইল। কার্য্যভার দায়িত্বপূর্ণ ছিল, এবং পরের সহায়তার নিতান্ত মুখাপেক্ষী ছিল। আমরা সকলের নিকট হইতে পূর্ণ সহযোগিতা পাইয়াছি; তথাপি আমাদের অনিচ্ছাকৃত কতকগুলি ক্রটী রহিয়া গেল, এবং কতকগুলি অনিবার্য্য কারণে লেখমালা প্রকাশে এত বিলম্ব ঘটিল। এজন্য জনসাধারণের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। তবে এই বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিতেছি যে, এরূপ বিদ্যাসম্ভারময় উপায়ন লইয়া বিদ্যা ও শিক্ষা জগতের একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জীবনব্রত উদ্‌যাপনের ও তাঁহার স্মৃতিসংরক্ষণের প্রয়াস আমাদের মাতৃভাষায় এই প্রথম; এই কথা মনে রাখিয়া এই উদ্যমের ক্রটী সম্বন্ধে পাঠকগণ স্নেহশীল ভাবে সমালোচনা করিবেন।

আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের পুণ্য স্মৃতি মানসপথে আনয়ন করিয়া ও তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া এক্ষণে বিদায় লইতেছি। ইতি। ১৪ই আশ্বিন ১৩৩৯, মহালয়া।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সী-আই-ই, এম্-এ, ডী-লিট্

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বালক-কালে মাণিকতলায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঘরে আমার যাওয়া-আসা ছিল। গাম্ভীর্য্যে বিনয়ে মিশ্রিত তাঁর বুদ্ধি-উজ্জ্বল সহজ আভিজাত্যে আমি মুগ্ধ ছিলুম। তাঁর কাছে নিজের জোরে প্রশ্রয় দাবী করিনি, তিনি স্নেহ ক'রে আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। কথা প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম সর্ব্বপ্রথমে আমি তাঁরই কাছে শুনেছিলেম। অনুভব ক'রেছিলেম শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সে সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটির কাজে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁর সহযোগিতা ক'রতেন। তাঁদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে তিনি যে বিশেষভাবে আদর ক'রেছিলেন পরেও তার প্রমাণ দেখেছি। নেপালী বৌদ্ধসাহিত্য গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, I feel deeply obliged to him for the timely aid he rendered me, and tender him my cordial acknowledgments for it. His thorough mastery of the Sanskrit language and knowledge of European literature fully qualified him for the task; and he did his work to my full satisfaction.

এখানে রাজেন্দ্রলালের উল্লেখ করবার কারণ এই যে, আমার মনে এই দুইজনের চরিত-চিত্র মিলিত হ'য়ে আছে। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা,—যে কোনো বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল গ্রন্থিগুলি অনায়াসেই মোচন ক'রে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হ'য়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধন-প্রণালী সম্মিলিত হ'য়ে উৎকর্ষলাভ ক'রেছিল। অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কেবল সংগ্রহ ক'রতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত ক'রতে পারেন না; তাঁরা খনি থেকে তোলা ধাতুপিণ্ডটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক্ ক'রতে শেখেননি ব'লেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারী করেন। হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন ক'রে নিতে শিখেছিল। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর ছিল না। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই, এইটেই আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখ্‌তে পাই,—অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশী মার্কা পাবার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে, এবং তাঁর ছিল দর্শনশক্তি।

যে কোনো বিষয় শাস্ত্রী মহাশয় হাতে নিয়েছেন, তাকে সুস্পষ্ট ক'রে দেখেছেন ও সুস্পষ্ট ক'রে দেখিয়েছেন। তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না। বিদ্যার সংগ্রহ ব্যাপার অধ্যবসায়ের দ্বারা হয়, কিন্তু তাকে নিজের ও অন্যের মনে সহজ ক'রে তোলা ধী-শক্তির কাজ। এই জিনিষটি বড়ো বিরল। তবু, জ্ঞানের বিষয় প্রভূত পরিমাণে সংগ্রহ করার যে পাণ্ডিত্য তার জন্যেও দৃঢ় নিষ্ঠার প্রয়োজন; আমাদের আধুনিক শিক্ষাবিধির গুণে সেই নিষ্ঠার চর্চ্চাও শিথিল। ধ্বনি দ্বিগুণিত করার একরকম যন্ত্র আজকাল বেরিয়েছে, তাতে স্বাভাবিক গলার জোর না থাকলেও আওয়াজে আসর ভরিয়ে দেওয়া যায়। সেই রকম উপায়েই অল্প জানাকে তুমুল ক'রে ঘোষণা করা এখন সহজ হ'য়েছে। তাই বিদ্যার সাধনা হাল্‌কা হয়ে উঠ্‌ল, বুদ্ধির তপস্যাও ক্ষীণবল। যাকে বলে মনীষা, মনের যেটা চরিত্রবল, সেইটের অভাব ঘটেছে।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য-পরিষদে হরপ্রসাদ অনেকদিন ধ'রে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতায় এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাভাণ্ডারে নিজের বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা ক'রেছিলেন, সাহিত্য-পরিষৎকে তারই পরিণত ফল দিয়ে এতকাল সতেজ ক'রে রেখেছিলেন। যাঁদের কাছ থেকে দুর্লভদান আমরা পেয়ে থাকি, কোনো মতে মনে ক'রতে পারিনে যে, বিধাতার দাক্ষিণ্যবাহী তাঁদের বাহুকে মৃত্যু কোনোদিনই নিশ্চেষ্ট ক'রতে পারে। সেইজন্যে যে বয়সেই তাঁদের মৃত্যু হোক্, দেশ অকাল মৃত্যুর শোক পায়, তার কারণ আলোক-নির্ব্বাণের মুহূর্ত্তে পরবর্ত্তীদের মধ্যে তাঁদের জীবনের অনুবৃত্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তবু বেদনার মধ্যেও মনে আশা রাখ্‌তে হবে যে, আজ যাঁর স্থান শূন্য, একদা যে আসন তিনি অধিকার ক'রেছিলেন সেই আসনেরই মধ্যে শক্তি সঞ্চার ক'রে গেছেন, এবং অতীত কালকে যিনি ধন্য ক'রেছেন ভাবী কালকেও তিনি অলক্ষ্যভাবে চরিতার্থ ক'রবেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষ উপলক্ষে বিশিষ্ট লোকগণের নিকট থেকে ভারত-তত্ত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ সংগ্রহ ক'রে লেখমালা-গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই কাজের ভার গ্রহণ করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবিত-কালে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বা'র হ'য়েছিল। তাঁর পরলোক গমনের প্রায় এক বৎসর পরে এখন এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এই সাধু কার্য্যের দ্বারা পরিষৎ যে আদর্শ দেখালেন, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তা সার্থক হোক্।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য দাতৃগণের নাম

১। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ... ... ১৫৲

২। আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এম. এ., ডি. এস-সি., পি-এইচ. ডি. ... ১০০৲

শিবাজী ও জয়সিংহ

রমেশচন্দ্র দত্তের "জীবনপ্রভাতে" রাজপুত সেনানী রাজা জয়সিংহের সহিত মারাঠা বীর শিবাজীর সাক্ষাৎ এবং রাজনৈতিক আলোচনার কথা সকলেই পড়িয়াছেন। এই বিবরণ কাল্পনিক, যদিও ইহাতে ইতিহাসের সত্য এবং সম্ভবপরতা লঙ্ঘন করা হয় নাই। কিন্তু জয়সিংহ ও আওরংজীবের মধ্যে এই সময়ে যে সব পত্র বিনিময় হয় (ফারসী ভাষায়), তাহা রক্ষা পাইয়াছে। শিবাজীর সহিত জয়সিংহের যুদ্ধ ও সন্ধি, জয়সিংহের অধীনে শিবাজীর বিজাপুর আক্রমণ, শিবাজীর আগ্রায় গিয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ এবং তথায় নজরবন্দ হইয়া থাকা, তাঁহার প্রতি কি নীতি অবলম্বন করা উচিত, তাহা লইয়া সম্রাট্ ও সেনাপতির মধ্যে তর্ক,—এই সব বিষয়ের অতি বিস্তৃত ও সত্য সমসাময়িক ও আভ্যন্তরীণ বিবরণ এই চিঠিগুলি হইতে পাওয়া যায়। জয়সিংহ যে চিঠিগুলি লেখেন, তাহা তাঁহার মুন্শী উদয়রাজের পুস্তক "হফ্‌ৎ-আঞ্জুমন্"-এর হস্তলিপিতে সংগৃহীত হইয়াছে; এগুলির নকল জয়পুর রাজ-দফ্‌তরেই নাই! কিন্তু বাদশাহ্ জয়সিংহকে যে উত্তর দেন, তাহার কতকগুলি জয়পুরে আছে (সবগুলি নাই); আর কতকগুলি প্যারী নগরের জাতীয় পুস্তকালয়ে রক্ষা পাইয়াছে, এবং দু'চারখানি বিবিধ পত্রসংগ্রহের দুইখানি হস্তলিপিতে বিদ্যমান আছে। এই সব উপাদান হইতে পূর্ব্বোক্ত দুই মহাপুরুষের প্রকৃত বিবরণ রচনা করা সহজ।

শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযানের নেতাপদ লাভ করিয়া (৩০ সেপ্টেম্বর ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) জয়সিংহ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। আফজল খাঁকে হত্যা এবং শায়েস্তা খাঁকে আহত করিবার ফলে এই বিশ্বাস দেশময় বিস্তৃত হইয়াছিল যে, "শিবাজী প্রবল দাগাবাজ, জাদুবিদ্যা জানে; বায়ুর উপর দিয়া ৪০ গজ উল্লঙ্ঘন করিয়া শত্রুর ঘাড়ে পড়িতে পারে। [সভাসদ বখর, ৪র্থ সংস্করণ, ৪৮ পৃ]। সে যুগের সুরটের ইংরেজ বণিক্ও লিখিয়াছেন :— "Report hath made him [*i.e.*, Shivaji] an airy body, and added wings; or else it were impossible he could be at so many places as he is said to

be, all at one time. They ascribe to him to perform more than a Herculean labour, that he is become the talk of all conditions of people." [*Factory Records*, India Office, Surat, Vol. 86.]

এরূপ শত্রুর ইন্দ্রজাল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দেবতা, অপদেবতা, গ্রহনক্ষত্র, সকলকেই তুষ্ট করিতে হয়। অতএব জয়সিংহ যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বড় বড় ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকিয়া উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা উত্তর দিলেন "দেবীপ্রয়োগী অনুষ্ঠানগুলি করিবেন, তবে সফল হইবেন।" তখন জয়সিংহ আজ্ঞা দিলেন, "কোটী চণ্ডী করিবে, এবং এগার কোটী লিঙ্গ করিবে। কামনার্থ বগলামুখী কালরাত্রী প্রীত্যর্থ জপ করিবে। এই সব অনুষ্ঠান কর।" চারি শত ব্রাহ্মণ এই সব অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন, প্রত্যহ ক্রিয়া চলিতে লাগিল, তজ্জন্য দুই কোটী টাকা পৃথক্ করিয়া রাখা হইল। তিন মাস ধরিয়া কার্য্যের পর সিদ্ধি হইল। রাজা অনুষ্ঠানের পূর্ণাহুতি করিয়া ব্রাহ্মণদের দানদক্ষিণা দিয়া সন্তর্পণ করিলেন। [সভাসদ, ৩৭ পৃ]

১৬৬৫ সালের প্রথমেই উত্তরভারত হইতে যাত্রা করিয়া জয়সিংহ অবিলম্বে পুণায় পৌছিলেন (৩রা মার্চ্চ)। এই শহর পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মুঘলদের অধিকারে আসিয়াছিল। তথায় এগার দিনের মধ্যে সৈন্য, রসদ, শাসন প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া জয়সিংহ পুরন্দর গিরিদুর্গের নিকট অগ্রসর হইলেন। ইহা পুণা সহরের ২৪ মাইল দক্ষিণে। ৩১এ মার্চ্চ ইহার অবরোধ আরম্ভ হইল। এক পক্ষের মধ্যেই আফঘানবীর দিলির খাঁ এবং সহকারী রাজপুত সৈন্যের অদম্য সাহস ও পরিশ্রমের ফলে বজ্রগড় (অপর নাম রুদ্রমালা) নামক পার্শ্ববর্ত্তী দুর্গটি অধিকৃত হইল (১৪ এপ্রিল)। তাহার দেড় মাস পরে নিজ পুরন্দরের নিম্নভাগের পাঁচটি বুরুজ মুঘলেরা জয় করিল।

এখন পুরন্দরের পতন অবশ্যম্ভাবী ; অথচ এই দুর্গে শিবাজীর সেনানীগণের পরিবার, সম্পত্তি সহ আশ্রয় লইয়াছিল। ইহা যুদ্ধে হারাইলে তাহারা ধ্বংস হইবে। ইতিমধ্যে অপর এক দল মুঘল সৈন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিবাজীর অধীন গ্রামগুলি লুঠিয়া পুড়াইয়া দিতেছিল। জয়সিংহের চতুর রণপ্রণালী ও দূরদর্শী বন্দোবস্তের নিকট শিবাজী পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি স্বয়ং গিয়া শত্রু-সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধি ভিক্ষা করিলেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ জয়সিংহের পত্র হইতে নিম্নে দেওয়া গেল।

জয়সিংহ কর্ত্তৃক আওরংজীবের নামে ১৯ জুন ১৬৬৫ লিখিত পত্র,—

"বিশ্বজগতের বাদশাহ, সলামৎ! প্রথম হইতেই শিবাজীর দূতেরা আমার নিকট আসিতে লাগিল। আমার পুণা পৌছার মধ্যে তাহারা দুই বার তাহার নিকট হইতে পত্র

লইয়া আসিল। কিন্তু আমি কোন উত্তর না দিয়া তাহাদিগকে বিফলমনোরথে ফিরিয়া পাঠাইলাম। কারণ, আমি জানিতাম যে, যতদিন না তাহাকে বলে পরাস্ত করা যায়, ততদিন তাহার কথায় কোন বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

তাহার পর সে নিজের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী কর্ম্মাজীর হাত দিয়া একখানি দীর্ঘ হিন্দী চিঠি পাঠাইয়া দিল। কর্ম্মাজী আমাকে বারে বারে বলিতে লাগিল, "অনুগ্রহ করিয়া একবার এই চিঠিখানা শুনুন এবং একটা উত্তর দিন।" এই পত্রে শিবাজী লিখিয়াছিল যে, "আমি বাদশাহের কার্য্যক্ষম দাস, আমার হাত দিয়া আপনাদের অনেক কাজ হাসিল হইতে পারে। এই পাহাড় জঙ্গলপূর্ণ পথহীন দেশ (অর্থাৎ মহারাষ্ট্র) অধিকার করিতে বাদশাহী সৈন্যকে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে। তদপেক্ষা বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করা অনেক শ্রেয়।" আমি তদুত্তরে লিখিলাম, "বাদশাহী সৈন্যদল তারকার মত অগণিত। তোমার দেশের পর্ব্বত ও বন্ধুর পথের উপর বড় বেশী নির্ভর করিও না। ঈশ্বর ইচ্ছায় আমাদের সৈন্যদলের অশ্বখুরের নীচে ইহা ধূলির সমান হইয়া যাইবে। যদি নিজের জীবন ও মুক্তি চাও, তবে এই রাজসভার গোলামদের গোলামীর চিহ্নস্বরূপ অঙ্গুরীয় নিজ কর্ণে পরিধান করিয়া স্বদেশের গিরি ও দুর্গের মায়া ত্যাগ কর। নচেৎ স্বকর্ম্মের ফল দেখিতে পাইবে।"

এইরূপ উত্তর পাইবার পর সে আমাকে আরও চিঠি লিখিয়াছিল। কিন্তু যে পরিমাণে আমরা তাহাকে পরাজিত করিতে পারিয়াছিলাম সে তদনুযায়ী উপঢৌকন দান এবং রাজ্য সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিল না। সুতরাং আমি ঠিক পূর্ব্বের মতই উত্তর দিলাম। * * * পরে আমরা রুদ্রমালা অধিকার করিলাম। * * * পুরন্দরের পাঁচটি বুরুজ এবং একটি কাঙ্গুরা কাড়িয়া লইলাম। * * * তাহার দেশ লুঠিতে লাগিলাম। * * *

এরূপ অবস্থায় ২০এ মের কাছাকাছি শিবাজীর গুরু [রঘুনাথ রাও] পণ্ডিত গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, হিন্দুর পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন শপথ, তাহাই করিয়া শিবাজীর প্রার্থনাগুলি জানাইল। আমি উত্তর করিলাম, "বাদশাহ্ আমাকে শিবাজীর সঙ্গে সন্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে প্রকাশ্য সন্ধির আলোচনা করিতে পারি, এরূপ অধিকার আমার নাই। কিন্তু যদি সে ক্ষমাভিখারী অপরাধীর মত নিরস্ত্র হইয়া আমার নিকট আসে, তবে বাদশাহ্ ঈশ্বরের ছায়া, তাঁহার দয়ার সমুদ্র উদ্বেলিত হইলেও হইতে পারে।" পণ্ডিত ফিরিয়া গিয়া এই প্রস্তাব আনিল যে, শিবাজী নিজ পুত্রকে পাঠাইতে প্রস্তুত। আমি উত্তর দিলাম যে, তাহার পুত্রের আগমন উচিতও নহে এবং মনোনীতও নয়। তাহার পর শিবাজীর প্রার্থনানুসারে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যদি আমার শিবিরে আসিবার

পর শিবাজী [আমাদের শর্ত্তে] বাদশাহের বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হয়, তবে তাহাকে নানা দান ও মান্য দেওয়া হইবে, নচেৎ সে অবাধে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিবে।

৯ই জুন [এই সংবাদ লইয়া] ব্রাহ্মণ শিবাজীর নিকট ফিরিয়া গেল। তাহার দুই দিন পরে, বেলা এক প্রহরের সময় আমি দরবারে বসিয়া আছি, এমন সময় সে আসিয়া সংবাদ দিল যে, শিবাজী ছয় জন ব্রাহ্মণ এবং কয়েকজন পাল্কী-বেহারা কাহাড় সহিত নিরস্ত্র বেশে গোপনে নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছে। আমি আমার মুন্শী উদয়রাজ এবং উগ্রসেন কাছোয়াকে তাহার নিকট পাঠাইয়া বলিলাম যে, "যদি তোমার দুর্গগুলি সমর্পণ করিতে চাও, তবে আইস, নচেৎ ঐ স্থান হইতেই ফিরিয়া যাও।" * * * শিবাজী আমার প্রেরিত লোকদের সহিত আসিল। * * *

আমার পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুসারে শিবাজী পৌছা মাত্র আমি ইঙ্গিত করিলাম, আর অমনি দিলির খাঁ ও কুমার কীরত সিংহ আক্রমণ করিয়া খড়কালা নামক পুরন্দরের অংশবিশেষ অধিকার করিল। এই যুদ্ধ আমার তাম্বু হইতে দেখা যাইতেছিল। শিবাজী কি হইতেছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার পর পুরন্দর সমর্পণ করিতে চাহিল। আমি বলিলাম, "এ দুর্গ ত আমরা জয় করিয়াছিই। আর এক ঘণ্টার—এক মিনিটের মধ্যে দুর্গরক্ষাকারিগণ আমাদের তরবারীর মুখে প্রাণ হারাইবে। যদি তুমি বাদশাহ্‌কে উপহার দিতে চাও, অন্য দুর্গ দাও।" সে পুরন্দরবাসীদিগের প্রাণ ভিক্ষা করিল। অতএব আমি শিবাজীর একজন চাকর এবং আমার পক্ষ হইতে ঘাজীবেগকে পাঠাইয়া যুদ্ধ বন্ধ করাইলাম, মারাঠারাও দুর্গ ছাড়িয়া দিবার বন্দোবস্ত করিল।

তাহার পর আমার দরবারগৃহে [তাম্বুতে] শিবাজীকে থাকিবার স্থান দিয়া আমি উঠিয়া আসিলাম। সুরত সিংহ কাছোয়া এবং উদয়রাজ-এর মধ্যস্থতায় দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সন্ধির দরকশাকশি চলিল। আমি একটিও দুর্গ ছাড়িতে চাহিলাম না। অবশেষে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর উভয় পক্ষ এই শর্ত্তে রাজী হইলাম,—

(১) একুনে ৪ লক্ষ হোন (=প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা) আয়ের ভূমিসহিত ২৩টি দুর্গ বাদশাহ্‌ পাইবেন।

(২) একুনে এক লক্ষ হোন (=প্রায় ৪ লক্ষ টাকা) আয়ের ভূমি সহিত ১২টি দুর্গ শিবাজীর হাতে থাকিবে। কিন্তু তজ্জন্য তাহাকে বাদশাহের অধীন ও কর্ম্মচারী হইতে স্বীকৃত হইতে হইবে।

(৩) শিবাজীর পুত্র অশ্বারোহী ফৌজ লইয়া পিতার নামে বাদশাহী সৈন্যদলে চাকরি

করিবে এবং তজ্জন্য তাহাকে [অর্থাৎ শম্ভুজীকে] পাঁচ হাজারী মন্‌সব এবং জাগীর দিতে হইবে।

(৪) শিবাজী উপযুক্ত পেশকশ দিলে তাহাকে বিজাপুরী বালাঘাট অধিকার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে।

এ পর্য্যন্ত বাহিরের লোকে শিবাজীর আগমনের সংবাদ পায় নাই। সুতরাং পরদিন শিবাজীকে হাতীতে চড়াইয়া রাজা রায়সিংহের সহিত দিলির খাঁর শিবিরে পাঠাইয়া দিলাম। * * * তৃতীয় দিবসে এক হস্তী ও দুই অশ্ব উপহার দিয়া শিবাজীকে আমার পুত্র কীরত সিংহের সহিত বিদায় দিলাম; পথে আমার কথামত তাহারা দাউদ খাঁর শিবিরে গিয়া দেখা করিয়া বিদায় লইল। শিবাজীর সনির্বন্ধ প্রার্থনায় আমি যে পূর্ণ খেলাৎ পরিয়াছিলাম, তাহা তাহাকে পরাইয়া দিলাম।

সেই দিন দ্বিপ্রহরে সিংহগড়ে পৌঁছিয়া শিবাজী ঐ দুর্গ আমার পুত্রের হাতে ছাড়িয়া দিয়া, উগ্রসেন কাছোয়ার সহিত অগ্রসর হইল; কথা রহিল যে, সে প্রতিশ্রুত অপর দুর্গগুলিও খালি করিয়া দিবে এবং নিজ পুত্রকে উগ্রসেনের সহিত আমার নিকট পাঠাইবে।" * * *

এই ঐতিহাসিক পত্রসংগ্রহ এক তথ্যপূর্ণ মহাসমুদ্র। ইহার অতি অল্প পরিমাণই এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব। শিবাজীকে আগ্রায় বন্দীদশায় রাখিবার সময় জয়সিংহের দুঃখ চিন্তা ও উপায় উদ্ভাবন, পরে শিবাজীর পলায়নের ফলে তাঁহার উদ্বিগ্নতা ও দাক্ষিণাত্যে মুঘল-প্রতাপ রক্ষা করা সম্বন্ধে হতাশা, এই গ্রন্থে যেন উপন্যাসের মত জ্বলন্ত অক্ষরে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়; এই দুই মহাপুরুষকে আমরা পরিচিত লোকের মত ঘনিষ্ঠভাবে দেখিতে পাই।

শ্রীযদুনাথ সরকার

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস

কবি-সম্পর্কে এযাবৎ যাহা লিখিত হইয়াছে, অপর যে সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের তন্ন তন্ন পরীক্ষা এবং পুনরালোচনা প্রয়োজন। বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার মত সময় ও সামর্থ্য আমাদের নাই। এখানে মাত্র আমাদের উক্তির কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধনে প্রযত্ন করিব।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদকীয় বক্তব্যে পদকল্পতরু ৪র্থ শাখা ২৬শ পল্লব-ধৃত 'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি দুহুঁজন পিরীতি' আদি পরপর চারিটি পদকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া কবিদ্বয়ের কবিতা-বিনিময় ও সুরধুনীতীরে সাক্ষাৎকার সমর্থিত হইয়াছে। পরে মনে হইয়াছে, কবিতা কয়টি কোন ভাবুক অথবা সহজীর; সুতরাং মিলন-ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। 'বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী'-র সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ও ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে ওগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন।[১])

১

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি দুহুঁজন পিরিতি
প্রেম-মুরতিময় কাঁতি।
যে করিল দুহুঁজন লীলা-গুণ-বর্ণন
নিতি নিতি নব নব ভাতি॥
দুহুঁ-গুণ শুনি চিত দুহুঁ উৎকণ্ঠিত
দুহুঁ দোহাঁ দরশন লাগি।
দোহাঁর রসিকপন শুনি শুনি দুহুঁজন
দুহুঁ-হিয়ে দুহুঁ রহু জাগি॥
নিজ নিজ গীত লেখি বহু ভেজল
তাহে অতি আরতি ভেল।

---

১) ২৪শ সংখ্যক সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর ভূমিকা, পৃ ১।

রাধা কামুক প্রেম-রস-কৌতুক
তাহে মগন ভৈ গেল।
নিজ নিজ সহচর রসিক-ভকত-বর
তা সঞে করত বিচার।
তাহে নিতি নবিন পরম সুখ পাওত
আনন্দ প্রেম অপার॥
রূপনরায়ণ বিজয়নরায়ণ
বৈজনাথ শিবসিংহ।
মীলন ভাবি দুহুঁক করু বর্ণন
তছু পদ-কমলক ভৃঙ্গ॥

হঠাৎ দেখিলে পদটি বিদ্যাপতির মনে হইতে পাবে; কিন্তু সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে। বহু ভণিতায় রূপনারায়ণরাজা শিবসিংহ অভিন্ন ব্যক্তি। আবার শিবসিংহের পিতৃব্য-পুত্র নরসিংহ দেবের এক পুত্র ভৈরবেন্দ্রের ও তৎপুত্র রামভদ্রের রূপনারায়ণ উপাধি ছিল। হরিসিংহ দেবের দুই পুত্র রঘুসিংহের বিজয়নারায়ণ এবং ভানুসিংহের বীরনারায়ণ বিরুদ থাকার কথা জানা যায়। পদকল্পতরুর 'গমন অবধি তুয়া গহিল বিশেখ' (১৯৪৪) পদের ভণিতা,—

নরনারায়ণ ভূপতি ভাণ।
বিজয়নারায়ণ ইহ রস জান॥

[বিদ্যাপতির ৪৩ সংখ্যক পদে মেনকা দেবীর পতি ভূপতি নরনারায়ণ। ইনি কে?]

পদামৃতসমুদ্রের পাঠ,—

বীরনারায়ণ ভূপতি ভাণ।
বিজয়নারায়ণ ইহ রস জান॥

কিন্তু বিদ্যাপতির পরিষৎ-সংস্করণে আদৌ ভণিতা নাই। কবির হর-গৌরী বিষয়ক পদের তিনটি ভণিতা নিম্নলিখিত রূপ,—

ভনই বিদ্যাপতি অভিমত সেবা।
চন্দল দেবিপতি বৈজল দেবা॥ (১১)
ভনই বিদ্যাপতি শুনহ ত্রিলোচন
পদ্ম পঙ্কজ মোরি সেবা।

চন্দল দেই পতি বৈদ্যনাথ গতি
নীলকণ্ঠ হর দেবা ॥ (১৯)

ভনে বিদ্যাপতি স্থন মহেসর
ত্রৈলোক আন ন দেবা।
চন্দল দেবিপতি বৈদ্যনাথ গতি
চরন সরন মোহি দেবা॥ (৪৪)

বৈজল দেবা ও বৈদ্যনাথ শব্দে দেবদেব মহাদেব ; সেই সেই নামের রাজা বা রাজপরিকর নহেন। [অবশ্য পদাবলীর ৬১৩ সংখ্যক পদে শিবসি হকে শিবাবতার বলা হইয়াছে।] গোবিন্দ-দাসের 'নব-নীরদ-তনু তড়িত লতা জনু' পদের 'কবি বিদ্যাপতি'-ধৃত ভণিতা (পৃ ৫৮),—

রাজা বৈদ্যনাথ রূপনারায়ণ।
গোবিন্দদাস অনুমান॥

পদকল্পতরু ও কমলাকান্ত দাসের সঙ্কলিত পদরত্নাকরে 'রাজা বৈদ্যনাথ' স্থানে যথাক্রমে 'রাজা নরসিংহ' এবং 'রাজা শিবসিংহ'। যাহা হউক, মৈথিল কবির ভণিতায় অতগুলা নাম বা উপাধির একত্র সমাবেশ কচিৎ দৃষ্ট হয়। আর 'তছু পদ কমলক ভৃঙ্গ' চরণটা চৈতন্য-পরবর্ত্তী কালের মোহর-ছাপ মারা। বিদ্যাপতির কাছে এতটা দৈন্য বা বৈষ্ণবোচিত বিনয় আশা করা যায় কি ? তারপর কে কাহার পদকমলের ভৃঙ্গ, তাহাও অনুক্ত।

২

চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি-গুণ
দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব চণ্ডীদাস-গুণ
শুনইতে বাঢ়ল রাগ॥
দুহুঁ উতকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল
বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডীদাস তব রহই না পারই
চললহিঁ দরশন লাগি।

রাধা কানুক প্রেম-রস-কৌতুক
তাহে মগন ভৈ গেল ॥
নিজ নিজ সহচর রসিক-ভকত-বর
তা সঞে করত বিচার।
তাহে নিতি নবিন পরম সুখ পাওত
আনন্দ প্রেম অপার ॥
রূপনরায়ণ বিজয়নরায়ণ
বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মীলন ভাবি দুহুঁক করু বর্ণন
তছু পদ-কমলক ভৃঙ্গ ॥

হঠাৎ দেখিলে পদটি বিদ্যাপতির মনে হইতে পারে ; কিন্তু সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে। বহু ভণিতায় রূপনারায়ণ ও রাজা শিবসিংহ অভিন্ন ব্যক্তি। আবার শিবসিংহের পিতৃব্য-পুত্র নরসিংহ দেবের এক পুত্র ভৈরবেন্দ্রের ও তৎপুত্র রামভদ্রের রূপনারায়ণ উপাধি ছিল। হরি-সিংহ দেবের দুই পুত্র রঘুসিংহের বিজয়নারায়ণ এবং ভানুসিংহের বীরনারায়ণ বিরুদ থাকার কথা জানা যায়। পদকল্পতরু 'গমন অবধি তুয়া গহিল বিশেখ' (১৯৪৪) পদের ভণিতা,—

নরনারায়ণ ভূপতি ভাণ।
বিজয়নারায়ণ ইহ রস জান ॥

[বিদ্যাপতির ৪৩ সংখ্যক পদে মেনকা দেবীর পতি ভূপতি নরনারায়ণ। ইনি কে ?]

পদামৃতসমুদ্রের পাঠ,—

বীরনারায়ণ ভূপতি ভাণ।
বিজয়নারায়ণ ইহ রস জান ॥

কিন্তু বিদ্যাপতির পরিষৎ-সংস্করণে আদৌ ভণিতা নাই। কবির হর-গৌরী বিষয়ক পদের তিনটি ভণিতা নিম্নলিখিত রূপ,—

ভনই বিদ্যাপতি অভিমত সেবা।
চন্দল দেবিপতি বৈজল দেবা ॥ (১১)

ভনই বিদ্যাপতি শুনহ ত্রিলোচন
পঅ পঙ্কজ মোরি সেবা।

চন্দল দেই পতি বৈদ্যনাথ গতি
নীলকণ্ঠ হর দেবা ॥ (১২)

ভনে বিদ্যাপতি সুন মহেশ্বর
ত্রৈলোক আন ন দেবা।
চন্দল দেবিপতি বৈদ্যনাথ গতি
চরন সরন মোহি দেবা ॥ (৪৪)

বৈজল দেবা ও বৈদ্যনাথ শব্দে দেবদেব মহাদেব ; সেই সেই নামের রাজা বা রাজপরিকর নহেন। [অবশ্য পদাবলীর ৬১৩ সংখ্যক পদে শিবসিংহকে শিবাবতার বলা হইয়াছে।] গৌবিন্দ-দাসের নব-নীরদ-তনু তড়িত লতা জনু' পদের 'কবি বিদ্যাপতি'-ধৃত ভণিতা (পৃ ৫৮),—

রাজা বৈদ্যনাথ রূপনারায়ণ।
গোবিন্দদাস অনুমান ॥

পদকল্পতরু ও কমলাকান্ত দাসের পদরত্নাকরে 'রাজা বৈদ্যনাথ' স্থানে যথাক্রমে 'রাজা নরসিংহ' এবং 'রাজা শিবসিংহ'। যাহা হউক, মৈথিল কবির ভণিতায় অত গুলা নাম বা উপাধির একত্র সমাবেশ কচিৎ দৃষ্ট হয়। অতঃ 'ইন্দু পদ কমলক ভৃঙ্গ' চরণটা চৈতন্য [illegible] মোহরছাপ [illegible] দেবী বা বৈদ্যনাথের [illegible]
[illegible] হয়, তাহাও সন্দেহ [illegible]

পন্থহি দুহুঁ-গুণ দুহুঁ জন গায়ত
দুহুঁ-হিয়ে দুহুঁ রহুঁ জাগি ॥
দৈবহি দুহুঁ দোহাঁ দরশন পাওল
লখই না পারই কোই।
দুহুঁ দোহাঁ নাম-শ্রবণে তহিঁ জানল
রূপনরায়ণ গোই ॥

গুণ-পরম্পরা শ্রবণে দুই কবি পরস্পরের দর্শনাভিলাষী হইলেন। রূপনারায়ণ সঙ্গে বিদ্যাপতি যাত্রা করিলেন। অত্র কে কাহার সহযাত্রী হইলেন, তাহাও অনুধাবন-যোগ্য। ভণিতাতে আমরা রূপনারায়ণকেই পাইতেছি।

৩

সময় বসন্ত যাম দিন-মাঝহি
বটতলে সুরধুনি-তীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মীলল
পুলক কলেবর গীর ॥
দুহুঁ জন ধৈরজ ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপনরায়ণ কেবল
দুহুঁক অবশ-প্রতিকার ॥ ধ্রু ॥
ধৈরজ ধরি দুহুঁ নিভৃতে আলাপই
পুছত মধুর-রস কী।
রসিক হইতে কিয়ে রস উপজায়ত
রস হৈতে রসিক কহী ॥
রসিকা হইতে রসিক কিয়ে হোয়ত
রসিক হইতে রসিকা।
রতি হইতে প্রেম প্রেম হইতে রতি
কিয়ে কাহে মানব অধিকা ॥
পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে
শুনতহি রূপনরাণ।

কহ বিদ্যাপতি ইহ রস-কারণ
লছিমা-পদ করি ধ্যান ॥

এক বসন্তের মধ্যাহ্নে সুরধুনী-কূলে বটচ্ছায়ায় কবিদ্বয় মিলিত হইলেন। মিলনানন্দে উভয়ে ধৈর্য্য হারাইলেন। রূপনারায়ণ তাঁহাদের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর নির্জ্জনালাপ আরম্ভ হইল। চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনকে মধুররসসম্বন্ধী প্রশ্ন করিতেছেন, কবি বিদ্যাপতি লখিমা-চরণ ধ্যান করিয়া উত্তর দিতেছেন এবং রূপনারায়ণ শুনিতেছেন। শেষের চরণ দুইটি 'বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে ধোপানী-চরণ সার ॥'-এর মতই শুনায়। লখিমা-চরণ ধ্যান বিদ্যাপতির ধাতুর অনুকূল নয়।

৪

রসের কারণ রসিকা রসিক
কায়াদি ঘটনে রস।
রসিক কারণ রসিকা হোয়ত
যাহাতে প্রেম-বিলাস ॥
স্থূলত পুরুষে কামসূক্ষ্ম-গতি
স্থূলত প্রকৃতে রতি।
দুহুঁক ঘটনে যে রস হোয়ত
এবে তাহা নাহি গতি ॥
দুহুঁক যোটন বিনহি কথন
না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষে যে কিছু হোয়ত
রতি প্রেম পরচারি ॥
পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ
অধিক রস যে পিয়ে।
রতি-সুখ-কালে অধিক সুখহি
তা নাকি পুরুষে পায়ে ॥
দুহুঁক নয়নে নিকসয়ে বাণ
বাণ যে কামের হয়।

রতির যে বাণ নাহিক কথন
তবে কৈছে নিকসয় ॥
কাম দাবানল রতি যে শীতল
সলিল প্রণয়-পাত্র।
কুল কাট খড প্রেম যে আধেয়
পচনে পিরিতি মাত্র ॥
পচনে পচনে লোভ উপজিয়া
যব ভেল দ্রবময়।
সেই সে বস্তু বিলাসে উপজে
তাহাকে রস যে কয় ॥
ভণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেম-তরঙ্গে ॥

সামান্য পরিবর্ত্তিতাকারে পদটি চণ্ডীদাসের সংস্করণগুলিতে পাওয়া যাইতেছে। 'ভণে বিদ্যাপতি' স্থানে 'বাশুলী আদেশে' পাঠ কেমন করিয়া আসে, তাহাও চিন্তনীয়। অধিকন্তু ৩য়-৪র্থ পদ রাগাত্মিক প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে রচিত। উদ্ধৃত পদচতুষ্টয়ের ভাব ও ভাষা না চণ্ডীদাসের না বিদ্যাপতির। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অথবা বিদ্যাপতির পদে কুত্রাপি সহজ-ভাবের আভাস নাই। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, অব্যবহিত পরবর্ত্তী চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদ তিনটাই সহজ-ভজনের পদ। অথচ অনুবাদ-প্রকরণ অনুসারে পূর্ব্বকবিগণের গুণ-কীর্ত্তন পল্লবটির প্রধান প্রতিপাদ্য এবং তাহাই দশ পদে বর্ণিত।

ষড়বিংশে বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
ইহা সভার গুণ কিছু আছয়ে প্রকাশ ॥
দশ পদে সংক্ষেপ করিয়া সে গাইল।

অধিকাংশ পুথিতে ৪র্থ শাখা ২৬শ, ২৭শ ও ২৯শ পল্লবের পদ-বিন্যাসে হেরফেরেরই বা হেতু কি? পদকল্পতরু যে আকারে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে উহার ৪র্থ শাখা ২৬শ পল্লব সহজিয়া সম্প্রদায়ের পুথি-পাতড়ার সাহায্যে সঙ্কলিত না বলিয়া পারা যায় না।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় তাঁহার 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন' শীর্ষক প্রবন্ধে[২]) বলিয়াছেন, পদ কয়টি খণ্ডবাসী রঘুনন্দন-ভক্ত বৈদ্য কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির সহিত নরোত্তম-শিষ্য দীন চণ্ডীদাসের সমাগম সূচিত করে। রূপনারায়ণ পকপল্লীর রাজা নরসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং ত্রিপুরা লখিমা হইয়া গিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার বক্তব্যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহা হইলে রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ, শিবসিংহ প্রভৃতি মৈথিল রাজগণের এবং লখিমা দেবীর উল্লেখ হয় কেমন করিয়া? উত্তরে বলিতে হয়, পদ কয়টা কৃত্রিম। মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন রূপনারায়ণ খাড়া করিয়া এবং রাণীর আসনে ত্রিপুরা দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া প্রশ্নটি জটিলতর করিয়া ফেলিয়াছেন। বিজয়নারায়ণ ও শিবসিংহ যেমন তেমনই রহিয়া গেলেন। বৈদ্যনাথও বাদ পড়িলেন।

আগে আমাদেরও ধারণা ছিল, চণ্ডীদাস নিত্যা-সহচরী বাসলীর উপদেশে দুর্ব্বলাধিকারীর জপ-তপ ছাড়িয়া সহজ-সাধনের রীতি অনুসারে রজক-ঝিয়ারী রামিণী সহ প্রবর্ত্ত হন এবং উৎকট বা উদ্ভট সাধনান্তে চরম সিদ্ধিলাভ করেন। ওরূপ সাধনার মূলে চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত 'চতুর্দ্দশ-পদাবলী', রাগাত্মিক পদসমূহ এবং প্রাদেশিক প্রবাদ। উহার পরিপোষক 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা', 'সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়', বিবর্ত্তবিলাস' প্রভৃতি বহু সহজিয়া গ্রন্থ। কবির কৃতি হইতে তিনি বাসলীর (বাগীশ্বরী) বরে পদ রচনা করেন, তাঁহার অপর নাম অনন্ত এবং উপাধি বড়ু ছিল, ইহার বেশী কিছু জানা যায় না। যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাওয়া যায়, তাহা অন্য গ্রন্থে কবির উল্লেখমাত্র, অথবা উপরি উক্ত সাম্প্রদায়িক পুথিতে। সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি এবং জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ শ্রেণীর পুথিতে পূর্ব্ববর্ত্তী ও তদানীন্তন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে স্বগোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া প্রচার করিবার প্রবল প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তদ্ব্যতীত ঐ সকল পুথি অর্ব্বাচীন। উহাদের পরস্পরের মধ্যে এবং স্থানীয় প্রবাদে যথেষ্ট অনৈক্য। সুতরাং ওগুলি নির্ভরযোগ্য নয়, পরন্তু পরিত্যাজ্য।

রত্নসার পুথির[৩]) ২য় অধ্যায়,—

——বিদ্যাপতি করিল ভজন।
লছিমা সহিত তার রসের সাধন॥

---

২) সা-প-প, ৩৭শ ভাগ, ১ম সংখ্যা।

৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত ১১১১ সংখ্যক পুথি।

চণ্ডীদাসের সাধন ধুবনী সঙ্গ করি।
সেই সে পীরীতি ধর্ম্ম গাইলেন গীত কবি।

রচয়িতা আপনাকে চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়া পরিচিত করিতে অত্যন্ত আগ্রহবান্। উদ্ধৃত কবিতা অবিকল বা ঐ মর্ম্মের কবিতা এত অধিক পুথিতে পাওয়া যায় যে, ওগুলিকে উড়াইয়া দিতে স্বভাবতই একটু ইতস্ততঃ করিতে হয়। কিন্তু ঐ সব পুঁথি কাহাদের লেখা, কত দিনের এবং উহাদের উদ্দেশ্যই বা কি, ইত্যাদি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সকল প্রকার সঙ্কোচ কাটিয়া যায়। এদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদের শেষ দিক্টায় প্রায়শঃ রাজা শিবসিংহ ও মহাদেবী লছিমা বা লখিমার নাম পাওয়া যায়। ভণিতাংশে রাণীর নাম দেখিয়া এক সম্প্রদায়ের লোক রটাইয়া দিলেন, কবি লখিমাতে আসক্ত না হইয়া পারেন না। তাঁহারা জানিতেন না যে, বিদ্যাপতি তাঁহার পদে মধুমতি দেবী, সোরম দেবী প্রভৃতি শিবসিংহের অপরাপর মহিষী এবং সমসাময়িক বহু রাজা, রাণী, ও অমাত্য-পত্নীর নামও করিয়াছেন। সুদূর বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির লখিমা-প্রসক্তির কাহিনী ছড়াইয়া পড়িল; কবির স্বদেশে কিন্তু উহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত! উপরি উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা দয়া করিয়া বড়ু [illegible] স্কন্ধে রজক-কিশোরীকে চড়াইয়া দেন নাই কে বলিবে?

[illegible]বিলাস চতুর্থে,—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

গোয়ালিনী পিঙ্গলা সে ব্রজদেবী সম।
গোঁসাই কৃষ্ণদাস সদাই আচরণ॥
শ্যামা নাপিতিনীর সঙ্গে শ্রীজীব গোঁসাই।
পরম পীরিতি কৈলা যার সীমা নাই॥
রঘুনাথ গোস্বামী পীরিতি উল্লাসে।
কিরা বাঈ সঙ্গে তেঁহ রাধাকুণ্ড বাসে॥
গৌরপ্রিয়া সঙ্গে গোপাল ভট্ট গোঁসাই।
করয়ে সাধন যার অন্য কিছু নাই॥
রায় রামানন্দ যজে দেবকন্যা সঙ্গে।
আরোপেতে স্থিত তেঁহ ক্রিয়ার তরঙ্গে॥

স্বসমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন অভিপ্রায়ে যত প্রকার অসৎ উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, ইহা তাহারই অন্যতম উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মহাপ্রভুর ঋষিকল্প পার্ষদ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা লেপনের প্রয়াস বাস্তবিকই বিস্ময়কর। ততোঽধিক আশ্চর্য্য, বিবর্ত্ত-বিলাসকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেও অব্যাহতি দেন নাই। বিবর্ত্তবিলাস কেন, বিস্তর সহজিয়া পুথিতে অনুরূপ আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে, (রত্নসার পুথির সুদীর্ঘ বিবরণ দ্রষ্টব্য)। তখন ইঁহাদের পক্ষে বিদ্যাপতির লছিমা এবং চণ্ডীদাসের রজকিনী পরিকল্পনা তেমন কিছুই নয়। 'চতুর্দ্দশ-পদাবলী'র একখানা পুথিতে চণ্ডীদাস ধোবিনী-সংসর্গ জন্য জাতি-পাঁতি-রহিত হন। দেশপূজ্য জ্ঞাতি-ভ্রাতা নকুলের মধ্যবর্ত্তিতায় সামাজিকগণের সম্মতিক্রমে এক মহাভোজের অনুষ্ঠান হয়; বলা বাহুল্য, রজকী ত্যাগের প্রতিশ্রুতিতে। 'সহজ উপাসনা-তত্ত্বে' নকুল চণ্ডীদাসকে উদ্ধার করিতে গিয়া স্বয়ং সহজমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া জীবন সার্থক করেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধিতে অনেকানেক পদ ও ছোট বড় পুথি লিখিয়া প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা এবং গ্রন্থকারদের নামে চালাইয়া দিয়াছেন।

উপরের আলোচনা হইতে প্রতিপন্ন হইবে, কবি সহজিয়া ছিলেন না, নব রসিকেরও একজন নন। 'নবরসিক' শব্দটা তখনও গড়িয়া উঠে নাই; এমন কি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও না। হয় ত চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির ন্যায় স্মৃতি-শাস্ত্রের ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন, গণেশাদি পঞ্চদেবতার উপাসনা করিতেন।[৪])

[৪]) মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত কীর্ত্তিলতার ভূমিকা, পৃ ১৶০-১৷০

হাফেজের মানস-প্রতিমা সাকী ছিল; ওমরেরও ছিল। কিন্তু বিদ্যাপতির লছিমা মানসী হইবেন কেমন করিয়া? আর যাহার যাহাই থাকুক, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবির ঐরূপ মানস বা বাস্তব জগতের কেহ থাকা বাধে।

বক্তব্যে লিখিত হইয়াছে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে।' শ্রীযুক্ত সতীশবাবু কাব্যের সর্ব্বত্র প্রবীণ হস্তের পরিচয় পাইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার সিদ্ধান্তই আদরণীয়।

সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত পুঁথির মধ্য হইতে কএকটা পদ৫) পাইয়া ভাবিয়াছিলাম, বুঝি বা চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া গেল; কিন্তু উহা দেখিয়া পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম এ, সি আই ই মহাশয় সংশয় প্রকাশ করেন এবং আমাদিগকে অপেক্ষাকৃত সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। পুনঃ পুনঃ আলোচনায় ও পদ কয়টার উপর আমরা বিশ্বাস হারাইয়াছি।

প্রসঙ্গতঃ সংক্ষেপে আরও দুই-একটা কথার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে। কবির দেশ বীরভুম-নান্নুরেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'কানুর পীরিতি। চন্দনের রীতি। ঘসিতে সৌরভময়।' 'নিত্যের আদেশে। বাশুলী চলিল। সহজ জানাবার তরে।' 'জয় জয় চণ্ডী -দাস দয়াময়। মণ্ডিত সকল গুণে।' প্রভৃতি কয়টা পদে নান্নুর, নানুর; সহজ উপাসনা-তত্ত্বে নাড়ু পাওয়া যায়। এবং বীরভুমের নান্নুরে প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্ত্তি বাগীশ্বরীর। কালে পূজা-পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকিবে। ['বাসলী শিরে বন্দি চণ্ডীদাস গাএ॥' এর মতই দ্বিজ কৃষ্ণরামের জৈমিনি-ভারতে 'বাগীশ্বরী প্রণমিয়া কৃষ্ণদাস কয়॥'] শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু ছাতনাতে নানুরের (?) মাঠ দেখিয়াছেন; কিন্তু তাহা সুবিদিত নহে। যাহা হউক, একটা নিশ্চিতই অনুকরণ; সেটা কোন্‌টা, স্থিরীকৃত হইলে কবির দেশ পাওয়া যাইতে পারে।৬)

মূল্যবান্ আবিষ্কার,—আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়,—শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন পুঁথির ৮৭ পত্রের অপর পৃষ্ঠায় 'শ্রীগুণরাজ খাঁ' স্বাক্ষর আছে। উহা শ্রীকৃষ্ণবিজয়কার

৫) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৬ ভাগ, পৃ ৭৯-৮১।

৬) প্রবন্ধ খানিকটা ছাপা হইবার পর শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীমতী মৃণাল দাসগুপ্তার চণ্ডীদাস-সমস্যা (Candidās Problem, I. H. Q., June, 1929.) প্রবন্ধের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লেখিকা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচয়িতা সহজিয়া ছিলেন না, রামী রজকিনীকেও সাধন-পথে সঙ্গিনী করেন নাই। শ্রীমতী দাসগুপ্তাও কবির দেশ বীরভূম-নান্নুর মনে করেন এবং কবির মৃত্যু'ঘটিত বিচিত্র কাহিনীগুলিতে বিশ্বাসবতী নহেন।

মালাধর বসুর হইলে পুথির প্রাচীনত্বে আর সংশয় থাকে না। বঙ্গ-সাহিত্যে পাঁচ জন গুণরাজ খাঁ, তিন জন কবিকঙ্কণ উপাধিক কবি থাকা সত্ত্বেও—এ কালে বিদ্যাসাগর বলিলে যেমন ঈশ্বরচন্দ্রকে বুঝায়, সে কালে গুণরাজ খাঁ অথবা কবিকঙ্কণ নামে তেমনি মালাধর বসু বা মুকুন্দরামকে বিশেষিত করিত।

অধুনা পণ্ডিত-সমাজে পদকর্ত্তা একাধিক চণ্ডীদাস স্বীকৃত।

পূর্ব্বাপর ভাষা, ভাব, রসের ধারা ইত্যাদির সহিত অপরিচয় হেতু কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন সম্বন্ধে অদ্ভুত মন্তব্য করিয়া বসেন। সুতরাং সে স্থলে বিতর্ক নিরর্থক। ইঁহারা দেবর্ষি নারদের নৃত্য কুকবির কদর্য্য রুচির পরিচায়ক মনে করেন। দিবারাসের উপন্যাসে ইঁহারা বিমূঢ় হইয়া পড়েন; এবং রাসের পর কালিয়-দমন ইহাঁদের নিকট অশ্রুত-পূর্ব্ব ঘটনা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিখানা গীতগোবিন্দের আদর্শে রচিত; এমন কি, কএকটা পদ অবিকল তরজমা। বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীকার যে 'কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিতদানখণ্ডনৌকাখণ্ডাদিপ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ' বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি খণ্ডগুলিকে বিশেষিত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'দানকেলিকৌমুদী' উপরি উক্ত দানখণ্ডেরই প্রকারভেদ। শ্রীচৈতন্যদেব-বিরচিত 'শ্রীরাধাপ্রেমামৃত' বা গোপালচরিত কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের একটু মাজাঘসা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। নীচে মহামুনির নৃত্যের একটি চিত্র দেওয়া গেল।

দেবোঽতিথিস্তত্র চ নারদোঽথ
বিপ্রপ্রিয়ার্থং মুরকেশিশত্রোঃ।
চুকূর্দ্দ মধ্যে যদুসত্তমানাং
জটাকলাপাগলিতৈকদেশঃ ॥২৩
রাসপ্রণেতা মুনিরাজপুত্রঃ
স এব তত্রাভবদপ্রমেয়ঃ।
মধ্যে চ গত্বা স চুকূর্দ্দ ভূয়ো
হেলাবিকারৈঃ সবিড়ম্বিতাঙ্গৈঃ ॥২৪
স সত্যভামামথ কেশবং চ
পার্থং সুভদ্রাং চ বলং চ দেবম্।
দেবীং তথা রেবতরাজপুত্রীং
সংদৃশ্য সংদৃশ্য জহাস ধীমান্ ॥২৫

তা হাসয়ামাস সুধৈর্য্যযুক্তা-
স্তৈস্তৈরুপায়ৈঃ পরিহাসশীলঃ।
চেষ্টানুকারৈর্হসিতানুকারৈ-
র্লীলানুকারৈরপরৈশ্চ ধীমান্ ॥২৬
আভাষিতাং কিঞ্চিদিবোপলক্ষ্য
নাদাতিনাদান্ ভগবান্ মুমোচ।
হসন্ বিহাসাংশ্চ জহাস হর্ষা-
দ্বাস্যাগমে কৃষ্ণবিনোদনার্থম্ ॥২৭

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৮৯ম অধ্যায়।

একটু খোঁজ করিলে তাঁহারা মহাকবি ভাসের নাটকে রামকৃষ্ণের দিবারাস দেখিতে পাইতেন। আরও দেখিতেন, রাসের পর অরিষ্ট-নিধন এবং তৎপরে কালিয়-দমন। কাব্য যে ইতিহাস অথবা পুরাণ নয়, এই মোটা কথাটা তাঁহারা ভুলিয়া যান।

যে লেখা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিখানা ২৫০ বর্ষ পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর-রাজের পুথিশালায় ছিল বলা হয়, তাহা এতদিন পুথি-পত্রে চাপা পড়িয়াছিল, সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। অত্রসহ তাহার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। লেখাটার মর্ম্ম, সন ১০৮০।২৬ আশ্বিন শ্রীকৃষ্ণপঞ্চানন শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৯৫-১১০ পাতা শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট লইয়া যান; এবং ২১ অগ্রহায়ণ ঐ ১৬ পাতা ফিরাইয়া দেন। এখন জিজ্ঞাস্য, সনটা বঙ্গাব্দ না মল্লাব্দ? মল্লভূমে বঙ্গাব্দ ও মল্লাব্দ দুই-ই চল ছিল। মল্লাব্দ বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায়, বঙ্গাব্দই ধরা হইয়াছে।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

ছদ্মবেশে দেবদেবী

সে আজ অনেক দিনের কথা, পূজনীয় পিতৃদেব মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন, ধর্ম ঠাকুরের পূজাটা বৌদ্ধ ব্যাপার। যখন বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে অনেক বাক্যবাণ সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে যখন শূন্যপুরাণ বাহির হইল, তাহার পর ধর্মপূজা-বিধান বাহির হইল, তখন অনেক চিন্তাশীল লেখক বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে চর্চ্চা করিতে লাগিলেন এবং দেখা গেল, বক্তিয়ার খিলিজীর খাঁড়ায় বৌদ্ধ ধর্ম নামটা লোপ হইয়া গেলেও বৌদ্ধ-প্রভাব বাঙ্গালা দেশে প্রচুর পরিমাণে থাকিয়া গিয়াছে এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অনেক লোকে এখন হিন্দু সমাজভুক্ত হইয়া বাস করিতেছে। আরও দেখা গেল, যাহারা এখন বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয়, নেড়া-নেড়ী বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের বেশীর ভাগ বৌদ্ধ সহজিয়া। যখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব এতদূর পর্য্যন্ত ধরা গেল, তখন বেশী একটু চেষ্টা করিয়া আরও একটু অগ্রসর হই না কেন? এই ভাবে অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে যে, বৌদ্ধ ধর্ম বেশ ওতপ্রোতভাবে হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। এমন কি, আমরা বৌদ্ধ দেবদেবীর আজিও উপাসনা করিতেছি—শুধু এমনি নয়, প্রাণ-মন-ভরা ভক্তি দিয়ে। বৌদ্ধেরা যখন ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইলেন এবং যখন মুসলমানদিগের অত্যাচারে বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রাণত্যাগ করিলেন এবং বড় বড় মঠগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, এক এক সময় মনে হয়, সেটা যেন ভারতের কল্যাণের জন্যই ঘটিয়াছিল। তাঁহারা কিন্তু বিতাড়িত হইয়াও যাহা সামান্য এখানে রাখিয়া গেলেন, তাহা অতি সাঙ্ঘাতিক আকারের বিষস্বরূপ—অর্থাৎ যাহাকে আমরা তন্ত্র বলি। এই তন্ত্রের চোটে বাঙ্গালা দেশের অধোগতি এবং তাহারই ফলে বাঙ্গালার পুরুষ ও স্ত্রীলোকে আজ এত উদ্যমহীন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আমরা 'তারা' 'তারা' করিয়া অস্থির হই, তিনি একজন বৌদ্ধ দেবতা। কালীর নাম কে না করে, কালীর নামে কত হাজার হাজার নিরীহ পাঁঠা বলি হইতেছে, আর কত নূতন মানতই হইতেছে, অথচ কালী হিন্দুদের দেবীই নন, তিনি বৌদ্ধদিগের দেবী। সরস্বতীর পূজার সময় অতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণও 'ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ' করিয়া পূজার ঘর মুখরিত করিতেছেন, অথচ দেখা যাইতেছে, তিনি একজন বৌদ্ধ দেবী। এইগুলি না করিয়া আমরা ত ভার্জিন মেরীর ধ্যান-ধারণা করিতে পারি আর সাহেবদের ইষ্টার ও বড়দিন গুলিও লইতে পারি। আর তাহা যদি করিতে পারি, তাহা হইলে ত সব লেটাই মিটিয়া যায়, ধর্মের নামে মাথা ফাটাফাটিটাও কিছু কমিয়া যায়।

তাহা হইলেই দেখা গেল, বৌদ্ধ ধর্ম যায় নাই, উহা স্পষ্টরূপে আমাদের ভিতর রহিয়াছে।

কোন্ বাঙ্গালী কালী-তারা মানে না বা কোন্ বাঙ্গালী উহাদের ভক্তি করে না বা ভয় করে না এবং তাঁদের কাছে মানত করে না? আর এঁরাই যদি বৌদ্ধ হন, তাহা হইলে আর বাকী রহিল কি? সময়ে সময়ে সন্দেহ হয়, সারা বাঙ্গালাই তাহা হইলে বৌদ্ধ ছিল এবং তাহাই আছে। সে যাহাই হউক না কেন, মোটের উপর বাঙ্গালায় যে কিরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ছিল, তাহা দেখান প্রথম পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। সেই বিষয়ে চর্চ্চা করিতে করিতে আজ দেখা যাইতেছে—আমাদের পূজা-পদ্ধতিতেও বৌদ্ধ দেবতা রহিয়াছেন। বৌদ্ধ দেব-দেবীর পূজা বিশেষ দোষের নহে, কিন্তু জানিয়া শুনিয়া পূজা করাটাই কি ভাল নয়? সত্য থাকিলেই জানিতে হয় এবং জানিবার চেষ্টা করা উচিত; কিন্তু এই প্রবন্ধের বিষয় সংক্রান্ত যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহার পথপ্রদর্শক পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় মহাশয়; কাজেই তাঁহার সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে তাঁহারই প্রদর্শিত বিষয়ে দুই একটি সিদ্ধান্ত দেওয়াই নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হওয়াতেই এই প্রবন্ধ লিখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি।

এখন দেখা যাউক, কি করিয়া কালী, তারা ইত্যাদি দেবতারা বৌদ্ধ এবং ইহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কি কি যুক্তি থাকিতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'তারা বৌদ্ধ কি না' এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ কোন এক সাময়িক পত্রে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু সেখানে নানা কারণে বিস্তারিত ভাবে লিখিতে পারি নাই। সেই জন্য এখানে মোটের উপর দরকারী কথাগুলি নাতিবিস্তৃত ভাবে বলিয়া যাইব।

সকলেই জানেন, হিন্দুরা দশমহাবিদ্যা নামে দশজন দেবীকে মানিয়া থাকেন। তাঁহাদের মহাবিদ্যা বলা হয়, আবার সিদ্ধবিদ্যাও বলা হয়। কারণ, প্রত্যেকটি দেবীর এক একটি মন্ত্র আছে। এবং সত্য কথা বলিতে কি, তন্ত্র হিসাবে এই মন্ত্রগুলিই আসল, মূর্ত্তি কল্পনা তাহার পরে। এই দশটি মন্ত্রকেই শুধু সিদ্ধবিদ্যা বলা হয়। কারণ, তন্ত্রের মতে যদি এই দশটির কোন একটি মন্ত্র এক লক্ষ বার জপ করা হয়, তাহা হইলেই সিদ্ধিলাভ হয়। কিন্তু সত্য সত্য কেহ সিদ্ধি পাইতেছে কি না, তাহা পাঠকবর্গ জপ করিয়া দেখিতে পারেন। জপ করাও সোজা নয়—মন্ত্রটি শুদ্ধ হওয়া চাই, জপ করিবার সময় অক্ষরগত চিত্ত হওয়া চাই, নাতিশীঘ্র ভাবে বিলম্ব না করিয়া জপ করা চাই। যদি একটু কোন স্থলে ত্রুটি হয়, বস্—তাহা হইলে সিদ্ধির আর কোন সম্ভাবনা নাই। তাহার উপরে এই দশজন বা এই দশবিদ্যা পঞ্চমকারের শরণাপন্ন না হইলে কোনক্রমেই সিদ্ধি দান করেন না; দশমহাবিদ্যারা দশজন, নিম্নলিখিত শ্লোকে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল।

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥

বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

তন্ত্রসারে ধৃত বিশ্বসার তন্ত্রের বচন।

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশজনেই দশটি মহাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইঁহারা আবার নামেই দশটি, ইঁহাদের মন্ত্রের অক্ষরের ফেরফারে আবার নূতন মন্ত্র হয় এবং নূতন মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হয়। যেমন ধরুন তারা, তাঁহার মন্ত্র হ্রীঁ স্ত্রী হুঁ ফট্; কিন্তু চারিটি মন্ত্রাক্ষর যদি একটু আধটু উল্টা পাল্টা করা যায়, তাহা হইলে আরও সাতটি মন্ত্র উৎপন্ন হয় এবং এই সাতটি মন্ত্রের আবার সাতটি দেবতা হয়। তাই মায়াতন্ত্রে বলে—তারিণী আট রকমের এবং তাঁহারা মন্ত্রাক্ষরের বিভিন্ন স্থিতিভেদে উদ্ভূত হয়েন। সেখানে বলিতেছে,—

তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা কালী সরস্বতী।
কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী স্মৃতা॥

অর্থাৎ তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী—এই আটটি দেবতা সকলেই তারিণী বলিয়া পরিচিত হন। তন্ত্রসারে এই আট প্রকারের তারার যাহা মন্ত্র পাওয়া যায়, তাহা একত্র করিয়া দিলাম। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, তারার মন্ত্রের মন্ত্রাক্ষরের পরিবর্ত্তন করায় আরও সাতটি মন্ত্রের উৎপত্তি হইতেছে।

নাম	মন্ত্র				মন্ত্রাক্ষরের অবস্থান
তারা	হ্রীঁ	স্ত্রী	হুঁ	ফট্	১২৩৪
উগ্রা	স্ত্রীঁ	হ্রীঁ	হূ	ফট্	২১৩৪
মহোগ্রা	হূ	স্ত্রীঁ	হ্রীঁ	ফট্	৩২১৪
বজ্রা	হূ	হ্রী	স্ত্রীঁ	ফট্	৩১২৪
কালী	হ্রী	স্ত্রীঁ	ফট্	হুঁ	১২৪৩
সরস্বতী	স্ত্রী	হ্রীঁ	ফট্	হূ	২১৪৩
কামেশ্বরী	হ্রী	হূ	স্ত্রীঁ	ফট্	১৩২৪
ভদ্রকালী	স্ত্রী	হূ	হ্রীঁ	ফট্	২৩১৪

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উগ্রা মহোগ্রা ইত্যাদি সাতটি দেবতা তারারই রূপান্তর মাত্র এবং সাতটি মন্ত্রই তারামন্ত্রেরই রূপান্তর। যদি দেখান যায়, তারা দেবীর উৎপত্তি বৌদ্ধ ধর্ম হইতে, তাহা হইলে তাঁহার বিভিন্ন রূপধারী দেবতাগুলিও বৌদ্ধ হইয়া যাইবেন। অতএব তারার উৎপত্তি কোথা হইতে হইল, সেই প্রশ্নের বিচার করা দরকার।

হিন্দুদিগের নানাপ্রকার তন্ত্রের পুস্তক আছে এবং তন্ত্রসাহিত্যের কয়েকখানি পুস্তকে তারার মন্ত্র, ধ্যান ও পূজাপদ্ধতি পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে তারাতন্ত্র, তন্ত্রসার, মহাচীনাচারক্রমতন্ত্র, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ইত্যাদির নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তন্ত্রসারে দেখি, তারার ধ্যান ইত্যাদি একখানি পুরাতন পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই পুরাতন পুস্তকখানির নাম ভৈরবতন্ত্র। তারার মূর্ত্তি এই সকল গ্রন্থেই নিম্নলিখিত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ॥
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং ললজ্জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্॥
খড়্গ-কর্ত্তৃসমাযুক্ত-সব্যেতর-ভুজদ্বয়াম্।
কপালোৎপলসংযুক্ত-সব্যপাণি-যুগান্বিতাম্॥

ধ্যান হইতে বুঝা যায়, তারার মূর্ত্তি অতি ভীষণ প্রকৃতির। তিনি প্রত্যালীঢ় আসনে দক্ষিণপদ সঙ্কুচিত করিয়া এবং বামপদ প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার গলায় মুণ্ডের মালা। তিনি আকারে খর্ব্বা এবং ব্যাঘ্রচর্মনিবসনা, নবযৌবনমণ্ডিতা এবং **পঞ্চ মুদ্রায় বিভুষিতা**। তাঁহার চারিটি হাত, দক্ষিণ হাত দুইটিতে খড়্গ ও কর্ত্তৃধারিণী এবং বাম হাতে কপাল ও উৎপলধারিণী। ইঁহার মাথায় চুল **একটি জটার** আকারে লম্বমান ও উহা **অক্ষোভ্যের** মূর্ত্তিদ্বারা শোভিত।

পাচটি মুদ্রা কাহাকে বলে? তারা একজটা কেন এবং ইঁহার মাথায় অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি কেন—এই তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের দ্বারা করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া যে হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রকাররা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহা বলা যায় না। পঞ্চমুদ্রার ব্যাখ্যান করিতে গিয়া তন্ত্রসারে তন্ত্রচূড়ামণির ও শঙ্করাচার্য্যের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সেখানে দেখি—পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতামিতি ললাটে শ্বেতাস্থিপট্টিকা-চতুষ্টয়ান্বিতকপালপঞ্চকভূষিতামিত্যর্থঃ। শ্বেতাস্থিপট্টিকাযুক্তকপালপঞ্চশোভিতামিতি তন্ত্রচূড়ামণৌ। শঙ্করাচার্য্যেণাপ্যুক্তম্। বিচিত্রাস্থিমালাং ললাটে করালাং কপালঞ্চ পঞ্চান্বিতং ধারয়ন্তীমিতি।

অর্থাৎ ইঁহাদের মতে পঞ্চমুদ্রা বলিতে পাঁচটি কপালবিশিষ্ট শ্বেতাস্থিপট্টিকা-চতুষ্টয়ের অলঙ্কার। যেহেতু এই অস্থিপট্টিকাচতুষ্টয়ের সহিত পাঁচটি কপাল যোজিত থাকে, সেই জন্য ইহাকে পঞ্চমুদ্রা বলা হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যান মোটেই সমীচীন বোধ হয় না। এখানে পট্টিকাচতুষ্টয় দ্বারা নির্মিত অলঙ্কার একটি। তাহার অঙ্গভূত পাঁচটি কপালকে পঞ্চমুদ্রা কিছুতেই বলা যায় না। আর তাহা ছাড়া 'মুদ্রা'শব্দে কপাল বা ছিন্নমুণ্ড কখনও যে বুঝাইতে পারে, এরূপ আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। তাহা ছাড়া কোথাও কোথাও পঞ্চমুদ্রার বদলে ষণ্মুদ্রা বা চতুর্মুদ্রাবিভূষিত বলিয়া দেবদেবীদের বলা হয়, সেস্থানেও কি ছয়টি মুণ্ড বা চারিটি মুণ্ড বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়? ইহা বোধ হয় পারা যায় না। কারণ, পাঁচটি মুণ্ডের যে একটা অলৌকিক শক্তি আছে, তাহা যে অন্য প্রকার মুণ্ডসমবায়ে থাকিতে পারে, তাহা দৃষ্টি-গোচরে আসে না। কাজেই মনে হয়, হিন্দু তন্ত্রে পঞ্চমুদ্রার যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; কেন, তাহা পরে বলিতেছি।

তারপর তারাকে একজটা কেন বলা হইল, এবং একজটা বলিতে যে কি বুঝায়, তাহার সম্যক্ আলোচনা হিন্দু তন্ত্রে করা হয় নাই। বোধ হয়, ইহা ব্যাখ্যা করিবার যে, কোন প্রয়োজন আছে, তাহাই তাঁহারা মনে করেন নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে একজটার একটা মানে কিছু আছে, যাহার আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন।

তারার মাথায় অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি থাকে। এই অক্ষোভ্য কে? কেনই বা অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি মাথায় থাকে, ইহারও বিচার হওয়া দরকার। হিন্দু তন্ত্রের মতে অক্ষোভ্য মানে—যার ক্ষোভ নাই। তিনি কে, নিশ্চয় শিব। কি করিয়া শিবকে ধরা গেল, তাহা তোড়লতন্ত্রে লিখিত নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়,—

সমুদ্রমথনে দেবি কালকূটং সমুত্থিতম্।
সর্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ মহাক্ষোভমবাপ্নুয়ুঃ॥
ক্ষোভাদিরহিতো যস্মাৎ পীতং হলাহলং বিষম্।
অতএব মহেশানি অক্ষোভ্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
তেন সার্দ্ধং মহামায়া তারিণী রমতে সদা।

সমুদ্র মথনের সময় কালকূটের গল্প কে না জানে। কালকূট ভীষণ বিষ, কাজেই সকল দেবগণ এবং সকল দেবীগণের ভীষণ ক্ষোভ উপস্থিত হইল। কেবল হইল না একজনের, তিনি শিব। ক্ষোভরহিত হইয়া তিনি সেই বিষ গলাধঃকরণ করিলেন, কাজেই শিব অক্ষোভ্য। মহামায়া তারিণী যখন তাঁহার সহিত রমণ করেন, তখন শিব তারার মাথায় উঠিলেন।

হিন্দু তন্ত্রের এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেন, তাহা পরে বলিতেছি। ধরুন, যদি অক্ষোভ্য শিবই হন, তিনি তারার মাথায় থাকেন কেন? শৈব দেবদেবী আরও ত যথেষ্ট আছে, অপর কাহারও মাথায় ত শিবের মূর্ত্তি থাকিতে দেখা যায় না। তবেই দেখা যাইতেছে, হিন্দুদের একজটা বলিয়া কোন দেবী নাই অথচ তারা বলিয়া একজটার একটি রূপান্তর রহিয়াছে। হিন্দুদের নানারূপ মুদ্রা রহিয়াছে; কিন্তু কোন মুদ্রারই অলঙ্কাররূপে দেবদেবীর শরীরে যোজিত হইবার কোন অবকাশ নাই। অতএব এই তিনটি প্রশ্নেরই হিন্দু শাস্ত্রমতে মীমাংসা করা গেল না।

অবশ্য হিন্দু তন্ত্রে লিখিত কথায় অবিশ্বাস করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিতে পারে না এবং পূর্ব্বে আমারও কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আজ দশ বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধ তন্ত্র-শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমার পূর্ব্ব ধারণাগুলি এক এক করিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে হইতেছে। এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র পাশাপাশি ফেলিয়া মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ পাওয়ায় অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং আমার বিশ্বাস, যিনিই এইরূপভাবে মিলাইয়া দেখিবার অবকাশ পাইবেন, তিনি আমার মতের সহিত একমত হইতে পারিবেন। বৌদ্ধ তন্ত্র বিষয়ে গবেষণা করিতে গিয়া প্রথমে হিন্দু তন্ত্র সম্বন্ধে আমার একটা সন্দেহ আসে এবং এই বিষয় লইয়া যত বেশী আলোচনা করিতেছি, ততই এই সন্দেহ ঘনীভূত হইতেছে।

সাধনমালা বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজে প্রকাশ করিবার সময় তাহাতে দেখি, একজটা নামে এক দেবী রহিয়াছেন এবং তাঁহার মন্ত্র সম্বন্ধে সেখানে বলিতেছে,—

আর্য্য একজটায়াস্তু মন্ত্ররাজো মহাবলঃ।
অস্য শ্রবণমাত্রেণ নির্ব্বিঘ্নো জায়তে নরঃ॥
সৌভাগ্যং জায়তে নিত্যং বিলয়ং যান্তি শত্রবঃ।
ধর্ম্মস্কন্ধো ভবেন্নিত্যং বুদ্ধতুল্যো ন সংশয়ঃ॥

সাধনমালা, ১ম ভাগ, পত্র ২৬২।

তা ছাড়া একজটার পূজাপদ্ধতির উপর অন্ততঃ ৮টি সাধনা সাধনমালায় দেওয়া আছে। যদি কাহারও দেখিবার ইচ্ছা হয়, তিনি ১০০, ১০১, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭ ও ১২৮ নম্বরের সাধনাগুলি দেখিয়া লইবেন। একজটার নানারূপে মূর্ত্তিভেদ কল্পিত হইয়াছিল— এক মুখ দুই হাত হইতে আরম্ভ করিয়া বার মুখ ষোল হাত মূর্ত্তি পর্য্যন্ত কল্পিত হইয়াছিল। ইনি নানা প্রকার নামেও পরিচিত হইতেন, ইহাকে উগ্রতারা, মহাচীনতারা, বিদ্যুজ্জ্বালাকরালী,

আর্য্য একজটা ও শুক্ল একজটা বলা হইত। একজটা দেবীর যে রূপ মহাচীনতারা নামে পরিচিত ছিল, তাহা আমাদের হিন্দু তারার রূপের সহিত হুবহু এক। ইহাই হিন্দু তন্ত্রের কথায় অবিশ্বাস করার প্রথম কারণ।

তারা পঞ্চমুদ্রায় বিভূষিত বলিয়া বলা হইয়াছে। পঞ্চমুদ্রা বলিতে কি বুঝায়, হিন্দু তন্ত্রের সাহায্যে তাহা জানা গেল না। সাধনমালায় ইহার সমাধান করা আছে। সেখানে দেখি, বৌদ্ধেরা ছয়টি মুদ্রা মানিত; এই মুদ্রা দেবদেবীর শরীরে অলঙ্কাররূপে যোজিত হইত। এই ছয়টি মুদ্রা হইতে যেমন যেমন একটি কি দুইটি বাদ দেওয়া হইত, তেমনি তেমনি উহা পঞ্চমুদ্রা বা চতুর্মুদ্রা বলিয়া পরিচিত হইত। সাধনমালায় নিম্নলিখিত শ্লোকে ছয় মুদ্রার বিবরণ দেখিতে পাই,—

কণ্ঠিকা রুচকং রত্নকুণ্ডলং ভস্মসূত্রকম্।
ষট্ বৈ পারমিতা এতা মুদ্রারূপেণ যোজিতাঃ॥

অর্থাৎ গলার হার, বালা, রত্ন, কুণ্ডল, ভস্ম ও যজ্ঞোপবীত, এই ছয়টি পারমিতা স্বরূপ এবং উহা মুদ্রারূপে যোজিত হয়।

সাধনমালায় অনেক দেবদেবীর শরীরে মুদ্রার অলঙ্কার দেওয়া হইত। এই সকল বিবরণ পাঠ করিলে বোধ হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে ছয় মুদ্রার ভিন্ন ভিন্ন গণনা আছে এবং উপরোক্ত শ্লোকটি কোন একটি তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত। কারণ, কোথাও কোথাও চক্রী বলিয়া আর একটি আভরণকে ছয় মুদ্রার ভিতর পরিগণিত হইতে দেখি, কোথাও বা তাহার বদলে মেখলা দেখা যায়, আবার কোথাও বা চক্রী ও মেখলা দুইই দেখিতে পাই। কিন্তু এটা বোধ হয় স্থির যে, এই আভরণগুলি নরাস্থি হইতে নির্মিত হইত এবং প্রত্যেক মুদ্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক একটি ধ্যানিবুদ্ধ থাকিত। ইহা শান্তিপাদের লিখিত হেরুকের নিম্নলিখিত মূর্ত্তি-কল্পনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়,—

শিরস্যক্ষোভ্যাত্মকনরশিরোঘটিতচক্রীধরং কর্ণে অমিতাভাত্মকনরাস্থিকুণ্ডলিনং। কণ্ঠে রত্নসম্ভবাত্মককণ্ঠিকাযুক্তং হস্তে বৈরোচনাত্মকরুচকধরং কট্যামমোঘসিদ্ধ্যাত্মক-মেখলাযুক্তং···।

অর্থাৎ হেরুকের মাথায় অক্ষোভ্য ধ্যানিবুদ্ধ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত নরাস্থিনির্মিত চক্রী (অনেকটা টায়রার মত) থাকে, কর্ণে অমিতাভ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত নরাস্থিনির্মিত কুণ্ডল থাকে, কণ্ঠে রত্নসম্ভব কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হার থাকে, হাতে বৈরোচন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বালা থাকে এবং কটিতে অমোঘসিদ্ধি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত মেখলা থাকে।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধেরা মুদ্রা বলিতে কি বুঝায়, তাহা জানিত। কোন্ মুদ্রাটি কোন্ অঙ্গে যোজিত হয়, তাহাও জানিত, এবং কোন্ মুদ্রায় কোন্ ধ্যানিবুদ্ধ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহাও জানিত। জানিত—কারণ, এই ছয়টি বিশেষ মুদ্রা তাহাদেরই সামগ্রী, তাহাদেরই কল্পিত। হিন্দু তন্ত্রে মধ্য হইতে দেবী লওয়া হইয়াছে, মন্ত্র লওয়া হইয়াছে; কিন্তু খুঁটিনাটি লওয়াও হয় নাই, বুঝিবার চেষ্টাও হয় নাই। যখন চেষ্টা হইল, তখন বৌদ্ধ ধর্ম ভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও যা হয় একটা অর্থ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেটা অনেকটা ঝাঁসা দেওয়ার মত। এটাও হিন্দু তন্ত্রের কথায় অবিশ্বাস করিবার দ্বিতীয় কারণ।

একজটার মাথায় বা তারার মাথায় অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি থাকে কেন? ইহার মীমাংসা একমাত্র বৌদ্ধ মূর্ত্তিশাস্ত্রের ভিতর দিয়া হইতে পারে। তারার মাথায় শিব থাকে, যেহেতু শিবের ক্ষোভ নাই—এ যুক্তির সারবত্তা গ্রহণ করা কিছু কঠিন। কিন্তু বৌদ্ধ মূর্ত্তিশাস্ত্রে দেখিতে পাই, বৌদ্ধেরা পাঁচ ধ্যানিবুদ্ধকে আদি দেবতা বলিয়া মানে। ইহারা পাঁচ জনে পাঁচটি স্কন্ধের আবার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই পাঁচ স্কন্ধ হইতেই সমগ্র সৃষ্টির উৎপত্তি; কাজেই পাঁচ ধ্যানিবুদ্ধই বৌদ্ধদের মতে আদি দেবতা। ইহাদের নাম নিম্নলিখিত শ্লোকে সাধনমালায় দেওয়া হইয়াছে,—

জিনো বৈরোচনঃ খ্যাতো রত্নসম্ভব এব চ।
অমিতাভামোঘসিদ্ধিরক্ষোভ্যশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য, এই পাঁচ জন জিন বা ধ্যানিবুদ্ধ বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের দেখিতে সব একই প্রকারের। সকলেই ধ্যানাসনে বসিয়া থাকেন, সকলেরই এক মুখ, দুই হাত, গাত্রে ভিক্ষুদিগের বেশ। ইঁহাদের মধ্যে কেবল তফাৎ মুদ্রায় এবং গায়ের রংএ।

প্রত্যেক ধ্যানিবুদ্ধের এক একটি বুদ্ধশক্তি আছেন এবং ইঁহাদের সকলেরই পুত্র বা কন্যাস্থানীয় বোধিসত্ত্ব ও শক্তি আছে। অতএব যত দেবদেবী বৌদ্ধ সঙ্ঘে আছেন, সকলেই এক বা অন্য ধ্যানিবুদ্ধকুলের অন্তর্গত। কোন্ কুলে কোন্ বোধিসত্ত্ব বা শক্তি উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য এই বোধিসত্ত্বগুলির মাথায় ধ্যানিবুদ্ধের একটি ছোট মূর্ত্তি চিহ্নস্বরূপে ধারণ করিতে হয়। এইরূপ বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝা যায়, তিনি কোন্ কুলের অন্তর্গত এবং তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ। যাঁহারা মনোযোগ সহকারে নানা স্থানের যাদুঘরে রক্ষিত বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিবেন, অনেকগুলি মূর্ত্তির

মাথায় একটি একটি ছোট মূর্ত্তি থাকে। এই ছোট মূর্ত্তিগুলিই দেখায়—কোন্ ধ্যানিবুদ্ধ হইতে সেই বোধিসত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। যে বোধিসত্ত্ব বা শক্তি অমিতাভ ধ্যানিবুদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি অমিতাভের সমাধিমুদ্রাচিহ্নিত একটি ছোট মূর্ত্তি মস্তকের উপর ধারণ করিবেন। যিনি অক্ষোভ্য ধ্যানিবুদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি ভূমস্পর্শ-মুদ্রাচিহ্নিত অক্ষোভ্যের একটি ছোট মূর্ত্তি মাথায় ধারণ করিবেন। বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রের সকল দেবদেবী সম্বন্ধেই এই বিধান লিখিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে বৌদ্ধ দেবদেবীর মাথায় জন্মদাতা ধ্যানিবুদ্ধের মূর্ত্তি থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এরূপ বিধান হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রে বা পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ তারার মাথায় অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তারা তাহা হইলে অক্ষোভ্য ধ্যানিবুদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অক্ষোভ্য দ্বেষকুলের প্রবর্ত্তক, তাঁহার রং নীল এবং তাঁহার মুদ্রা ভূমিস্পর্শ এবং তিনি বিজ্ঞান-স্কন্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তারাকে হিন্দুরাও আপনার বলিয়া বলিতেছেন, বৌদ্ধেরাও নিজের বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি মাথায় ধরার জন্য মনে হয় নাকি যে, তারা নির্জলা বৌদ্ধ দেবতা?

তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে, তারা হিন্দু দেবতা নহেন। ইনি বৌদ্ধদের একজটা দেবীর একটি রূপান্তরবিশেষ এবং ইহা মহাচীনতারা বলিয়া বৌদ্ধ সাহিত্যে খ্যাত। বৌদ্ধ সাহিত্যে তারার যাহা ধ্যান পাওয়া যায়, তাহাতে হিন্দু তারা ও বৌদ্ধ মহাচীনতারার রূপের কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু এখন কথা উঠিতে পারে, তারা কত দিনের পুরাণ এবং তাঁহার প্রথম নামোল্লেখ কোথায় পাওয়া যায় এবং যদি পাওয়া যায়, তাহা হিন্দুদের গ্রন্থে, না বৌদ্ধদের। সাধনমালা নামক বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থে দেখিতে পাই, আর্য্যনাগার্জুন-পাদ একজটার সাধনা ভোট বা তিব্বত দেশ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই আর্য্যনাগার্জুনপাদ সিদ্ধ নাগার্জুন বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং তিনি মাধ্যমিকবাদের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুন হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি। তাঁহার সময় এখনও ঠিক করিয়া নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে যে সকল মালমশলা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীতি হয় যে, সিদ্ধ নাগার্জুন সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এই নাগার্জুন তান্ত্রিক ছিলেন এবং বৌদ্ধ বজ্রযান সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তিনি প্রথম একজটার পূজা-পদ্ধতির প্রচলন করেন। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের তারা সম্বন্ধে এমন কোন গ্রন্থই নাই, যাহা নিঃসন্দেহে সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে। ইহা হইতেই মনে হয়, হিন্দুরা বৌদ্ধদের নিকট হইতেই এই দেবীকে গ্রহণ করিয়াছেন।

যদি তারা বৌদ্ধ হন, তাহা হইলে তারার বিভিন্ন মন্ত্রাক্ষর-সমবায়ে যে বাকী সাতটি দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই বা কেন বৌদ্ধদেবতা না হইবেন? তারার মন্ত্রাক্ষর হ্রী স্ত্রী হুঁ ফট্ হিন্দু তন্ত্রের কথানুযায়ী মহাচীন বা ভোট দেশ হইতে আসিয়াছে। তারাতন্ত্রে বলে, বুদ্ধদেবের নিকট হইতে বশিষ্ঠ এই মন্ত্র পাইয়াছিলেন। সেখানে আরও বলে, এই তারা মন্ত্রের জোরে বশিষ্ঠ নক্ষত্রলোকে গিয়াছেন, সদাশিবও ইহার বলে সকলের বড় হইয়াছেন, দুর্ব্বাসা, ব্যাস, বাল্মীকি, ভারদ্বাজ আদি পুরুষেরা কবিত্ব লাভ করিয়াছেন, ভীমসেন, অর্জ্জুন আদি ক্ষত্রিয়েরা বিজয় লাভ করিয়াছেন। তারাতন্ত্রের এই কথা অপরাপর তন্ত্রেও ধ্বনিত হইয়াছে। রুদ্রযামল ব্রহ্মযামল আদি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং প্রামাণিক হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রেও তারামন্ত্র যে বুদ্ধের নিকট হইতে প্রথম বশিষ্ঠ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

হিন্দুরাই যখন তাঁহাদের নিজের কোন মন্ত্র বুদ্ধদেবের নিকট হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থে স্বীকার করেন, তাহা হইলে স্বতঃই প্রমাণ হয় যে, তারা বৌদ্ধদিগেরই দেবতা, তারামন্ত্রও বৌদ্ধদের নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্র, এবং সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া যায় না। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তারার আর সাতটি রূপভেদ যথা,—উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী সকলেই যে বৌদ্ধ হইবেন, তাহাতে আর কি মতভেদ থাকিতে পারে?

এই সাতটির ভিতর আবার উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা ও কামেশ্বরীর পূজাপদ্ধতির আজকাল বিশেষ চলন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাকী কয়জন কালী, সরস্বতী, ভদ্রকালী, সকলেরই পূজার আজকালও বেশ প্রচলন আছে। অবশ্য ইঁহারা বৌদ্ধদেবী হিসাবে পূজা পান না, ইঁহারা হিন্দুদেবী হিসাবেই পরিচিত এবং যাঁহারা ইঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অজ্ঞাতসারেই বৌদ্ধদেবীদের পূজা দিয়া আসিতেছেন। অনেকেই বোধ হয়, বেহুলার গল্প, চাঁদ সদাগরের গল্প পড়িয়াছেন, এই গল্পে দেখিতে পাই—কি করিয়া মনসা বা বিষহরির পূজা হিন্দুদের ভিতর প্রবেশ করে। এই বিষহরি বা মনসা নিশ্চয়ই অহিন্দু দেবতা ছিলেন, খুব সম্ভব ইনি বৌদ্ধ জাঙ্গুলী দেবতা। চাঁদ সদাগরের গল্প দেখিয়া বুঝা যায়, এই দেবীর পূজা হিন্দুদিগের মধ্যে চালাইয়া দিবার জন্য কিরূপ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ঠিক এই ভাবেই পূর্ব্বে কালী, তারা, সরস্বতী, ভদ্রকালী ইত্যাদি দেবীরা হিন্দু পূজাপদ্ধতির ভিতর প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। কালীপূজায় ছাগল, মহিষ, এমন কি, পূর্ব্বে নরবলিও হইত বলিয়া শুনা যায় এবং সেই পূজাসূত্রে নানারূপ বীভৎস আচারাদির কথাও শুনা যায়; বাস্তবিক বলিতে, সাধারণর হির মনেন্দুর

সেগুলি সময় সময় ঘৃণা উৎপাদন করিয়া থাকে ; ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল এই সকল আচারাদি বৌদ্ধদিগের, হিন্দুদিগের নহে। এইরূপ হাজার হাজার প্রাণীর হিংসা হিন্দু-ধর্ম্মে অনুমোদন করা শক্ত এবং এই জন্য বাঙ্গালাদেশের ব্রাহ্মণদিগকে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা কিঞ্চিৎ ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। বস্তুতঃ, তন্ত্রের আক্রমণ বাঙ্গালা দেশে যেরূপ প্রবলবেগে হইয়াছিল, সেরূপ ভীষণ ভাবে তাহা অন্যান্য প্রদেশকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই। ফল কথা, কালী পূজা, কালীর মন্ত্র এবং কালীপূজার আনুষঙ্গিক ব্যাপার কোনটাই হিন্দু নহে, সমস্তটাই ছাঁকা বৌদ্ধ ব্যাপার। কেবল আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়, কি করিয়া আমরা এইরূপ একটা প্রকাণ্ড বৌদ্ধ দেবতাকে এত কাল হিন্দু দেবতা বলিয়া উপাসনা এবং পূজা করিয়া আসিয়াছি।

তারপর সরস্বতী। কেহ কেহ বলিবেন, সরস্বতী বৈদিক দেবতা, পুরাণেও তাঁহার পূজা আছে, এবং পুরাণগুলি প্রায়ই তান্ত্রিক যুগের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সে সকল কথা অস্বীকার করা হইতেছে না, এবং তাহা অস্বীকার করিবার যোও নাই। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে আমরা যে সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকি, তিনি নিশ্চয়ই তারার রূপভেদ মাত্র, তিনি বৈদিক বা পৌরাণিক সরস্বতী নহেন। অঞ্জলি দিবার সময় আমরা বলিয়া থাকি—"ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্র-কাল্যৈ নমো নমঃ," এ জায়গায় সরস্বতীর সহিত এক নিঃশ্বাসে ভদ্রকালীকে নমস্কার করা হইয়া থাকে। এই ভদ্রকালী তারার একটি রূপভেদ ; যখন ভদ্রকালীর সহিত সরস্বতীর সংযোগ করা হইয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে আমরা যে সরস্বতীর পূজা করিতেছি, তিনি তারার অন্য একটি রূপভেদ ।

যদি তাহাই হয়, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে লোপ হইয়াছে বলাটা নিতান্ত ভুল। যদি কালী বৌদ্ধ দেবতা হন, তাহা হইলে বাংলা দেশের শতকরা ৯৯ জন বৌদ্ধ, ইহার ভিতর কতক নির্জ্জলা বৌদ্ধ, কতক ভেজাল দেওয়া। কে নির্জ্জলা, কে ভেজাল, এখন ধরা বড় শক্ত। যাই হউক, এই সকল বিষয়ে চর্চ্চার পথ পূজনীয় পিতৃদেব প্রথম দেখাইয়াছেন। সেই পথ ধরিয়া যুক্তিবলে যেখানে গিয়া পড়িতেছি, তাহা অপ্রিয় হইলেও শুনিতে হইবে।

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য

প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহ

বাঙ্গালার বিক্রমাদিত্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বঙ্গের গৌরবস্থল বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আজিও বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতেছে।

"যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতি অযুত তুরঙ্গ সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥
তার খুড়া মহাকায় আছিল বসন্তরায়
রাজা তারে সবংশে কাটিল।
তার বেটা কচুরায় রাণী বাঁচাইল তায়
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল॥
ক্রোধ হইল পাতশায় বান্ধিয়া আনিতে তায়
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।
বাইশী লস্কর সঙ্গে কচুরায় ল'য়ে রঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা॥"

'অন্নদামঙ্গলে'র এ কথা কোন্ বাঙ্গালী অবগত নহে? জাহাঙ্গীরের আদেশে মানসিংহ বাঙ্গালায় আসিয়া কি করিলেন? রায়গুণাকর বলিতেছেন যে, তিনি ক্রমে ক্রমে প্রতাপের রাজধানী যশোরের নিকট উপস্থিত হইলে, প্রতাপের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া যায়। সেই যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত ও বন্দী হন।

"পাতশাহি ঠাটে কবে কেবা আঁটে : বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া প্রতাপ আদিত্য হারে॥
শেষে ছিল যারা পলাইল তারা মানসিংহে জয় হৈল।
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া প্রতাপ আদিত্যে লৈল॥
দলবল সঙ্গে পুনরপি রঙ্গে চলে মানসিংহরায়।
ললিত সুছন্দে পরম আনন্দে রায়গুণাকর গায়॥"

কেবল রায়গুণাকরের গীতে নহে, কৃষ্ণনগররাজবংশের বিবরণ 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে' আমরা দেখিতে পাই,—

"তদানীঞ্চ বঙ্গাদিবিষয়েষু প্রতাপাদিত্যপ্রধানা দ্বাদশ রাজানো নিষ্করং পৃথিবীমুপভুঞ্জতে স্ম। তেষ্বপি প্রতাপাদিত্যো মহাসত্ত্বো বিজিতারিবর্গো মহাধনসম্পন্নঃ ক্ষিতিতলবিখ্যাত আসীৎ। ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরোঽপি করং গ্রহীতুং বহুসৈন্যান্যাদিশ্য একাদশ নৃপতীন্ স্ববশমানিনায়, প্রতাপাদিত্যস্তু পুনঃ পুনঃ প্রেষিতেন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরবহুসৈন্যানি নির্জিত্য দ্বিতীয়েন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বর ইব ররাজ। অস্মিন্নেব সময়ে জাঁহাগীরনগরাধিকৃতামাত্যেন হুগলিসংস্থিতামাত্যেন চ প্রতাপাদিত্যস্য দৌর্জন্যং বহুবিধং লিপিদ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরং বিজ্ঞাপয়ামাস যথা প্রতাপাদিত্যো বহুবলসম্পন্নঃ যস্য দ্বারি দ্বাপঞ্চাশৎসহস্রচর্ম্মিণঃ একপঞ্চাশৎসহস্রধন্বিনঃ অশ্বারোহা অপি বহবঃ মত্তহস্তিনাং বহুযূথাঃ সন্তি অন্যে চাসংখ্যমুদ্গরপ্রাসাদিহস্তাঃ এভির্বলৈঃ স ক্ষুদ্রান্নৃপান্ বাধতে। কিং বহুনা স্ববংশ্যানপি প্রায়ো নিঃশেষয়ামাস। তদ্বংশে তন্নিহতপিত্রাদিস্বজন একঃ শিশুঃ পলায়নপরো ধাত্র্যা কচ্চীবনে রক্ষিতঃ অতস্তং কচুরায়নামানং কথয়ন্তি। কচুরায়ঃ পারসীকাদিশাস্ত্রমধীতে দয়ালুনৃপলক্ষণশীলশ্চ প্রতাপাদিত্যস্তং হন্তুমনুদিনং মৃগয়তে। অস্মানপি বাধিতুং প্রবর্ত্ততে। অতো গজাশ্বাদিপরিবারিতবহুসেনাপতিভিঃ সহ যদি কশ্চিৎ প্রধানামাত্যঃ সমায়াস্যতি তদা বয়ং তদনুচরীভূয় প্রতাপাদিত্যং বদ্ধা প্রেষয়িষ্যাম ইত্যাদি। অনন্তরমিন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরো লিপিতঃ প্রতাপাদিত্যস্য দৌর্জন্যং সমধিগচ্ছন্ কচুরায়েনাপি ইন্দ্রপ্রস্থপুর-গতেন সাক্ষিণেব তদানীমেব তদ্দৌর্জন্যং গোচরীকৃতম্। অথ ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরো রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরো দ্বাবিংশত্যা সেনাপতিভিঃ সহ মানসিংহনামানং কঞ্চিৎ প্রধানামাত্যমাদিদেশ যথা মানসিংহ ভবান্ মহতা সৈন্যেন পরিবারিতঃ প্রতাপাদিত্যং দুরাত্মানং ঝটিতি বদ্ধা সমানয়তু। ততো মানসিংহো মহা-প্রসাদোঽয়ং দেবস্যেত্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায় বহুসৈন্যবৃতো নির্জগাম।" ইহা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, বাঙ্গালায় যে বার জন ভুঁইয়া বিনা করে রাজ্য ভোগ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত বলশালী ও ধনশালী ছিলেন। বাদশাহ এগার জন ভুঁইয়াকে স্ববশে আনিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপাদিত্য বাদশাহী সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয় দিল্লীশ্বররূপে বিরাজ করিতেন।

প্রতাপাদিত্যের পরাক্রমের কথা বাঙ্গালার সরকারী কর্ম্মচারীরা বাদশাহকে জানাইয়াছিলেন। তিনি যে অত্যন্ত বলশালী ছিলেন এবং তাঁহার নিকট বায়ান্ন হাজার ঢালী, একান্ন হাজার তীরন্দাজ, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী, বহুযূথ হস্তী ও অসংখ্য মুদ্গরধারী সৈন্য প্রভৃতি ছিল, এসকল কথা জানাইতেও তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই। কেবল তাহা নহে, প্রতাপাদিত্য যে অন্যান্য রাজাদিগকে বাধা প্রদান করিয়া স্ববংশীয়দিগকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন ও ধাত্রীকর্ত্তৃক কচুবনে রক্ষিত হইয়া কচুরায় নামে একটি শিশু জীবিত ছিল, তাহাও লিখিয়া পাঠান। তাঁহারা একজন প্রধান অমাত্যকে বহু সৈন্য-সামন্তসহ বাঙ্গালায় পাঠাইবার জন্য বাদশাহের নিকট প্রার্থনা করেন। সেই সময়ে কচুরায় দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া বাদশাহকে সমস্ত কথা জানাইলে, বাদশাহ রাজা মানসিংহকে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দেন। মানসিংহ বাঙ্গালায় আসিয়া প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করিয়া, লৌহপিঞ্জরে ভরিয়া যে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন, সে কথাও আমরা 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে' দেখিতে পাই।

"অথ বিনষ্টদুর্গপ্রতাপাদিত্যসৈন্যং মানসিংহসৈন্যঞ্চ পরস্পরপ্রাপ্তসমক্ষং বহুধা বহুদিবসং যুদ্ধ-পরায়ণং বভূব। উভয়সৈন্যমেব কিয়ৎ কিয়ৎ ননাশ। অথ প্রতাপাদিত্যবলং স্বল্পাবশিষ্টতুরগসমাকীর্ণ-মবলোক্য মজুমদারেণ সহ মন্ত্রয়িত্বা মানসিংহো বহুবিধবহুকরিতুরগগণসঙ্কীর্ণ একদৈব সহস্রসহস্র-তুরগাদিভিরুপেতঃ প্রতাপাদিত্যসৈন্যং পরিপ্রাপ্তঃ ক্ষণেন তদুপমর্দ্দ্য প্রতাপাদিত্যং বদ্ধা লৌহময়-পিঞ্জরে নিক্ষিপ্য পুনরিন্দ্রপ্রস্থস্থং জবনাধিপং নিবেদিতুং চলিতঃ।" 'অন্নদামঙ্গল' হইতে আমরা জানিয়াছি যে, সে সময়ে জাহাঙ্গীর দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন। 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে' কিন্তু বাদশাহের নাম নাই। তবে ঢাকার 'জাহাঙ্গীরনগর' নামের উল্লেখে জাহাঙ্গীরই বাদশাহ ছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

'ঘটককারিকা' হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রতাপাদিত্য সপুত্রক বসন্তরায়কে নিহত করিলে তাঁহার শিশুপুত্র রাঘব রাণীকর্ত্তৃক কচুবনে রক্ষিত হইয়া কচুরায় নাম প্রাপ্ত হন। কচুরায় দিল্লীশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতাপাদিত্যের কথা জানাইলে, এই অমঙ্গল সংবাদ শুনিয়া, বাদশাহ জাহাঙ্গীর সেনাপতি আজিম খাঁকে পাঠাইয়া দেন।

"সংবাদমশিবং শ্রুত্বা জাহাঙ্গিরো মহীপতিঃ।
প্রেষয়ামাস সেনানীমাজিমখানসংজ্ঞকং॥"

আজিম খাঁ কিন্তু আকবরের সময়ে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং সেই সময়ে প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল। যশোর-চাঁচড়ার রাজবংশের আদিপুরুষ ভবেশ্বর রায় আজিম খাঁকে সাহায্য করায়, প্রতাপের অধিকৃত রাজ্য হইতে সৈদপুর প্রভৃতি চারিটি পরগণা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া

আজিম খাঁ ভবেশ্বরকে প্রদান করিয়াছিলেন। এ কথা চাঁচড়া-রাজবংশের কাগজপত্র হইতে জানা যায়। 'ঘটককারিকা'য় প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে আজিম খাঁ নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া যাহা লিখিত আছে, তাহা সত্য নহে। প্রতাপাদিত্যের অবসানের বহু বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'ঘটককারিকা'য় আজিম খাঁর পর বাদশাহ-প্রেরিত যে বাইশ জন খাঁ বা আমীরের আগমনের কথা আছে, 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে' ও 'অন্নদামঙ্গলে' তাঁহারা মানসিংহের সহিত আসিয়াছিলেন বলিয়া দেখা যায়। 'ঘটককারিকা'র মতে এই বাইশ জন আমীরও নিহত হইলে, বাদশাহ রাজা মানসিংহকে পাঠাইয়া দেন।

> "দিল্লীশ্বরস্তথা শ্রুত্বা খানাঃ সর্ব্বে হতাঃ রণে।
> ক্রোধানলেন সন্তপ্তঃ প্রলয়াগ্নিসমোঽভবৎ॥
> প্রেষয়ামাস রাজেন্দ্রং মানসিংহং মহাবলং।"

'ঘটককারিকা'য় প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের মহাযুদ্ধের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর দেখিতে পাই, মানসিংহ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, রাঘব বা কচুরায়কে রাজ্য প্রদান করিয়া, প্রতাপাদিত্যকে লৌহপিঞ্জরে পুরিয়া বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া দেন।

> "জিত্বা তু সমরং মানঃ হর্ষেণ মহতাবৃতঃ।
> দিল্লীশাদেশতো রাজ্যং রাঘবায় দদৌ মুদা॥
> লৌহপিঞ্জরমধ্যেতু প্রতাপমবরুধ্য চ।
> ত্বরিতং প্রেষয়ামাস দিল্লীশস্য চ সন্নিধিং॥"

'অন্নদামঙ্গল', 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত' ও 'ঘটককারিকা' হইতে এই কথা প্রচলিত হইয়াছে যে, রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া লইয়া যান। এ কথা বাঙ্গালীর হৃদয়ে একরূপ বদ্ধমূল হইয়াই রহিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, সুবেদার ইস্‌লাম খাঁ চিস্তির সময় প্রতাপের অবসান ঘটিয়াছিল। এ কথা প্রথমে প্রতাপাদিত্যচরিত্রকার রামরাম বসু মহাশয় উল্লেখ করেন। তাঁহার বহু পূর্ব্ব হইতে 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতির কথা লোকের মনে বদ্ধমূল থাকায়, সকলে সে কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, মির্জ্জা নহন-প্রণীত 'বহারিস্তান-ই-ঘাইবী' নামক পুস্তক হইতে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সুবেদার ইস্‌লাম খাঁ চিস্তির সময়েই প্রতাপের পতন ঘটে এবং স্বয়ং মির্জ্জা নহন প্রতাপের সহিত যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। বসু মহাশয় প্রতাপাদিত্যের বিবরণ কিছু কিছু পারস্য ভাষায় লিখিত আছে বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি 'বহারিস্তানে'র কথা

জানিতেন। 'রাজনামা' নামে পারস্য গ্রন্থেও প্রতাপাদিত্যের কথা আছে বলিয়া শুনা যায়। 'বহারিস্তানে'র কথা প্রকাশের পর, মানসিংহ যে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা আর বলা চলে না। তবে কি মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের কোনই সংঘর্ষ ঘটে নাই? আমরা এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব।

আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে রাজা মানসিংহ প্রথমবার বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সে সময়ে বাঙ্গালায় ও উড়িষ্যায় পাঠানদিগের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। মানসিংহের শাসনকাল প্রধানতঃ পাঠানদিগকে দমন করিতে অতিবাহিত হয়। কতলু খাঁ ও ওসমান্ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে যে অনেক সময়ে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। বার ভুঁইয়ার ঈশা খাঁ ও কেদার রায়কেও তিনি পরাজিত করেন। ইহাও ইতিহাস হইতে জানা যায়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পাঠানদিগকে দমন করিবার জন্য মানসিংহ যে দ্বিতীয়বার সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের সহিত কোন বারে রাজা মানসিংহের সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল কি না, তাহা প্রচলিত ইতিহাস হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় না। তবে মানসিংহ দুইবারেই পাঠানদিগকে দমন করিতে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং এই পাঠানদিগের সহিত প্রতাপাদিত্য-বংশীয়দের যে বিশেষরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা অবশ্য ইতিহাস হইতে জানা যায়। প্রতাপের পিতা বিক্রমাদিত্য ও কতলু খাঁ, শেষ পাঠান নরপতি দায়ুদ খাঁর দক্ষিণ ও বামহস্তস্বরূপ ছিলেন। কতলুর পুত্র জমাল খাঁ প্রতাপের একজন সেনাপতি ছিলেন। এসকল ঐতিহাসিক কথা। সুতরাং প্রতাপের বিদ্রোহ যে পাঠান বিদ্রোহের অঙ্গীভূত, তাহা মনে করা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, প্রচলিত ইতিহাসে কোন বিষয়ের উল্লেখ না থাকিলে, তাহার যে কোনই মূল নাই, এরূপ কথা বলিতে পারা যায় না। অনেক সময়ে প্রবাদাদি হইতেও ঐতিহাসিক সত্য বাহির করিতে হয়। 'নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ' কথাটা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের সঙ্ঘর্ষ বাঙ্গালার একটি চিরন্তন কথা; অবশ্য তাঁহার সময়ে প্রতাপের যে পতন হয় নাই, ইহা এক্ষণে ঐতিহাসিক প্রমাণে স্থির হইতেছে। কিন্তু প্রতাপের সহিত মানসিংহের যে কোনই সম্পর্ক ঘটে নাই, এরূপ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণও আমরা পাই নাই। কাজেই ইহার কোন মূল আছে কি না, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়। 'অন্নদামঙ্গল', 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত', 'ঘটককারিকা' প্রভৃতিতে মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের সঙ্ঘর্ষের কথা আছে। যদিও সে সময়ে তাঁহার পতনের কথা সত্য নহে, তথাপি সঙ্ঘর্ষটাও যে একেবারে মিথ্যা, তাহা কি করিয়া বলা যাইতে পারে?

যে প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে ইস্লাম খাঁ চিস্তির সময়ে প্রতাপের পতন, এই ঐতিহাসিক

কথাটার উল্লেখ আছে, তাহাতেই মানসিংহের সহিত প্রতাপের সঙ্ঘর্ষের কথাটা না থাকিলেও সম্পর্কের যে একটা কথা আছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। বসু মহাশয়ের মতে বাদশাহ প্রথমে আবরাম খাঁ নামে একজন পাঁচহাজারী মনসবদারকে প্রতাপের দমনের জন্য পাঠাইয়া দেন, তিনি প্রতাপের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। আজিম খাঁর সুবেদারীর সময়ে ফতেপুর শিক্রীর শেখ্ সেলিমের ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ্ ইব্রাহিম বাঙ্গালায় ছিলেন ও পাঠানদিগের দমনে নিযুক্ত হন। আজিম খাঁর সহিত প্রতাপের সঙ্ঘর্ষের একটা কথাও আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বসু মহাশয়ের আবরাম খাঁ শেখ্ ইব্রাহিম হইতে পারেন। কিন্তু তিনি পাঁচ-হাজারী মনসবদার ছিলেন না বা বাঙ্গালায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে নাই। আবরাম খাঁর পর একজন সাতহাজারী মনসবদারের প্রতাপের দমনের জন্য আসার কথা 'প্রতাপাদিত্যচরিত্রে' আছে। ইনি কে, জানা যায় না। আজিম খাঁ সাতহাজারী মনসবদারীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। বসু মহাশয় তাঁহার কথা বলিতেছেন কি না, বুঝা যায় না। এই সাতহাজারী মনসবদারও আবরামের দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বসু মহাশয় লিখিয়াছেন। কিন্তু আজিম খাঁর যে, সে দশা ঘটে নাই, তাহা ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে বাইশ জন আমীরের আসার ও তাঁহাদের পতনেরও কথা বসু মহাশয় বলিয়াছেন। 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতিতে মানসিংহের সহিত এই বাইশ জন আমীরের আসার কথা আছে। প্রাচীন যশোর বা ঈশ্বরী-পুরের কতকগুলি সমাধিকে এই আমীর বা ওমরাদিগের সমাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।

ইহার পরই মানসিংহের আগমন। কিন্তু বসু মহাশয়ের মতে মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হয় নাই। প্রতাপাদিত্য মানসিংহকে বর্দ্ধমান হইতে তাঁহার রাজধানীর নিকট মৌতলায় লইয়া গিয়া নানা প্রকার উপহারাদি দিয়া, তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন ও একটি সুন্দরী কন্যাকে নিজের কন্যা প্রচার করিয়া, মানসিংহের পুত্রের সহিত বিবাহ প্রদান করেন। আমরা বসু মহাশয়ের নিজের কথাই উল্লেখ করিতেছি। "বাইশ ওমরার পরে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় আইলেন এবং পাটনা অবধি থানাজাতের সেনারা পূর্ব্বকার আমিরেরদের সহিত আচরণও করিল তাহার সহিত রাজমহল ছাড়াইলে সিংহ রাজা দেখেন সেখানকার থানার লোকেরা আসিতেছে তাহাদের পাছে ২। ইহাতে তিনি স্বসদার হইয়া যশহরে না যাইয়া বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিল। রাজা প্রতাপাদিত্য প্রধান লোক পাঠাইয়া যত্নপূর্ব্বক সিংহ রাজকে লইয়া গেল যশহরে এবং রাজার বাসা হইল মৌতলার কোটে রাজা প্রতাপাদিত্য বিস্তর বিস্তর সওগাত দিয়া সিংহ রাজা নিকট প্রতিপন্ন হইলেন এবং প্রতাপাদিত্য তাহার ডোলার এক সুন্দরী কন্যা আপন কন্যা প্রচার করিয়া বিবাহ দিলেন সিংহ রাজার পুত্রের সহিত। ইহাতেই সিংহ রাজার সহিত

প্রতাপাদিত্যের অধিক অন্তরঙ্গতা হইল।” বসু মহাশয়ের মতে মানসিংহ যশোর হইতে ফিরিয়া যাওয়ার সময় পথিমধ্যে কাশীধামে প্রাণত্যাগ করেন। একথা কিন্তু ইতিহাসসম্মত নহে। ইহার অনেক পরে মানসিংহের মৃত্যু হয়। মানসিংহের পরই উজীর ইস্‌লাম খাঁ চিস্তি আসিয়া সালিখার থানার নিকট প্রতাপের সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার সেনাপতি কমল খোজাকে নিহত করেন। এই সালিখা থানা যমুনা ও ইচ্ছামতী সঙ্গমের কিছু উত্তরে সালিখা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থল, হাবড়ার নিকটস্থ সালিখা নহে। তাহার পর প্রতাপ নিজেই ইস্‌লাম খাঁর নিকট বন্দী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। বাহারিস্তানে সালিখার যুদ্ধ ও কমল খোজার মৃত্যুর কথা আছে। কিন্তু ইস্‌লাম খাঁ উজীর ছিলেন না বা স্বয়ং প্রতাপের সহিত যুদ্ধে আসেন নাই। তিনি বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন ও সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ ও মির্জ্জা সহনকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইঁহাদের সহিত প্রধানতঃ প্রতাপের নৌযুদ্ধই ঘটে, সালিখার পরও যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রতাপ ইনায়েৎ খাঁর নিকটই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ইনায়েৎ খাঁ বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজধানী ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগরে তাঁহাকে লইয়া গেলে, ইস্‌লাম খাঁ প্রতাপকে কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখেন। এইরূপেই প্রতাপের পতন হয়।

বসু মহাশয় মানসিংহের সহিত প্রতাপের সঙ্ঘর্ষের কথা বলেন নাই, তিনি যে প্রতাপকে দমন করিতে আসিয়াছিলেন, সে কথা কিন্তু বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু অন্যান্য স্থানে প্রতাপের সহিত মানসিংহের সঙ্ঘর্ষের কথা দেখিতে পাই। জয়পুর-রাজবংশের বিবরণ ‘বংশাবলী’ নামক পুথিতে আমরা মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে এইরূপ দেখিতে পাই। “অর রাজা পরতাপ-দীপ সূ জগড়ো কীনু। অর ফতে পাই। অর পরতাপদীপকো গড় ছো জীনেঁ খোস্ লীনো। অর বেটো দুরজন সিংঘজী মানসিংহজী কা কাম আয়া। অর জগৎসিংবজী ঘায়ল হুয়া। অর রাব পরতাপদীপ কা লবাজমা কী সংখ্যা—হাথী তো তেরাসৌ অর ফৌজ সরঞ্জাম ভৌৎ ছো। জীসূঁ ফতে পাই।” এখানে আমরা দেখিতেছি যে, প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ হইয়াছিল, সে যুদ্ধে মানসিংহ বিজয় লাভ করেন। তিনি প্রতাপাদিত্যের গড় দখল করিয়া লন। এই যুদ্ধে মানসিংহের এক পুত্র দুর্জ্জনসিংহ নিহত এবং অপর পুত্র জগৎসিংহ আহত হন। প্রতাপাদিত্যের তের শত হস্তী ও অনেক সৈন্য সামন্ত ছিল, তাহাদের সহিত যুদ্ধে মানসিংহ জয়লাভ করেন। মানসিংহের প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়ার কথা এখানে নাই। দুর্জ্জনসিংহ কিন্তু প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে নিহত হন নাই। ইশা খাঁর সহিত যুদ্ধেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। আর জগৎসিংহ প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই

প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আমরা এই 'বংশাবলী' হইতে জানিতে পারিতেছি যে, প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের রীতিমত যুদ্ধই হইয়াছিল।

এইবার আমরা একটি বিশিষ্ট প্রমাণের কথা উল্লেখ করিব। মানসিংহ প্রতাপের দমনের জন্য বাঙ্গালায় আসিলে, প্রধানতঃ কৃষ্ণনগর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মানসিংহ বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজধানী রাজমহল হইতে মুর্শিদাবাদ অতিক্রম করিয়া জলঙ্গী বা খড়িয়া নদীর নিকট উপস্থিত হন। মুর্শিদাবাদের কতকগুলি রাজপুতবংশীয় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের, প্রতাপাদিত্যের দমনের সময় মানসিংহের সহিত আগমন ও ঐ অঞ্চলে বাস করার কথা বলিয়া থাকেন। ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের সৈন্যগণের জলঙ্গী পার হওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সে সময়ে অত্যন্ত ঝড়বৃষ্টি হওয়ায়, তাহাদের রসদেরও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। 'ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিত' ও 'অন্নদামঙ্গলে' এ কথা লিখিত আছে। তাহার পর মানসিংহ ভবানন্দকে সঙ্গে করিয়া যশোরেও লইয়া যান। ভবানন্দ তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ভবানন্দ এ সময়ে সরকারের একজন সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহার কিছু কিছু ভূসম্পত্তিও ছিল। ভবানন্দ যে প্রতাপাদিত্যের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন এবং তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতাপের পরাজয় ঘটে, এইরূপ যে একটা কথা প্রচলিত আছে, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। সরকারী কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে, ভবানন্দ সে সময়ে কাননগো দপ্তরে কাজ করিতেন।[১] কাজেই তিনি অবশ্যই বাঙ্গালার সুবেদারকে সাহায্য করিতে বাধ্য। সে যাহা হউক, ভবানন্দের এই সাহায্যের জন্য মানসিংহ তাঁহাকে ১০১৫ হিজরী বা ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে মহৎপুর প্রভৃতি চৌদ্দটি পরগণার সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। সে সনন্দ কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে রহিয়াছে। ইস্‌লাম খাঁর সময়ে ভবানন্দ কাননগো

---

১ "Bhoveaund, a Bramin, was a Mohirer in the Hughly Canongoe Duptar, and got himself appointed to the Zemindary of Pergunnah Bugwan, Nuddea &c. 14 Mehals, in room of Hurryhoo and Cassinaut Chowdry." (Account of the origin of, and progressive increase of the four great Zemindaries of Bengal delivered into the Bengal Revenue Committee in 1786, by their Dewan Ganga Govinda Sing.—Dissertation concerning the Landed property of Bengal, by C. W. Boughton Rouse 1791).

"According to prevalent tradition or authentic archives of the khalsa, Bobnund, mujmuada or temporary recorder of the jumma of the circar of Hooghly, and Crory or Zemindar of the pergunnah of Aukerah is the first man of note, in his genealogical history. (5th Report,—Grant's view of the Revenue of Bengal. 1786)

পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সনন্দও রাজবাটীতে আছে। ভবানন্দ মানসিংহকে বিশেষরূপ সাহায্য না করিলে কদাচ এরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন না। এই বিশেষ সাহায্য যে প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে সাহায্য প্রদান, তাহা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত' ও 'অন্নদামঙ্গলে'ও এ কথা আছে। এই সনন্দ হইতে আমরা একটি ঐতিহাসিক তথ্যেরও সন্ধান পাই। আমরা বলিয়াছি যে, আকবর বাদশাহের সময় মানসিংহ প্রথমবার বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬০৪ পর্য্যন্ত উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হইলে জাহাঙ্গীর বাদশাহ হইয়া তাঁহাকে আবার বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দেন। তিনি আট মাস কাল পরে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করেন।[২]

এই ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ বা ১০১৫ হিজরীতে মানসিংহের দ্বিতীয়বার সুবেদারীর সময়ে ভবানন্দ মজুমদারের জমীদারী-সনন্দ প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং ইতিহাসের সহিত ইহার ঐক্যও দেখা যাইতেছে। আর এই সময়েই প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের সজ্বর্ষ ঘটিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আকবরের সময় মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের সজ্বর্ষ

---

২ "Certain considerations, nevertheless, prevailed with me sometime afterwards to reinstate the Rajah Man Singlin the Government of Bengal." (Memoir of Jahanguier, p. 19)

"Man Sing was despatched to his Subaship of Bengal. Chan Azim to that of Malwa". (Dow's History of Hindustan, Vol. II. p. 5.)

"He again appointed him (the Raja) to the Government of Bengal, with orders to proceed thither immediately and keep in check the rebellious spirit of the Afgans" (Stewart).

"Jahangir thought it prudent to overlook the conspiracy which the Rajah has made, and sent him to Bengal." (Blochmann)

"When I ascended the throne in the first year of my reign, I recalled Man Singh, who had long been Governor of the country. (Bengal)."(Waki-at-i Jahangiree, Elliot, Vol. VI, P. 327).

"In obedience to the royal orders, Rajah Man Singh returned to Bengal; but at the end of eight months, that is to say, early in the year 1015, he was recalled to the court". (Stewart)

"But" soon after (1015) he was recalled and ordered to quell disturbances in Rohtas. (Blochmann)."

ঘটে।[৩] এরূপ অনুমান করার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। ভবানন্দ মজুমদারের সনন্দ, 'অন্নদামঙ্গল' ও 'ঘটককারিকা' প্রভৃতি একবাক্যে জাহাঙ্গীরের সময়েই মানসিংহের আগমনের কথা প্রমাণ করিতেছে। আর মানসিংহ প্রধানতঃ পাঠানদিগকে দমন করিবার জন্য যে, দ্বিতীয় বার বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহাও ইতিহাস হইতে জানা যাইতেছে। প্রতাপের বিদ্রোহ যে পাঠান বিদ্রোহের অঙ্গীভূত, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ফলতঃ, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মানসিংহের বিদ্রোহের দ্বিতীয়বার সুবেদারীর সময়ে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দেই প্রতাপের সহিত মানসিংহের সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল।

প্রতাপ-মানসিংহের সঙ্ঘর্ষ নিতান্ত সামান্য হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। প্রতাপকে দমন করিতে কৃষ্ণনগর হইতে যশোর যাইবার সময়ে মানসিংহকে নূতন পথ করিয়া যাইতে হইয়াছিল। অদ্যাপি লোকে সেই পথকে মানসিংহের কৃত 'গৌড় বঙ্গের রাস্তা' বলিয়া থাকে। এই পথকে রাজধানী রাজমহলে যাইবার পথের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রতাপের রাজধানী যশোর বা ধূমঘাটের নিকট উপস্থিত হইয়া মানসিংহকে দুর্গভেদ করার জন্য যে বেগ পাইতে হইয়াছিল এবং বিশেষরূপ যুদ্ধের অবতারণা করিতে হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসমূহ হইতে জানিতে পারা যায়। অবশ্য মানসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ই ঘটিয়াছিল এবং তিনি বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্যও হইয়াছিলেন। আর কচুরায়কে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি যশোররাজ্যের ছয় আনা অংশ যে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল, তাহাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মানসিংহ কচুরায়কে যে 'যশোরজিৎ' উপাধি দিয়াছিলেন বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে, তাহাও অসম্ভব নহে। ভবানন্দ মজুমদারের ন্যায় কচুরায়ও মানসিংহকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ফলতঃ, ইস্‌লাম খাঁর শাসনকালে প্রতাপাদিত্যের পতন হইলেও মানসিংহের দ্বিতীয়বার সুবেদারীর সময়ে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সহিত প্রতাপের যে বিশেষরূপে সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল, তাহা স্থিরভাবে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীনিখিলনাথ রায়

---

৩ "যশোহর খুলনার ইতিহাস প্রণেতা স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মিত্র এইরূপ অনুমান করেন। তাঁহার মতে ১৬০৩ খৃঃ অব্দে আকবরের সময় মানসিংহ প্রতাপকে দমন করিতে চান। ১৬০৪ খৃঃ অব্দে কেদার রায়কে পরাজিত করিয়া মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া গিয়া, আকবরের মৃত্যুর জন্য বৎসরাধিক কাল বসাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে জমীদারী-সনন্দ প্রদান করেন। ইহা অত্যন্ত কষ্টকল্পনা বলিয়াই বোধ হয়। মানসিংহ যখন জাহাঙ্গীরের আদেশে পাঠানদিগকে দমন করিবার জন্য দ্বিতীয়বার সুবেদার হইয়া আসিয়াছিলেন ও ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে আবার ফিরিয়া গিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই ভবানন্দের সনন্দের তারিখ হওয়ায়, তখনই যে প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহাই অনুমান করা সমীচীন। আর প্রতাপের বিদ্রোহ যে পাঠান বিদ্রোহের অঙ্গীভূত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধম্মপদ ও উদানবর্গ

বা

চারিটি চীনা অনুবাদ, তিব্বতী অনুবাদ, মূল সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি ধম্মপদের তুলনামূলক সমালোচনা।

পালি ধম্মপদ বাঙালী পাঠকের নিকট অজ্ঞাত নহে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় পালি ধম্মপদ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া মাতৃভাষাকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। ১৯০৬ সালে এই গ্রন্থের প্রথম বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু য়ুরোপে এই গ্রন্থ বহুকাল হইতে সুধীসমাজে সুপরিচিত। দিনেমার পণ্ডিত ফৌজ্‌ব্যোল্ (Fausboll) ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ধম্মপদের এক লাতিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। সেই হইতে য়ুরোপে এই গ্রন্থের বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বোধ করি, য়ুরোপে এমন কোন ভাষা নাই, যাহাতে এই গ্রন্থের তর্জ্জমা না পাওয়া যায়। জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় ধম্মপদের একাধিক অনুবাদ আছে। বহু ভারতীয় ভাষায় এখন এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ এত সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ, এখানির মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতার আঁচ নাই।

পালিতে সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ হইতেছে ধম্মপদ। সিংহলে পালি ধর্ম্মগ্রন্থের যে ভাগ-বিভাগ হয়, তাহার মধ্যে খুদ্দকনিকায় হইতেছে নিকায় গ্রন্থমালার পঞ্চম নিকায়; প্রথম দীঘনিকায়, দ্বিতীয় মজ্‌ঝিম, তৃতীয় সংযুত্ত, চতুর্থ অঙ্গুত্তর, পঞ্চম খুদ্দক। এই খুদ্দকনিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ ধম্মপদ।

পালি ধম্মপদে ২৬টি অধ্যায় আছে; শ্লোক-সংখ্যা ৪২৩। লোক-বিশ্বাস, বুদ্ধদেব এই গাথাগুলি নানা সময়ে শিষ্যদের নিকট বলিয়াছিলেন। তবে আমরা যে-ভাবে ছন্দোবদ্ধ অবস্থায় গাথাগুলি পাই, বুদ্ধদেব ঠিক সেই ভাবে ও ভঙ্গীতেই যে বলিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই গাথাগুলির উপর এক বিরাট্ টীকা আছে, তাহার নাম ধম্মপদট্‌ঠকথা; গ্রন্থকর্ত্তা পালিশাস্ত্রের বেদব্যাস বুদ্ধঘোষ। প্রবাদ যে, টীকাটি মূলে ছিল 'এলু' বা প্রাচীন সিংহলী ভাষায়; বুদ্ধঘোষই তাহাকে পালিতে অনুবাদ করিয়া কৌলীন্য দান করেন। ইংরেজী ভাষায় এই গ্রন্থখানির অনুবাদ হইয়াছে।[১] ধম্মপদের পালি-সংস্করণ ছাড়া অন্য সংস্করণও যে এককালে ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহার

---

১ Harvard Oriental Society, Vol. 3.

প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, গান্ধার বা বর্ত্তমান আফগানিস্থানে ও এমন কি, মধ্য-এশিয়ার খোতান ও নিয়া নদীর তীরস্থ হিন্দু উপনিবেশে এককালে ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে দেত্রুইল দ র‍ঁস (Detruil de Rheins) নামক ফরাশী বৈজ্ঞানিক পর্য্যটক মধ্য-এশিয়ায় কতকগুলি পুথি পান। পুথিগুলি খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা। ফরাশী প্রত্নতাত্ত্বিক সেনার্ (Senart) ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পুথিখানি প্রকাশিত করেন। পুথিখানি ধম্মপদের প্রাকৃত সংস্করণের অংশবিশেষ; পুথিখানি খণ্ডিত; ইহার কিয়দংশ রুষ পণ্ডিত সের্গে ওল্‌ডেনবার্গের হস্তে পড়ে। সেনার্ সমস্ত খণ্ডিত অংশগুলি প্রকাশ করেন।

খরোষ্ঠী লিপিতে খোদিত কতকগুলি অশোক-শিলালিপি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ পূর্ব্বেই জানিতেন; কিন্তু সেই লিপিতে ও তদ্দেশীয় ভাষায় যে ধম্মপদ পাওয়া যাইবে, এ কথা লোকে কখন ভাবে নাই। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, খ্রীষ্টীয় ২য় বা ৩য় শতাব্দী পর্য্যন্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, আফগানিস্থানে, খোটনে ও তন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটি মরু-রাজ্যে প্রাকৃত ভাষা ও খরোষ্ঠী লিপি প্রচলিত ছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে মধ্য-এশিয়ার মরুমধ্যে প্রোথিত নগরসমূহে খনন-কার্য্য আরম্ভ হয়। শত শত বৌদ্ধ বিহার বালুকার কবর হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইল; সেই সঙ্গে বহু সহস্র পুথিও আবিষ্কৃত হইল। সেই আবিষ্ক্রিয়ার ইতিহাস উপন্যাসের ন্যায় আশ্চর্য্য। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, রুষ ও জাপানী অভিযানের ফলে বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাস নূতনভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ সাহিত্য বলিতে যে, কেবল পালিগ্রন্থ বুঝায় না, তাহা হজ্‌সন্ (Hodgson)-আবিষ্কৃত নেপালস্থিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে লোকে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু নেপালে সংস্কৃত সুত্ত ও বিনয় গ্রন্থ কিছুই পাওয়া যায় নাই। অধিকাংশই মহাযান ও তান্ত্রিক গ্রন্থ। কিন্তু মধ্য এশিয়ার মরূদ্যানে যাহা আবিষ্কৃত হইল, তাহা পালির অনুরূপ। সংস্কৃত প্রাতিমোক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে; সংস্কৃত আগমের বহু খণ্ডিত অংশ পাওয়া গিয়াছে। এই আগম হইতেছে নিকায়ের অনুরূপ সাহিত্য। নিকায় হীনযান স্থবিরবাদীদের গ্রন্থ। আগম হীনযান-সর্ব্বাস্তিবাদীদের গ্রন্থ। সাধারণতঃ দীর্ঘ, মধ্যম, সংযুক্ত ও একোত্তর আগমই পরিচিত। ক্ষুদ্রক আগম বস্তুতঃ ছিল কি না, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না; কেন না, চীনে এই গ্রন্থের কোন অনুবাদ নাই—অপরগুলির আছে। এই সকল পুথির মধ্যে সংস্কৃত ধম্মপদ বা উদানবর্গের খণ্ডিত অংশ পাওয়া গিয়াছে। য়ুরোপের নানাদেশের পত্রিকার মধ্যে উদানবর্গের আবিষ্কৃত অংশগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ২য় বা ৩য় শতকের কতকগুলি পুথির পৃষ্ঠা ফরাশী পণ্ডিত পেলিও ১৯০৬ সালে পাইয়াছিলেন; তাহা ডক্টর শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রকাশ করিতেছেন। উদানবর্গের সমগ্র সংস্কৃত গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই; তবে জার্মান পণ্ডিত ল্যুডার্স (Lueders)

আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বার্লিনের ম্যুজিয়ামে উদানবর্গের প্রায় সম্পূর্ণ পুথি আছে। বর্ত্তমানে আমাদের সম্মুখে ধম্মপদের সম্পূর্ণ পালি সংস্করণ, অসম্পূর্ণ প্রাকৃত ও খণ্ডিত সংস্কৃত সংস্করণ রহিয়াছে।

পালি ছাড়া অন্য ভাষায় লিখিত ধম্মপদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকে পূর্ব্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিল; সে সন্দেহ হইয়াছিল চীনা ও তিব্বতী তর্জমা লইয়া। স্তানিস্লাঁস ঝ্যুলিআঁ (Stanislaius Julien) ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম চীন ভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থের তালিকা ফরাশী Journal Asiatique পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তারপর বীল্ (Beal) সাহেবের তালিকা প্রকাশিত হয়। জাপানী পণ্ডিত নান্‌জিও (B. Nanjio)-র বৌদ্ধশাস্ত্রের চীনা তর্জ্জমার তালিকাই বিশেষভাবে সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে সুধীসমাজকে সজাগ করিয়া তোলে। এই সব চীনা গ্রন্থের তালিকা হইতে আমরা স্পষ্ট করিয়া জানিতে পারি যে, চীনা ভাষায় ধম্মপদ ও উদানবর্গ সম্বন্ধে চারিখানি গ্রন্থ আছে। ইতিমধ্যে বীল সাহেব চীনা ধম্মপদের একখানি ইংরেজী তর্জ্জমা প্রকাশ করেন (১৮৭৮ সালে)। তিব্বতী ভাষায় উদানবর্গের অনুবাদ আছে; ইংরেজ পরিব্রাজক ও পণ্ডিত রক্‌হিল্ (W. W. Rockhill) সাহেব ১৮৯২ সালে ঐ গ্রন্থের তর্জ্জমা প্রকাশ করিয়া এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত করেন। চীনা ও তিব্বতী ছাড়া মধ্য-এশিয়ার অপর একটি ভাষায় উদানবর্গের অনুবাদ হইয়াছিল; তুখার ভাষার খণ্ডিত অংশগুলি পণ্ডিতপ্রবর লেভি (S. Levi) সম্পাদন করিয়াছেন (Journal Asiatique, 1911, p. 431)। ইহাই মোটামুটি ভাবে ধম্মপদের অনুবাদের ইতিহাস।

এই বার আমরা এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। চীন ভাষায় যে চারিখানি অনুবাদ আছে, তাহার কালপারম্পর্য্য নিম্নে বর্ণনা করিতেছি। প্রবাদানুসারে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করে ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে; কিন্তু প্রকৃত প্রচার আরম্ভ হয় দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে, যখন পার্থিয়ার রাজকুমার শি-কাও (লোকোত্তম) ও ভারতীয় ভিক্ষু লোকক্ষেম [১] বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য চীনদেশে উপস্থিত হন। পারস্যের কিয়দংশে ও বর্ত্তমান আফগানিস্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল। চীনরাজ্যের হান্‌বংশের রাজত্বকালে যে-সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনে আসেন, তাঁহারা সকলেই ছিলেন মধ্য-এশিয়া ও পারস্যের লোক অথবা প্রবাসী ভারতীয়। মধ্য-এশিয়া হইতে উত্তর-চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি স্রোত গিয়াছিল। দক্ষিণ-চীনে কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে ধারাটি পৌছিল,

---

১ তিব্বতীতে এই নাম চিলুকাক্ষ করিয়াছে; ব্যাপারটা এই,—চীনা ভাষায় হিন্দুদের নামের পূর্ব্বে 'চু' অক্ষর দেয়; তারপর ছিল নামের উচ্চারণের অনুলিখন—লু-কিয়-ছন অর্থাৎ লোকক্ষেম। তিব্বতীরা সমস্তটাকে পড়িল চিলুকাক্ষ Chu-lu-kia-chan.

সেটি আসিল দক্ষিণ-ভারত ও সিংহল হইতে। উত্তর-চীন ও দক্ষিণ-চীনে যে ভেদ আমরা আজ দেখি, তাহা চীন ইতিহাসের গোড়া হইতে রহিয়াছে। দক্ষিণ-চীন যে বৌদ্ধ সাহিত্য ও ধর্ম্ম পাইল, তাহার মধ্যে বিশেষত্বও আছে। প্রথম ধম্মপদ চীনে পৌছিল এই দক্ষিণের পথ দিয়া দক্ষিণ-চীনে।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, দক্ষিণ-চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সমুদ্র পথ দিয়া দ্বিতীয় শতকেই পৌছিয়াছিল; তাহার প্রমাণ পাই মুৎস্যুর (Mou-tseu) জীবনী ও লেখা হইতে। ধম্মপদ আসিল এই দক্ষিণ পথ বাহিয়া। বিঘ্ন নামে এক ভিক্ষু চীনদেশে এই গ্রন্থ আনিলেন।

বিঘ্ন নামটির চীনা উচ্চারণ হইতেছে Wei-k'i-non। হরফগুলির প্রাচীন উচ্চারণ ছিল Wi-g'ie-nan। সুতরাং নান্‌জিও-কৃত এই সংশোধনকে আমরা সহজেই শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি। বিঘ্নের জীবনী আমরা সাঙ-যু-কৃত চীনা তালিকাগ্রন্থে পাই সংক্ষেপে ও খাই-যুন-লু নামক তালিকাগ্রন্থে পাই অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে। বিঘ্ন, ভারতে জন্মিয়াছিলেন এক ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণের ঘরে। ভারতের কোন্ প্রদেশে, তাহা কেহই বলিতে পারেন নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত চীনা গ্রন্থে বিঘ্নের বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার কাহিনী বিবৃত আছে; কথিত আছে, এক রাত্রে এক শ্রমণ বিঘ্নের নিকট উপস্থিত হন; শ্রমণ বুদ্ধের শিষ্য বলিয়া নিষ্ঠাবান্ বিঘ্ন তাঁহাকে গৃহে স্থান দিতে অস্বীকৃত হন; কিন্তু শ্রমণ তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তিবলে ব্রাহ্মণের যজ্ঞ অগ্নি নির্ব্বাপিত করেন। বিঘ্ন বৃথায় বারংবার তাঁহার যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিলেন। এই ঘটনায় বিস্ময়ে বিঘ্নের মন অভিভূত হইয়া গেল ও তিনি চতুরাগম (দীর্ঘ, মধ্যম, সংযুক্ত ও একোত্তর আগম) অধ্যয়ন করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন। স্বদেশ ত্যাগ করিয়া, বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে ২২৪ খ্রীষ্টাব্দে লিউ-য়েন (Liu-yen) নামক অপর একজন ভারতীয়ের সহিত দক্ষিণ-চীনদেশে পৌছিলেন। তখন সে-প্রদেশে বু (Wu) রাজবংশ রাজত্ব করিতেছে। লিউ-য়েন ও বিঘ্ন বহু পরিশ্রমের পর ধম্মপদের এক অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই পুথিখানি তাঁহারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। চীনা অক্ষরে উহা লিখিত হইয়াছিল থ-ন-প-চিং অর্থাৎ ধম্ম-পদ সূত্র,—চিং মানে সূত্র।

এখন প্রশ্ন, বিঘ্ন যে ধম্মপদের অনুবাদ করিলেন, এটি মূলে কোন্ ভাষায় ছিল। বিঘ্নের যে তর্জ্জমা আমরা পাই, তাহা লেখা হইবার সাত শত বৎসর পরে চীনা ত্রিপিটক প্রথম ছাপা হয়। ছাপাও যে নির্ভুল হইয়াছিল, এমন নহে। বহু অনু-লেখক সাত শত বৎসর ধরিয়া ইহার উপর কলম চালাইয়াছিলেন। বইখানির প্রারম্ভে অ-নামী একটা ভূমিকা আছে; তাহাতে লেখা আছে যে, ধম্মপদের রচয়িতা (?) বা সঙ্কলয়িতা ধর্ম্মত্রাত। অনেকে মনে করেন, এই ধর্ম্মত্রাত বসুমিত্রের

খুল্লতাত। ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে, মূল অনুবাদে ২৬টি অধ্যায় ছিল, পরে ১৩টি অধ্যায় জুড়িয়া দেওয়া হয়। বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, পালি ধম্মপদের মধ্যে ২৬টি অধ্যায় আছে। সুতরাং বিঘ্নের মূল গ্রন্থের ২৬টি অধ্যায়ের সহিত পালির অধ্যায়-সংখ্যার মিল রহিয়াছে। কেবল সংখ্যা-মিল, তাহা নহে, অধ্যায়ের নাম ও ক্রম হুবহু এক। চীনা ধম্মপদের ৯ম অধ্যায় হইতে ৩৫শ পর্য্যন্ত [৩৩শটি বাদ] পালির সহিত মিলিয়া যায়। প্রথম আটটি অধ্যায়, তেত্রিশের অধ্যায় ও ছত্রিশ হইতে উনচল্লিশ অধ্যায় নূতন, অর্থাৎ পালিতে নাই। ভূমিকায় আছে যে, বিঘ্নের সহকর্ম্মীই নাকি এই ১৩টি অধ্যায় জুড়িয়া দেন। তাহা যদি সত্য হয়, তবে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, পালি ধম্মপদ ছাড়া অন্য আর একখানি ধম্মপদের অস্তিত্ব লিউ-য়েনের জানা ছিল। তবে আমরা এখনি দেখিতে পাইব যে, অপর ধম্মপদ বা উদানবর্গ ছাড়া অন্য গ্রন্থ হইতে কোন কোন অধ্যায় বিঘ্নের অনুবাদের সহিত সংযোজিত হইয়া ধম্মপদ নামে চলিতে থাকে।

বিঘ্ন-কৃত ধম্মপদের অধ্যায়গুলির নাম আমরা নিম্নে দিতেছি; চীনা নাম **ফা-চিউ-চিং**; নানজিওর তালিকায় এই গ্রন্থের সংখ্যা ১৩৬৫। চীনা ত্রিপিটকের কিওতো (জাপানের)-সংস্করণে ৩৬শ গ্রন্থাবলীর ৯ সংখ্যার বইতে আছে। সাং-হাই সংস্করণের ২৪শ বাণ্ডিলের ৬ নম্বরের বইতে আছে; পৃষ্ঠা ৯৪-১০৭ ফা-চিউ-চিং দুই খণ্ডে বিভক্ত; ৩৯ অধ্যায়।

১। অনিত্যবর্গ। শ্লোক-সংখ্যা ২১। পালি-ধম্মপদে এই নামে কোন পরিচ্ছেদ নাই। তবে ইহার অনেকগুলি শ্লোক সংস্কৃত বা তিব্বতী উদানবর্গের অনিত্যবর্গের শ্লোকের সহিত মিলিয়া যায়। বেশ বুঝা যায় যে, সেগুলির মূল ছিল সংস্কৃত উদানবর্গ। পরিশিষ্টে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি।

২। শিক্ষাবর্গ। এই বর্গে ২৯টি শ্লোক আছে। এই নামে কোন বর্গ পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ধম্মপদ বা উদানবর্গে নাই। বিঘ্ন-কৃত অনুবাদ ব্যতীত অন্য উদানবর্গের অনুবাদে এই শ্লোকগুলি নাই। ফো-নিয়েন-কৃত তৃতীয় অনুবাদে শিক্ষাবর্গ নামে একটি অধ্যায় আছে, কিন্তু শ্লোকগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্। সুতরাং সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ হইতে এই অধ্যায়টি সংযোজিত হয়। ধম্মপদের সহিত কোন যোগ নাই।

৩। বহুশ্রুতবর্গ। ১৯টি শ্লোক আছে। এই নামে কোন বর্গ পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত বা চীনা ও তিব্বতীতে নাই। ইহা উদানবর্গের অন্তর্গত নহে। সুতরাং মনে হয় যে, এই শ্লোকগুলিও পূর্ব্বপরিচ্ছেদের শ্লোকের ন্যায় অন্য স্থান হইতে সংগৃহীত ও ধম্মপদের মধ্যে সংযোজিত।

৪। শ্রদ্ধাবর্গ। এই বর্গে ১৯টি শ্লোক। তৃতীয় ও চতুর্থ চীনা অনুবাদ বা উদানবর্গের মধ্যে এই বর্গটি পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয়ের একাদশ বর্গ চতুর্থের দশম বর্গ। ফা-চিউ-চিং-এর শ্রদ্ধাবর্গের ১১টি গাথা উদানবর্গের অনুবাদের সহিত মেলে। এই বর্গটি মনে হয়, চীনা অনুবাদকগণ সংস্কৃত উদানবর্গ হইতে গ্রহণ করিয়া ধম্মপদের সঙ্গে জুড়িয়া দেন।

৫। দুঃশীলবর্গ। ইহাতে ১৬টি শ্লোক। তৃতীয় অনুবাদে এই বর্গের নাম শীলবর্গ। চতুর্থ অনুবাদে শীলব্রতবর্গ নামে খ্যাত। প্রথম ও দ্বিতীয় অনুবাদে কেবল দুঃশীলবর্গ নামে অভিহিত। বিঘ্ন-কৃত ফা-চিউ-চিং-এর ১৩টি শ্লোক তৃতীয় ও চতুর্থ অনুবাদে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার কোন শ্লোক পালি ধম্মপদে পাওয়া যায় না। ফা-চিউ-চিঙে এই বর্গের শ্লোকগুলি নিঃসন্দেহে কোন সংস্কৃত ধম্মপদ বা উদানবর্গ হইতে গৃহীত।

৬। ভাবনা বা স্মৃতিবর্গ। ১২টি শ্লোক। চীনা তৃতীয় অনুবাদের ১৬শ বর্গের ১২টি শ্লোকের সহিত মিল আছে। চতুর্থ অনুবাদের ১২টির সহিত মিল আছে।

৭। প্রেম বা মৈত্রীবর্গ। ১৯টি শ্লোক। তৃতীয় ও চতুর্থ অনুবাদে এই নামে কোন বর্গ নাই।

৮। বাক্যবর্গ। এই বর্গে ১২টি শ্লোক। তৃতীয় ও চতুর্থ অনুবাদে এই নামের বর্গ আছে, এবং শ্লোকগুলি প্রায় মিলিয়া যায়; তবে তৃতীয় অনুবাদে এই বর্গের নাম অপবাদবর্গ।

এই পর্য্যন্ত ৮টি বর্গ পালি ধম্মপদে নাই। ইহার পর হইতে মিল সুরু হইয়াছে। এই আটটি বর্গের শ্লোকগুলি আমরা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব যে, ইহার অনুবাদক, সে বিঘ্নের সহকর্ম্মী লিউ-য়েন হউন বা অন্য কেহই হউন, সংস্কৃত ধম্মপদ বা উদানবর্গের সহিত পরিচিত ছিলেন।

নবম অধ্যায় হইতে পালি ধম্মপদে বর্গের নাম ও ফা-চিউ-চিং-এর (ধম্মপদ সূত্রের) বর্গ এক। যথা—৯ যুগ (পালি ১ যমক); ১০ প্রমাদ (২ অপমাদ); ১১ চিত্ত (৩ চিত্ত); ১২ পুষ্পগন্ধ (৪ পুপ্প); ১৩ বাল (৫ বাল); ১৪ পণ্ডিত (৬ পণ্ডিত); ১৫ অরহন্ত বা লোহন (৭ অরহন্ত); ১৬ সহস্র (৮ সহস্র); ১৭ পাপা (৯ পাপ); ১৮ দণ্ড (১০ দণ্ড); ১৯ জরা (১১ জরা); ২০ কায় সুখ (১২ অত্ত); ২১ লোক (১৩ লোক); দ্বিতীয় খণ্ড। ২২ বুদ্ধ (১৪ বুদ্ধ); ২৩ সুখ (১৫ সুখ); ২৪ প্রিয় (১৬ পিয়); ২৫ ক্রোধ (১৭ কোধ); ২৬ মল (১৮ মল); ২৭ ধারণা (১৯ ধম্মট্‌ঠ); ২৮ মার্গ (২০ মগ্‌গ); ২৯ প্রকীর্ণ (২১ পকীণ্ণক); ৩০ নরক (২১ নিরয়); ৩১ নাগোপম (২২ নাগ); ৩২ তৃষ্ণা (২৩ তণ্‌হা); ৩৩ সম্ভোগ [পালিতে এই বর্গ নাই। কিন্তু চীনা তৃতীয়ানুবাদের ১৪শ বর্গ ও চতুর্থানুবাদের ১৩শ বর্গের কতকগুলি শ্লোকের

সহিত মিল আছে। তৃতীয়ানুবাদের সহিত মিল বেশী। এই বর্গটিও প্রাচীন সংস্কৃত ধম্মপদ বা উদান-বর্গ হইতে গৃহীত]। ৩৪ শ্রমণ (২৪ ভিক্খু); ৩৫ ব্রাহ্মণ (২৬ ব্রাহ্মণ)। ৩৬ নির্বাণ, ৩৭ সংসার, ৩৮ বোধিলাভ, ৩৯ সৌভাগ্যবর্গ—এই চারিটি বর্গের সহিত ধম্মপদ বা উদানবর্গের কোন মিল পাওয়া যায় নাই।

এই তুলনামূলক আলোচনার পর আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বিঘ্ন দক্ষিণ চীনে গিয়াছিলেন দক্ষিণ-ভারত বা সিংহল হইতে। সিংহল হইতে তিনি **পালি ধম্মপদের** পুথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান এবং তদীয় বন্ধু লিউ-য়েনের সাহায্যে অনুবাদ করেন। অতিরিক্ত তেরটি অধ্যায় খুব সম্ভব সে-যুগে সংযোজিত হয় নাই। অনামী ভূমিকা-লেখক ধম্মপদের সংকলয়িতা বলিয়াছেন ধর্মত্রাত; আমাদের বিশ্বাস, এই ধর্মত্রাত উদানবর্গ বা সংস্কৃত ধম্মপদ সংকলন করেন, সেটি উত্তর-ভারতে সংগৃহীত হয়; সিংহলে সংকলিত হয় ধম্মপদ, যে পুথির অনুলিপি বিঘ্ন চীনে লইয়া গিয়া অনুবাদ করেন।

চীনাদের নিকট বিঘ্ন-কৃত ধম্মপদের অনুবাদ সমাদর লাভ করে নাই। প্রথমতঃ ইহার অনুবাদ ভাল হয় নাই; চীনারা সাহিত্যিক জাত; অসুন্দর অনুবাদ তাহাদের পক্ষে অসহ্য। দ্বিতীয়তঃ টীকা বা ব্যাখ্যা ছাড়া শ্লোকগুলি তাহাদের পক্ষে বুঝাও কঠিন; এ কথা ভুলিলে চলিবে না, তখনও চীনে বৌদ্ধধর্ম মাত্র প্রচারিত হইতেছে; বড় সাহিত্যিক তখন কেহ বৌদ্ধ শাস্ত্র ব্যাখ্যায় নামেন নাই। এই অভাব দূর হইল কয়েক বৎসর পরে। ফা-চু ও ফা-লি (ধর্মবল) নামক দুই জন ভিক্ষু বিঘ্ন-কৃত ধম্মপদ হইতে ১০০টি শ্লোক বাছিয়া, শ্লোকগুলির সংক্ষিপ্ত টীকা লিখিয়া প্রকাশ করিলেন। প্রত্যেকটি শ্লোক কোন্ সময়ে এবং কেন বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, তাহাই বিবৃত করা আছে। ফা-চু ও ফা-লি উত্তর-চীনে ছিলেন; তখন চীনের সম্রাট্ পশ্চিমৎসিন রাজবংশের হুয়াই-তি (২৯০-৩০৬ খ্রীঃ অঃ)। ধম্মপদের ইহাই প্রাচীনতম টীকা; বুদ্ধঘোষ পঞ্চম শতাব্দীর লোক যদি হন, তাহা হইলে ধম্মপদট্‌ঠকথা চীনা টীকা হইতে অর্বাচীন। বীল সাহেব এই টীকারই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ইংরেজীতে প্রকাশ করিয়াছেন। বিঘ্নের ফা-চিউ-চিং-এর সহিত ফা-চিউ-চি-ফু-চিং-এর বর্গাদির সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ দক্ষিণের অনুবাদ ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে উত্তর চীনে পৌঁছিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ হইতে ধম্মপদের অট্‌ঠকথা চীনে আসিয়াছে। কেবল পালি অংশের নয়—অন্যান্য অংশের শ্লোকের ব্যাখ্যা ও কিংবদন্তী চীনা ভিক্ষুদের অজ্ঞাত ছিল না। তৃতীয়তঃ পালির উপরে যে বর্গগুলি সংযোজিত হইয়াছিল, তাহা, যদি বিঘ্নের সময় নাও হইয়া থাকে, ইতিমধ্যে সম্পাদিত হইয়াছিল। এমনও হইতে পারে, উত্তর-চীনে যেখানে সংস্কৃত উদানবর্গ ও অন্যান্য সংস্কৃত উদান গ্রন্থ দুর্লভ ছিল না—সেইখানেই

এই সংযোজনের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। মোট কথা এ সবই অনুমান ও যুক্তিসাপেক্ষ, বাস্তব লোকে প্রমাণ দেওয়া কঠিন।

দ্বিতীয় সটীক অনুবাদখানির চারিটি ভাগ আছে। প্রথম খণ্ডে ১ম বর্গ হইতে ১২শ বর্গ; [৯ম বর্গে দুইটি শ্লোক অতিরিক্ত আছে; বিঘ্নের অনুবাদে নাই] দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩শ হইতে ১৯শ বর্গ; ৩য় খণ্ডে ১৯শ হইতে ৩২শ বর্গ; চতুর্থ খণ্ডে ৩৩শ হইতে ৩৯শ বর্গ।

ফা-চিউ ও ফা-লির সটীক অনুবাদের প্রায় এক শত বৎসর পরে ধম্মপদ-উদানবর্গের অনুবাদ হয়। চীনা গ্রন্থখানির নাম 'অবদানসূত্র', আসল ধর্মপদ বা উদানবর্গের একখানি সুবৃহৎ টীকা। চীনা গ্রন্থখানি ৩০ খণ্ডে; চীনা ত্রিপিটকের ১৬০ পৃষ্ঠা; সুতরাং মূল গ্রন্থখানি বেশ বড় বই ছিল বলিয়া অনুমান হয়। টীকার মধ্যে অশ্বঘোষের গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা আছে, এমন কি, বৈদিক সাহিত্য হইতেও গাথা আছে। এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি অনুবাদ করেন ফো-নিয়েন নামে একজন ভিক্ষু; পণ্ডিত বাগচী অনুমান করেন যে, ফো-নিয়েন কাংসু-অধিবাসী হিন্দু ঔপনিবেশিক। ফো-নিয়েন সংস্কৃত ভাষায় ও চীনা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; সে-যুগের বহু অনুবাদক তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়া অনুবাদ কার্য্য করিয়াছিলেন। শি-কাও ও চি-কিয়েন ব্যতীত এত বড় প্রচারক সে-যুগে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। উদানবর্গের এই টীকাখানি ৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অনূদিত হয় বলিয়া অনুমান করা হয়। এই গ্রন্থখানিই বহু শত বৎসর চীনে প্রচলিত ছিল। তারপর ছয় শত বৎসর পর উদানবর্গের মূল শ্লোকগুলি নূতন পুথি হইতে অনূদিত হয়। অনুবাদকের চীনা নাম পাওয়া যায়, যদিও তিনি ছিলেন হিন্দু, উদ্যানদেশবাসী। তিয়েন-সি ৎসাই ৯৮০-১০০১ অব্দে উদানবর্গের অনুবাদ করেন। ফো-নিয়েন-কৃত অনুবাদের মূল শ্লোকগুলি ও এই অনুবাদের শ্লোকগুলির মধ্যে মিল আছে। ইহারা এক পর্য্যায়ের অন্তর্গত। সেই জন্য আমরা ইহার একত্র আলোচনা করিব। এই পর্য্যায়ের মধ্যে আরও একটি অনুবাদ পড়ে,—সেটি তিব্বতী। তিব্বতী অনুবাদখানি হয় ৯ম শতকে। সেই জন্য তিব্বতী অনুবাদের সহিত চীনা চতুর্থানুবাদের মিল খুবই বেশী।

চীনা তৃতীয় ও চতুর্থ অনুবাদ, তিব্বতী অনুবাদ ও মধ্য-এশিয়া হইতে প্রাপ্ত সংস্কৃত পুথির খণ্ডিত অংশগুলি একই গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ—অর্থাৎ সংস্কৃত উদানবর্গের বিভিন্ন রূপ। হুবহু কোনটির সহিত কোনটির মিল নাই। উদানবর্গে ৩৩টি বর্গ। বর্গগুলির নাম আমরা নিম্নে দিতেছি।

১। অনিত্যবর্গ। ফো-নিয়েন-কৃত 'অবদান-সূত্রে' এই বর্গের নাম, তিব্বতী অনুবাদের নাম ও সংস্কৃত পুথির এই বর্গের নাম—অনিত্যবর্গ; কেবল চতুর্থ অনুবাদে ইহার

নাম সংস্কারবর্গ অনিত্যবর্গের শ্লোক-সংখ্যা এক এক সংস্করণে এক এক রূপ। প্রথম অনুবাদে ২১; দ্বিতীয়ে ১৪; তৃতীয়ে ৪০; তিব্বতীতে ৪৩; সংস্কৃতে ৪২। গুণতিতে যদিও মিল দেখা যায়, শ্লোকগুলি বিচার করিতে আরম্ভ করিলে মিল আরও কমিয়া আসে। চতুর্থানুবাদের ৭টি শ্লোকের কোন তিব্বতী নাই। পালিতে অনিত্যবর্গ নামে কোন বর্গ নাই।

২। কামবর্গ। চতুর্থানুবাদে ২১টি, তিব্বতীতে ২০টি ও সংস্কৃতে ১৯টি শ্লোক আছে। মধ্য-এশিয়ায় কামবর্গের সমগ্র পরিচ্ছেদটি পাওয়া গিয়াছে ও প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকগুলির পালি অনুরূপ রহিয়াছে। চীনা চতুর্থানুবাদেরও ৮টি পালি অনুরূপ রহিয়াছে।

৩। তৃষ্ণাবর্গ। এই নামের বর্গ ফা-চিউ চিং আছে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে মিল সামান্যই। পালিতে তণ্হাবগ্‌গ আছে। এই বর্গের পাঁচটি শ্লোক চতুর্থের সহিত মেলে। চতুর্থানুবাদে ২০, তিব্বতীতেও ২০; সংস্কৃত বর্গ হাতে আসে নাই। তিব্বতী ও চতুর্থানুবাদে বেশ মিল দেখা যায়।

৪। অপ্রমাদবর্গ। এই বর্গটির চারিটি চীনা অনুবাদ, তিব্বতী অনুবাদ, মূল সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত সংস্করণ লইয়া পণ্ডিতপ্রবর লেভি জুর্ণাল্ এসিয়াতিকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। চীনা চতুর্থানুবাদে ৪০, তিব্বতীতে ৩৫ ও সংস্কৃতে ৩৮টি শ্লোক আছে। পালির দ্বিতীয় বর্গের নাম অপ্পমাদবগ্‌গ; অনেকগুলি গাথা সংস্কৃতের সহিত মেলে।

চীনা তৃতীয়ানুবাদে নূতন একটি বর্গ ইহার পর পাই; তাহার নাম প্রমাদবর্গ; সেটি ঐ গ্রন্থে ৫ম বর্গ; সুতরাং এই গ্রন্থে একটি বর্গ বেশী আছে, ৩৩এর স্থানে ৩৪—বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

৫। প্রিয়বর্গ। চীনা চতুর্থানুবাদে ২৪টি, তৃতীয়ানুবাদে ২৩টি, তিব্বতীতে ২৮টি বা বেকের (Beck-এর) হিসাবে ২৬টি শ্লোক। চীনা তৃতীয়ে এই বর্গের নাম 'স্মৃতি'। ফা-চিউ-চিঙের ৬টি শ্লোক চতুর্থের সঙ্গে মেলে। সংস্কৃত মূল কোথায়ও ছাপা হয় নাই। মধ্য-এশিয়ায় প্রাপ্ত পুথির মধ্যে আছে কিনা জানি না। পালি পিয়বগ্‌গের ৪টি শ্লোক, দণ্ডবগ্‌গের ১টি ও নিরয়বগ্‌গের ১টি শ্লোক চীনার সহিত মেলে।

৬। শীলবর্গ। চারিটি চীনাতেই প্রায় এই নামের বর্গ রহিয়াছে। তিব্বতীতেও আছে। প্রথম ও দ্বিতীয়ানুবাদে ইহার নাম দুঃশীলবর্গ; তৃতীয়ানুবাদে নাম শীল, চতুর্থে নাম

শীলব্রত। চতুর্থে ২১টি, তৃতীয়ে ৩২টি, প্রথমে ১৬টি, তিব্বতীতে ২০টি শ্লোক। চীনা অনুবাদগুলি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যাইবে, এই বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থের মূল পুথির মধ্যে সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ট ছিল। প্রথমানুবাদে এই বর্গটি ৫ম; অর্থাৎ অতিরিক্ত অধ্যায়গুলির অন্তর্গত। সুতরাং বেশ বুঝা যায় যে, ফা-চিউ-চিঙের অনুবাদক উদানবর্গের কোন সংস্করণের সহিত সুপরিচিত ছিলেন।

৭। কুশল কর্মবর্গ। চীনা চতুর্থ ও তিব্বতীর ইহাই বোধ হয় মূল নাম ছিল। তৃতীয়ানুবাদের নাম ছিল শিক্ষাবর্গ। এখানে বলিয়া রাখি, ফা-চিউ-চিঙের শিক্ষাবর্গের সহিত ইহার কোনই যোগ নাই; চতুর্থ ও তিব্বতীর সহিত যোগ স্পষ্ট। পালিতে এ নামের কোন বর্গ নাই। প্রাকৃতে ছিল কিনা বলা যায় না। সংস্কৃতে ছিল, কিন্তু তাহা আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত হয় নাই।

৮। বাক্যবর্গ। চীনা চতুর্থে ১৭টি ও তিব্বতীতে ১৫টি শ্লোক। তৃতীয় চীনানুবাদে এই বর্গের নাম অপবাদবর্গ; ইহাতে এই বর্গের দুই ভাগ; প্রথম ভাগে ৬টি ও দ্বিতীয় ভাগে ১০টি শ্লোক। ফা-চিউ-চিঙের ৮ম পরিচ্ছেদের নাম বাক্যবর্গ; ইহার ১০টি শ্লোক উদানবর্গের অনুবাদদ্বয়ের সহিত মেলে।

৯। কর্মবর্গ। তৃতীয়ানুবাদে ইহার নাম চর্য্যাবর্গ। প্রথম ও দ্বিতীয়ানুবাদে এ নামের কোন বর্গ নাই। তিব্বতীতে ৬ষ্ঠ হইতে ১৪শ শ্লোকের কোন চীনা অনুবাদ নাই। অথচ তিব্বতীর ১০টি শ্লোকের সহিত পালি ধম্মপদের ১০টি শ্লোকের মিল পাওয়া যায়।

১০। শ্রদ্ধাবর্গ। তৃতীয় ও চতুর্থানুবাদে যথাক্রমে ২০টি ও ১৮টি শ্লোক আছে। প্রথমানুবাদ বা ফা-চিউ-চিঙে এই বর্গটি হইতেছে চতুর্থ, অর্থাৎ অতিরিক্ত বর্গের অন্তর্গত। ইহাতে দুইটি ছাড়া ১৪টি শ্লোকই তৃতীয় ও চতুর্থানুবাদের সহিত মিলিয়া গিয়াছে; বেশ বুঝা যায় যে, তৃতীয়ানুবাদের কোন মূল গ্রন্থ হইতে ফা-চিউ-চিঙের এই অধ্যায়টি গৃহীত। ফো-নিয়েন যে পুথি দেখিয়া তাহার অবদান অনুবাদ করেন, বোধ হয় তাহাতে এই অধ্যায়ের শেষ কয় পাতা ছিল না; কারণ, চতুর্থানুবাদের সহিত তৃতীয়ের হুবহু মিল; কিন্তু ১৮শ শ্লোকের পর আর নাই; চতুর্থে ২০টি শ্লোক। এদিকে প্রথমানুবাদে আরও চারিটি শ্লোক রহিয়াছে, সেগুলির সহিত কাহারও মিল নাই। তিব্বতীর সহিত মোটামুটি চীনানুবাদগুলি মেলে; তবে কতকগুলির সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। পালিতে এ নামে বর্গ নাই। সংস্কৃত পাওয়া গিয়াছে কিনা জানি না।

১১। শ্রমণবর্গ। চীনাতে এই বর্গের নামটি 'শ-মেন্' অর্থাৎ শ্রমণ আছে। চতুর্থে ১৭, তৃতীয়ে ১৬, তিব্বতীতে ১৬ শ্লোক আছে। তৃতীয়ের সব শ্লোকের সহিত চতুর্থের মিল নাই; অধিকাংশই মেলে। চীনা প্রথম বা পালিতে এ বর্গের মিল-ওয়ালা বর্গ নাই; তবে অত্তবগ্‌গের ৬টি, ধম্মট্‌ঠবগ্‌গের ৪টি, নিরয়বগ্‌গের ২টি শ্লোকের সহিত চতুর্থের ৮টি শ্লোক মিলিয়াছে। ফা-চিউ-চিঙের ২৭শ অধ্যায়, বা ধারণাবগ্‌গের ৪টি শ্লোক পালি ধম্মট্‌ঠবগ্‌গের ৪টি শ্লোকের সহিত মেলে।

১২। মার্গবর্গ। সব সংস্করণেই মার্গবর্গ আছে। চতুর্থানুবাদে ২২টি, তৃতীয়ে ২১টি—উভয়ের মধ্যে বেশ মিল। কিন্তু গোল বাধিয়াছে প্রথম ও পালি লইয়া। ফা-চিউ-চিঙে ২৮টি শ্লোক; কিন্তু ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ১৭, ১৮, ২৫, ২৬, ২৭ শ্লোকের সহিত চতুর্থানুবাদের কতকগুলি শ্লোক মেলে। কিন্তু উল্টাপাল্টাভাবে। আবার পালির সঙ্গে ফা চিউ-চিঙের একটু তফাৎ বাহির হইয়া পড়ে; ১৭শ হইতে ২৮শ-এর কোন মিল পালি ধম্মপদে মাগ্‌গবর্গের মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং বেশ বুঝা যায় যে, এই বর্গের পুথি লইয়া বেশী ছিনিমিনি চলিয়াছিল।

১৩। সৎকারবর্গ। চতুর্থানুবাদের ১৯টার সহিত তিব্বতীর গোটা ১৪ শ্লোক এক রকম মেলে। তৃতীয়ানুবাদের মিল বড়ই এলোমেলো। তবে ফা-চিউ-চিঙের সহিত তৃতীয়ের মিল বেশী; ফা-চিউ-চিঙে এই বর্গটি অতিরিক্ত সংযোজিত বর্গ; সুতরাং বেশ অনুমান করা যাইতে পারে যে, তৃতীয়ের মূল উদানবর্গের শ্লোক বিঘ্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৪। দ্বেষবর্গ। চতুর্থ, তৃতীয় ও তিব্বতীর মধ্যে মোটামুটি মিল পাওয়া যায়। ধম্মপদ বা ফা-চিউ-চিঙে এই বর্গ নাই। তবে পালি যমকবগ্‌গের ১টি, বালবগ্‌গের ১টি, নাগ-বগ্‌গের ৩টি শ্লোক চীনার সহিত মেলে। তিব্বতী এই বর্গের ৯ম ও ১০ম শ্লোক পালি যমকের ৩য় ও ৪র্থ-এর শ্লোকের সহিত মেলে।

১৫। স্মৃতিবর্গ। চতুর্থ চীনার সহিত তিব্বতীর মিল হুবহু। পুনরায় এখানে স্মরণ করাইয়া দিই যে, উভয় গ্রন্থই অর্ব্বাচীন নবম ও দশম শতাব্দীর সংস্কৃত পুথির তর্জমা। তৃতীয় অনুবাদের ১৬টির সহিত মাত্র চতুর্থের মিল পাওয়া যায়। কিন্তু বেশী মিল পাওয়া যায় ফা-চিউ-চিঙের ভাবনাবর্গের সঙ্গে। ভাবনাবর্গ হইতেছে ৬ষ্ঠ বর্গ; সুতরাং অতিরিক্ত বর্গ সমূহের অন্তর্গত। এখানেও তৃতীয়ানুবাদের সহিত ফা-চিউ-চিঙের অতিরিক্ত বর্গের মিল পাইতেছি। পালিতে এই বর্গ নাই।

১৬। প্রকীর্ণবর্গ। ধম্মপদ ও উদানবর্গের সকল সংস্করণেই এই নামের বর্গ আছে।

চীনা চতুর্থ, তৃতীয় ও তিব্বতীর মধ্যে মোটামুটি মিল পাই। ফা-চিউ-চিং ২৯শ অধ্যায় ও পালি ২১শ অধ্যায়ের এই নাম। কিন্তু শ্লোকের মধ্যে খুব বেশী মিল পাই নাই,—মোট ৭।৮ শ্লোকের মিল আছে মাত্র। ফা-চিউ-চিঙের প্রকীর্ণবর্গের সহিত চতুর্থ ও তৃতীয়ানুবাদের মিল একেবারে নাই। সুতরাং বর্গ নামের মিল থাকিলে এমন কথা বলা যায় না যে, এই বর্গটি সংস্কৃত হইতে গৃহীত।

১৭। আপ্‌বর্গ। মোটামুটি ভাবে চীনা চতুর্থ, তৃতীয় ও তিব্বতীর মধ্যে মিল আছে। ধম্মপদে এই নামের বর্গ নাই। ফা-চিউ চিঙ-ও নাই। তবে বিভিন্ন বর্গে ৭টি শ্লোক চীনা অনুবাদের সহিত মেলে।

১৮। পুষ্পবর্গ। চীনা চতুর্থ ও তিব্বতী শ্লোকে মিল প্রায় আছে—গোটা দুই ছাড়া। তৃতীয়ানুবাদের প্রথম নয়টি শ্লোক মিলে। ফা চিউ চিং ও ধম্মপদের মিল বেশ সুস্পষ্ট। চতুর্থ ও তৃতীয় কয়েকটির সঙ্গে পালির মিল আছে।

১৯। অশ্ববর্গ। মোটামুটি ভাবে চীনা চতুর্থ, তৃতীয় ও তিব্বতীর মধ্যে মিল আছে। ধম্মপদে এ বর্গ নাই। তবে ফা-চিউ-চিঙ ও ধম্মপদে নাগবর্গ আছে, মিলও আছে। উদানবর্গের তিনটি শ্লোকের সহিত ধম্মপদের তিনটি মেলে, তফাতের মধ্যে অশ্বের বদলে হস্তীর উপমা। তিব্বতীর ৯ম শ্লোক সম্বন্ধে Beck বলেন যে, সেটি ৭ম শ্লোকের পুনরুক্তি। এরূপ পুনরুক্তি মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। Rockhill ইহাকে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ শ্লোকই দেখাইয়া অনুবাদ করিয়াছেন এবং চীনার সহিত তাহার মিল পাওয়া গিয়াছে।

২০। ক্রোধবর্গ। সব সংস্করণেই এই বর্গটি আছে। চীনা চতুর্থ, তৃতীয় ও তিব্বতীর মিল বেশ। ফা-চিউ-চিঙের ২৫শ বর্গের নাম ক্রোধবর্গ। পালি কোধবগ্‌গের ১৪টির সহিত বিঘ্নের অনুবাদের ২য়-১৫শ শ্লোক মেলে। কিন্তু ১৬শ-২৬শ মেলে উদানবর্গের সঙ্গে। অর্থাৎ ধম্মপদ ও উদানবর্গ হইতে লইয়া ফা-চিউ চিঙের বর্গটি তৈয়ারী।

২১। তথাগতবর্গ। চীনা চতুর্থে ২০, তৃতীয়ে ১৮ ও তিব্বতীতে ১৫ শ্লোক। তৃতীয় ও চতুর্থে বেশ মিল। তিব্বতীর এই বর্গে একটু গোল বাধাইয়াছে। ফা-চিউ-চিঙ ও পালি বুদ্ধবগ্‌গের সহিত কোন যোগ নাই।

২২। শ্রাবকবর্গ। চীনা চতুর্থ, তৃতীয় ও তিব্বতীর মধ্যে মিল আছে। ফা-চিউ চিঙের তৃতীয় বর্গের নাম বহুশ্রুতবর্গ বা শ্রাবকবর্গ; কিন্তু দুইটি ছাড়া অপর শ্লোকের মিল পাওয়া যায় না। এটি অতিরিক্ত বর্গ। পালিতে নাই।

২৩। আত্মবর্গ। সব সংস্করণেই এই নামের বর্গ আছে। চীনা চতুর্থ ও তিব্বতী বেশ মেলে।

তৃতীয়ের মাত্র অর্দ্ধেক শ্লোক চতুর্থের সঙ্গে মেলে। ফা-চিউ-চিং ও ধম্মপদের অন্তবগ্গের মধ্যে মিল বেশ।

২৪। সহস্রবর্গ। সব সংস্করণেই এই বর্গ আছে। তবে নামের তফাৎ দেখা যায়, যেমন তৃতীয়ানুবাদে ইহার নাম নৈপুণ্যবর্গ, চতুর্থানুবাদে বিপুলবাক্‌বর্গ, তিব্বতীতে ইহার নাম সংখ্যা বা তুলনাবর্গ। পালিতে নাম সহস্রবর্গ। চীনা চতুর্থ ও তিব্বতীতে মিল বেশ আছে।

ফা-চিউ-চিং ও ধম্মপদের মিল হুবহু। তৃতীয়ানুবাদের তিনটি মাত্র শ্লোক ভাবের সঙ্গে মেলে। মহাবস্তু নামক গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদে ধর্ম্মপদের সহস্রবর্গের স্পষ্ট উল্লেখ আছে; তাহার অনেকগুলি শ্লোক পালির সঙ্গে মেলে।

২৫। বন্ধুবর্গ। ধম্মপদে বন্ধুবর্গ নাই; ফা-চিউ-চিঙেও নাই। চীনা চতুর্থ, তৃতীয়ানুবাদ ও তিব্বতীতে আছে; সংস্কৃতে ছিল, কিন্তু কোন অংশ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এ বর্গটিকে উদানবর্গেরই বিশেষ পরিচ্ছেদ বলিয়া বুঝা যায়। চতুর্থানুবাদে ২৩, তৃতীয়ে ২১ ও তিব্বতীতে ২৫ শ্লোক আছে; তিব্বতী ১৫শ হইতে ১৮শ শ্লোকের কোন চীনা অনুবাদ পাই নাই। আরও, তিব্বতীতে এই বর্গ হইতে তৃতীয় খণ্ড আরম্ভ হইয়াছে; এইরূপ বর্গীকরণ অন্যত্র নাই। পালি ধম্মপদের বালবগ্গ, পণ্ডিতবগ্গ ও সুখবগ্গের ছয়টি শ্লোক উদানবর্গের ছয়টি শ্লোকের সহিত মিলিয়াছে।

২৬। নির্ব্বাণবর্গ। এ নামের কোন পালি বগ্গ নাই। এটি উদানবর্গেরই বর্গ। চীনা চতুর্থ, তৃতীয় ও তিব্বতীতে আছে। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে মিল অপেক্ষাকৃত কম। তৃতীয়ের শ্লোক-সংখ্যা ২৯, চতুর্থের ৩৬, তিব্বতীর ৩৩। তৃতীয়ের ১৮শ হইতে ২১শ পর্য্যন্ত কোন মিল চতুর্থের সঙ্গে খুঁজিয়া পাই না।

২৭। দৃষ্টিবর্গ। চীনা চতুর্থে ৩৫, তৃতীয়ে ৩৬ ও তিব্বতীতে ৬৭ শ্লোক আছে। ধম্মপদে এ নামের বর্গ নাই। তবে ১০টি শ্লোকের মিল পাই। ফা-চিউ-চিঙের ২২শ (বুদ্ধবর্গের)-র ১৪শ-১৮শ শ্লোকের সহিত মেলে। এই শ্লোকগুলি পালি ১৮৮-১৯২ শ্লোকের তর্জনা।

২৮। পাপবর্গ। এই নামের বর্গ উদানবর্গে চীনা চতুর্থ, তৃতীয় ও তিব্বতী অনুবাদে আছে। চীনা প্রথম ও দ্বিতীয়ের ১৭শ বর্গ ও পালির ৯ম বর্গ এই নামের। চীনা চতুর্থে ৩৪, তৃতীয়ে ৩৫ ও তিব্বতীতে ৪০ শ্লোক আছে। ধম্মপদের পাপবর্গের ১৩টি শ্লোকের মধ্যে ১০টির সহিত ফা-চিউ-চিঙের ১০টি শ্লোক মেলে। উদানবর্গের ১৯টি শ্লোকের সহিত

ধম্মপদের বিভিন্ন বর্গের দুই একটি করিয়া শ্লোক মেলে, যেমন—যমক, কাম, পাপ, দণ্ড, অন্তবর্গের শ্লোকের সঙ্গে।

২৯। যুগবর্গ। চীনা, তিব্বতী, পালি ও সংস্কৃত—সকল সংস্করণেই এই বর্গ আছে; পালিতে নাম যমক, প্রথম বর্গ। সংস্কৃত শ্লোকগুলি মধ্য-এশিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। পিশেল (Pischel) সাহেব এই বর্গটি সম্পাদন করিয়াছেন। মধ্য-এশিয়ার তিনখানি পুথিতে এই বর্গটি আছে। শ্লোক-সংখ্যা একটি পুথিতে ৫৭, দ্বিতীয়টিতে ৬০ ও তৃতীয়খানিতে ৬৬। চীনা চতুর্থে ৪৭, তৃতীয়ে ৪০ ও তিব্বতীতে ৬০। সংস্কৃতে শ্লোক-সংখ্যা বেশী; কারণ একই শ্লোক বহুভাবে আছে,—কেবল হয় ত 'চিত্তে'র স্থানে 'মন' ইত্যাদি করিয়া ছয়টি শ্লোক। ফা-চিউ-চিঙে ২২ ও পালিতে ২০টি মাত্র শ্লোক। পালি ৭ম-১২শ শ্লোক সংস্কৃতে আছে। তবে মিল হইতেছে ফা-চিউ-চিং ও পালি যমকবর্গে। ধম্মপদের অন্যান্য বর্গের প্রায় ২৬টি শ্লোক উদানবর্গের শ্লোকের সহিত মেলে। তাহা ছাড়া অঙ্গুত্তরনিকায়, উদান ও সুত্তনিপাতের তিনটি শ্লোক মেলে। সংস্কৃত যুগবর্গের সহিত বেশী মিল দেখি তিব্বতীর।

৩০। সুখবর্গ। সকল সংস্করণেই এই বর্গটি আছে। চীনা ১ম ও ২য় অনুবাদে ২৩শ বর্গ ও পালির ১৫শ বর্গ। শ্লোক-সংখ্যার মধ্যে বেশ বিভিন্নতা আছে; চীনা চতুর্থে ৪৫, তৃতীয়ে ৪৭, সংস্কৃতে ৫২, তিব্বতীতে ৫৩। মধ্য-এশিয়াতে স্টাইন যে-সব পুথি পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে সুখবর্গের ২৬শ হইতে ৫২শ সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় Poussin ইহা সম্পাদন করেন। চীনা চতুর্থ ও তৃতীয়ে বেশ মিল —প্রায় হুবহু। তবে ৩৯শ-এর পর হইতে সংস্কৃত ও তিব্বতীর কোন মিল পাই না। তৃতীয় ও চতুর্থে যথাক্রমে ৮টি ও ৬টি শ্লোক অতিরিক্ত; সংস্কৃত ও তিব্বতীর ৫২শ ও ৫৩শটি শ্লোকের মিল প্রায় হুবহু। এ শ্লোকগুলি যে পুথিতে ছিল, তাহার কপি চীনে পৌঁছায় নাই। পালি ধম্মপদের ১৩টি শ্লোক উদানবর্গের মূল ও অনুবাদের সহিত মেলে।

৩১। চিত্তবর্গ। ধম্মপদ ও উদানবর্গের সকল সংস্করণেই এই বর্গ আছে। ফা-চিউ-চিঙের ১১শ ও পালির ৩য় বর্গ, চীনা চতুর্থ, তৃতীয়ের মধ্যে মিল রীতিমত। উভয়েই ৪৬টি করিয়া শ্লোক। তিব্বতীতে ৬৪টি শ্লোক। সংস্কৃতের মূল শ্লোকগুলির ১ম-৩৯শ পর্য্যন্ত তিব্বতীর সহিত হুবহু মেলে। তবে সংস্কৃত ১৩শ হইতে ২২শ পর্য্যন্ত শ্লোকের কোন চীনা তর্জ্জমা নাই। মনে হয়, এগুলি পরে যোজিত। এই বর্গেই পালি ধম্মপদে প্রথম দুটি

গাথা আছে—"মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা, মনো সেট্ঠা মনোময়" ইত্যাদি। কোথায় পালির প্রথম শ্লোক—আর সংস্কৃতে ৩১শ অধ্যায়ের ২৩শ, ২৪শএর শ্লোক!

৩২। ভিক্ষুবর্গ। চীনা চতুর্থে ৬৩, তৃতীয়ে ৪১, তিব্বতীতে ৭৭ গাথা। পালি ও ফা-চিউ-চিঙে ভিক্ষুবগ্গ আছে। তাহারা প্রায় হুবহু ঠিক। তবে উদানবর্গের সহিত মিল কমই। চীনা চতুর্থ ও তৃতীয়ের মিল বেশ; তিব্বতীর সহিত সব চীনা গাথার ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

৩৩। ব্রাহ্মণবর্গ। এ নামে বর্গ সকল সংস্করণেই আছে। ফা-চিউ-চিঙের ৩৫শ বর্গ ও পালির ২৬শ বর্গের নাম ব্রাহ্মণ। চীনা চতুর্থের শ্লোক-সংখ্যা ৭০, তৃতীয়ের ৭২ ও তিব্বতীর ৯১। তৃতীয় ও চতুর্থে মিল বেশ। তিব্বতীর সঙ্গে সবগুলির ঐক্য দেখাইতে পারি না। পালি ধম্মপদের যমকবগ্গের ৬, ৭, ও ৯ গাথা, অপ্পমাদবগ্গের তিনটি, চিত্তবগ্গের ১টি গাথা অনুবাদের সহিত মিলিয়া যায়।

পরিশিষ্ট

বিঘ্ন-কৃত **ধম্মপদ** সূত্রের চীনা তর্জমার কোন ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। আমি নিম্নে এই গ্রন্থের প্রথম বর্গের একটি অনুবাদ দিতেছি।

অনিত্যবর্গ। ২১টি শ্লোক।

১। নিদ্রা তন্দ্রা হইতে উঠ, জাগ; কেবল মাত্র আনন্দ ধ্যান কর। শ্রবণ কর আমি কি বলি; বুদ্ধ এই বাক্যসমূহ রচনা করিয়াছিলেন।

[চীনা চতুর্থানুবাদে এই শ্লোকটি অনিত্যবর্গের ১ম শ্লোক। কিন্তু অনুবাদ অন্যরূপ। যথা,—

ক্লেশসমূহ বুঝিতে হইলে মনের মধ্যে আনন্দের অনুভূতি হওয়া প্রয়োজন। শ্রবণ কর, আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি—এই ধর্ম্মগাথা বুদ্ধ-ভাষিত।

তিব্বতী উদানবর্গের অনিত্যবর্গের প্রথম শ্লোকটি এইরূপ,—জেতা এই উদানগুলি বলিয়াছিলেন, 'শ্রবণ কর, আমি যাহা বলিতেছি; নিদ্রা তন্দ্রা দূর করিবার জন্য বলিতেছি—মনে আনন্দ আনিবার জন্য বলিতেছি।'

বেশ বুঝা যায় যে, তিনটি গ্রন্থের মূল একই; কেবল অনুবাদকের দ্বারা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।]

২। সংস্কার সমূহ অনিত্য, অর্থাৎ উৎপাদব্যয়ধর্ম্মী; যেমন তাহারা জন্মে তেমনি মরে; সেই জন্য নিরোধই সুখ।

[চীনা চতুর্থ ও তিব্বতীতে অনিত্যবর্গের ৩য় শ্লোক। বিশেষ পার্থক্য নাই। বিঘ্ন উদান-বর্গের কোন কপি হইতে এগুলি লইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়।

সংস্কৃতে শ্লোকটি এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়,—

[অনিত্যাঃ সর্বসংস্কারা উৎপাদব্যয়ধর্মিণঃ।
উৎপন্না এব নশ্যন্তি এষাং প্রশমনে সুখম্॥]

পালিতে এই শ্লোক আছে,—

অনিচ্চা বত সংখারা উপ্পাদবয়ধম্মিনো।
উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসম্ বূপসমো সুখো॥

দীঘনিকায় ২।১৫৭; সংযুত্তনিকায় ১।১৫৮, ১৯৩; জাতক ১।৩৯২; **প্রাকৃত ধম্মপদে** এই শ্লোকটি ছিল। বড়ুয়া-মিত্র-সম্পাদিত Prakrit Dhammapada, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ২৩৮)।

৩। কুমারের চাকে কত যত্নে গড়া হয় মাটির পাত্র; শেষে সবই ধ্বংস হয়—তেমনি মানুষের জীবন।

[এই গাথাটি চীনা ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও তিব্বতীতে পাই। পালি ধম্মপদে নাই। সংস্কৃতে ছিল—তবে শ্লোকটি পাই নাই। আমরা এইরূপভাবে শ্লোকটিকে রচনা করিয়াছি,

[যথাঽপি কুম্ভকারস্য কৃতং মার্ত্তিকভাজনম্।
সর্বং ভেদনপর্য্যন্তমেবং মর্ত্ত্যস্য জীবিতম্॥

পালি সুত্তনিপাতের সল্লসুত্তে এই গাথাটি আছে,—

যথাঽপি কুম্ভকারস্স কতা মত্তিকাভাজনা।
সব্বে ভেদন পরিয়ন্তা এবম্ মচ্চান জীবিতম্॥ ৪ ॥]

৪। যেমন নদী দ্রুত বহিয়া যায়,—ছুটিয়া চলে আর ফিরে না, তেমনি মানুষের জীবন—যায় কিন্তু আর ফিরে না।

[চীনা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ও তিব্বতী অনুবাদে এই শ্লোকটি আছে। এটি **সংস্কৃত অনিত্যবর্গের** ৩২শ শ্লোকের অনুবাদ।

আয়ুর্দিবা চ রাত্রৌ চ চরতস্তিষ্ঠতস্তথা।
নদীনাং হি যথা স্রোতো গচ্ছতি ন নিবর্ত্ততে॥

পালি জাতকে অনুরূপ গাথা আছে,—

যথা বারিবহো পূরো গচ্ছম্ নুপবত্ততি।
এবং আয়ু মনুস্সানম্ গচ্ছম্ নুপবত্ততি॥

জাতক নং ৫৩৬ (৬। পৃ ২৬)

প্রাকৃত ধম্মপদে এই শ্লোকটির কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে;

যধ নদি প্রবতিঅ রূছ বহতি······

Prak. Dhp., pp. 200f.]

৫। যেমন লোকে দণ্ডহস্তে গরু চরাইতে লইয়া যায়, তেমনি জরা-মরণ জীবন শেষ করিয়া চলিয়া যায়।

[সকল ধর্মপদ ও উদানবর্গে এই শ্লোকটি আছে। তিব্বতীতে ১৭শ শ্লোক। সংস্কৃতের সেই অংশ খণ্ডিত বলিয়া মূল শ্লোকটি পাই নাই ; তবে **পালি ধম্মপদ** হইতে অনুরূপ শ্লোকটিই পাই। যথা,—

যথা দণ্ডেন গোপালো গাবো পাচেতি গোচরং।
এবং জরা চ মচ্চু চ আয়ুং পাচেতি পাণিনম্॥
দণ্ডবগ্গে ৭ (১৩৫ শ্লোক)

প্রাকৃত ধম্মপদে খণ্ডিত শ্লোকটি পাওয়া গিয়াছে।

এমু জর য মুচু য অয়ু পয়েতি পণিন॥
Prak. Dhp., p. 199.]

৬। অনেক শত সহস্র গোত্র, নর, নারী, বিষয়, ধন, সম্পত্তি—সকলই ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হইয়াছে।

[এই শ্লোকটিও উদানবর্গের সকল সংস্করণে আছে। চীনা তৃতীয়ানুবাদের সহিত আক্ষরিক মিল রহিয়াছে। সংস্কৃতে বোধ হয় ২১শ কি ২২শ শ্লোক ছিল। মূল পাওয়া যায় নাই। পালি বা প্রাকৃতে অনুরূপ গাথা পাই নাই।]

৭। রাত্রিদিন জীবের জীবনীশক্তি আপনা হইতে ক্ষীণ হইতেছে ; আয়ুও ক্ষয় হইতেছে, যেমন জল বাষ্পীভূত হয়।

[অনুরূপ শ্লোক আবিষ্কার করিতে পারি নাই।]

৮। নিত্য যাহা—তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, উচ্চ যাহা—তাহা ভূমিসাৎ হয় ; মিলিত বস্তু পৃথক্ হয় (সংযোগ বিয়োগে পরিণত হয়) ; জীবের মৃত্যু আছে।

[চীনা তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথমানুবাদে এই শ্লোকটি একই। চতুর্থানুবাদে অর্থ পরিষ্কার। তিব্বতীর সহিত চতুর্থানুবাদের মিল আছে। সংস্কৃতে শ্লোকটি ছিল ২৪শ বা ২২শ-এর। মূল পাওয়া যায় নাই।]

৯। সর্ব জীব পরস্পরকে আঘাত করে জীবনকে ধ্বংস করিবার জন্য ; নিজ নিজ পাপ-পুণ্যের ফলানুসরণ করিয়া তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

[চীনা তৃতীয়ানুবাদ প্রথমানুবাদের অনুরূপ। আশ্চর্য্যের বিষয় চতুর্থানুবাদে এই শ্লোকটি নাই।

তিব্বতীতে আছে, সংস্কৃতেও আছে। তিব্বতী ও সংস্কৃতে মিল অধিক। **সংস্কৃত উদানবর্গের** শ্লোকটি এইরূপ,—

সর্বসত্ত্বা মরিষ্যন্তি মরণান্তং হি জীবিতম্।
যথা কর্ম গমিষ্যন্তি পুণ্যপাপফলভোগাঃ॥ ২৩॥

শ্লোকটি **মহাবস্তুতে** আছে—২য় খণ্ড; পৃ ৬৬, ৪২৪।

পালিতে শ্লোকটি আছে,—

সব্বে সত্ত্বা মরিস্সন্তি মরণন্তম্ হি জীবিতম্।
যথা কম্মং গমিস্সন্তি পুঞ্ঞ পাপ ফলুপগা॥
সংযুত্তনিকায় ১।৯৭; নেত্তিপকরণ, পৃ ৯৪।]

১০। জরা, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু দেখিলে মন চলিয়া যায়; গৃহের সুখ কারাগারের বন্ধন; পৃথিবীর জন্য লোভ যায় না।

[সংস্কৃতে শ্লোকটি আছে,—তাহার ভাবটি ঠিক ওরূপ নয়। অনুবাদক কিছু পরিমাণে সংক্ষেপ করিয়া অস্পষ্ট করিয়াছেন। চীনা চতুর্থানুবাদে এই গাথাটি আছে, তৃতীয়ে আছে, তিব্বতীতেও আছে; পালিতে পাই নাই। **সংস্কৃত উদানবর্গের** শ্লোকটি,—

চীর্ণম্ চ দৃষ্ট্বেহ তথৈব রোগিণম্
মৃতঞ্চ দৃষ্ট্বা ব্যপয়াত চেতসম্॥
জহাতি ধীরো গৃহবন্ধনানি
কামা হি লোকস্য ন সুপ্রহেয়াঃ॥ ২৭॥]

১১। হায়! জরা আসিতেছে; রূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে; (কেশ) পলিত করিতেছে; ক্ষণিকের মধ্যে জরা সমস্ত দলিত করিয়া লণ্ডভণ্ড করে।

[চীনা তৃতীয়ানুবাদের সহিত মিল আছে। তিব্বতীর সহিত তৃতীয় ও প্রথমের মিল পাই। চতুর্থানুবাদ বেশ একটু তফাৎ, অন্য শ্লোকই মনে হয়।

চীনা চতুর্থানুবাদে শ্লোকটি এইরূপ,—

রূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে জরায়; সংসারে আসক্তি কারাগারে বাসের ন্যায়; অজ্ঞানীদের নিকট (যাহাদের চিত্ত জাগে নাই) মৃত্যু আসে ও ধ্বংস করে; মূঢ় লোকে জানিতে পারে না॥ ৩১॥ তিব্বতী (রকহিল ৩০) বেক্ ২৮।

সংস্কৃত উদানবর্গের মূল শ্লোকটি এই,—

ধিক্ ত্বমস্ত জরে গ্রাম্যে বর্ণাপকারিনি জড়ে।
তথা মনোরমং বিম্বং ত্বয়া যদভিমর্দিতম্ ॥ ২৯ ॥

পালিতে শ্লোকটি আছে,—

ধীতম্ জম্মী জরে অত্থু দুষ্ঠণ্ণকরণী জরে।
তাবৎ মনোরমাং বিম্বৎ জরায় অভিমদ্দিতম্ ॥

সংযুত্তনিকায়, ৫, পৃ ২১৭

প্রাকৃত ধম্মপদে এই শ্লোকটি ছিল। Prak. Dhp., p. 187]

১২। শতায়ু হইলেও মৃত্যু তাহাকে গ্রহণ করিবে; জরা দ্বারা আক্রান্ত ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ শীঘ্রই সমাপ্তিতে পৌঁছায়।

[গাথাটি **ধম্মপদের** চারিটি ও **উদানবর্গের** চারিটি সংস্করণেই আছে। সকল চীনানুবাদের ভাষা প্রায় একরূপ।

সংস্কৃত উদানবর্গের মূলটি এই,—

যোপি বর্ষশতম জীবেত সোঽপি মৃত্যুপরায়ণো।
অনুহেনম্ জরা যাতি ... ... বান্তকঃ ॥ ৩০ ॥

পালিতে অনুরূপ শ্লোক আছে,—

যোপি বস্‌সসতম্ জীবে সোপি মচ্চ পরায়ণো।
ন কিঞ্চ পরিবজ্জতি সপম্ এবাভিমদ্দতি ॥

সংযুত্তনিকায়, ৫, পৃ ২১৭।

প্রাকৃত ধম্মপদের শ্লোকটি পালির অনুরূপ; যথা,—

যোবি বর্ষশত জিবি সোবি মুচু পরয়নো।
ন কি জি পরি ... ...

Prak. Dhp, p. 188]

১৩। যাহাদের জীবন রাত্রিদিন হ্রাস পাইতেছে (আক্ষরিক অনুবাদ—এই দিন গত হইল; জীবন তাহার পিছু পিছু ধ্বংস হইল)—তাহারা যেন অল্পোদকে মৎস্যের ন্যায়। তাহাদের কি আনন্দ আছে?

[শ্লোকটি তৃতীয়ানুবাদে আছে; চতুর্থে নাই। তিব্বতী, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃতে শ্লোকটি আছে।

সংস্কৃত উদানবর্গে শ্লোকটি এইরূপ,—

যেষাং রাত্রিদিবাপায়ে হ্যায়ুরল্পতরম্ ভবেৎ।
অল্পোদকে চ মৎস্যানাম্ কা নু তত্র রতির্ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥

পালিতে শ্লোকটি আছে; তবে ধম্মপদে নাই।

যস্‌স রত্যা বিবসনে আয়ুং অল্পতরম্ সিয়া।
অপ্পোদকে ব মচ্চানং কিন্নু কোমারকম্ তহিম্ ॥
জাতক, মুগপক্ক জাতক ৫৩৮ (৬। পৃ ২৬)।

প্রাকৃত ধম্মপদে পালির অনুরূপ শ্লোক আছে,—

যস্‌স রতি বিবসিন অযু অপতরো সিঅ।
অপোদকে ব মত্তসন কি তেষ নু কুমলক ॥
Prak. Dhp., p. 194]

১৪। জরা রূপকে নষ্ট করিবে—ব্যাধিযুক্ত স্বতই যাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; পাপ পুতি (পূঁজ)-পূর্ণ এই আকার শুষ্ক হইয়া যায়; জীবনের চরম মৃত্যু।

[চীনা চতুর্থানুবাদে শ্লোকটি নাই। তৃতীয় ও প্রথমের অনুবাদ এক। তিব্বতীর সহিত মিল আছে।

সংস্কৃত উদানবর্গে শ্লোকটি এইরূপ,—

পরিজীর্ণমিদং রূপম্ রোগনীড়ং প্রভং গুরম্।
ভেৎস্যতে পুত্যাসন্দেহম্ মরণান্তং হি জীবিতম্ ॥ ৩৪ ॥

পালি ধম্মপদের জরাবগ্‌গে শ্লোকটি আছে,—

পরিজিন্নমিদং রূপং রোগ নিড়ম্ পভংগুরম্।
ভিজ্জতি পুতিসন্দোহা মরণন্তং হি জীবিতম্ ॥
জরাবগ্‌গ ৩ (১০৯); ইতিবুত্তক পৃ ৩৭।

প্রাকৃত ধম্মপদে শ্লোকটি পাই,—

পরিজিনমিদ ক্নতু রো অ নিড় প্রভগুণো
ভিঙ্‌ সিতি পু ... ...

Prak. Dhp., P. 189.]

১৫। এই দেহের কি প্রয়োজন? ইহা নিত্য পুতিগন্ধের আশ্রয়, ব্যাধি দ্বারা অভিভূত; জরামরণ-অভিশপ্ত।

[চতুর্থ চীনানুবাদে নাই। তৃতীয়ানুবাদে আছে। তিব্বতী সংস্কৃতে ও পালিতে নাই।

সংস্কৃত উদানবর্গে শ্লোকটি এইরূপ,—

কিমনেন শরীরেণ বিস্রবাপূতিনা সদা।
নিত্যদ্‌ রোগাভিভূতেন জরা মরণাভভীরুণা॥ ৩৬॥

প্রাকৃত ধম্মপদে শ্লোকটি আছে একটু অন্য ভাবে—

ইমিন পুতিকায়েন বিপ্রবতেন পুতিন
নিচ শুহবিজিনেন জরধমেন সবসো
নিমেধ পরম শোধি যোকছেমু্‌ অনুতর॥

Prak. Dhp., p. 211.]

১৬। লোভ স্বতই বাড়িয়া চলে; অধর্ম্ম বৃদ্ধি পায়; ইহার পরিণাম দেখা যায় না। জীবন অনিত্য।

[এই শ্লোকটির অনুরূপ শ্লোক কোথাও পাই নাই।]

১৭। না আছে পুত্র সহায়, না আছে পিতা ভ্রাতা; সকলেরই মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কোন আত্মীয় যাহাকে ভালবাসিতে পারে।

[সকল **ধম্মপদ** ও **উদানবর্গে** এই শ্লোকটি আছে।

সংস্কৃত উদানবর্গে শ্লোকটি এইরূপ,—

ন সন্তি পুত্রস্ত্রাণায় ন পিতা নাপি বান্ধবাঃ।
অন্তকেনাভিভূতস্য ন হি ত্রাণা ভবন্তি তে॥ ৪০॥

পালি ধম্মপদে শ্লোকটি এইভাবে আছে,—

ন সন্তি পুত্তা তান্নায় ন পিতা ন পি বন্ধবা।
অন্তকেনাধিপন্নস্‌স নত্থি ঞাতিসু তাণতা॥

মগ্‌গবগ্‌গ ১৬ (২৮৮)।]

১৮। যে দিন রাত্রি নিষ্ঠাহীন, বার্দ্ধক্যেও যে সুখ ত্যাগ করে না, ধনবান্ হইয়াও যে ধন দান করে না, বুদ্ধের বচন গ্রহণ করে না—এই চারি দোষযুক্ত লোক বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

[চীনানুবাদে এই শ্লোকটির ছয়টি পাদ। সংস্কৃতে সম্ভবত ছয় পাদ শ্লোক ছিল। কিন্তু ইহার মূল সংস্কৃত, পালি বা তিব্বতীতে পাই নাই। অন্যান্য চীনানুবাদেও নাই।]

১৯। না আকাশে, না সমুদ্রগর্ভে, না পর্বতমধ্যে প্রবেশ করিয়া,—এমন কোন দেশ কোথায়ও নাই মৃত্যুকে যে এড়াইতে পারে।

[সকল ধম্মপদ ও উদানবর্গে শ্লোকটি আছে। সংস্কৃত শ্লোকটি খুব জনপ্রিয় ছিল। শ্লোকটি এই,—

নৈবান্তরীক্ষে ন সমুদ্রমধ্যে ন পর্বতানাম্ বিবরম্ প্রবিশ্য।
ন বিদ্যতেহসৌ পৃথিবী প্রদেশো যত্র স্থিতম্ ন প্রসেহত মৃত্যুঃ॥ ২৫॥

সংস্কৃত **দিব্যাবদান** (৫৩২, ৫৬১) ও তন্ত্রাখ্যায়িকায় (২।৬) এই শ্লোকটি আছে। পালিতে ধম্মপদ ব্যতীত **পেতবত্থু** (পৃ ২৯), ও **মিলিন্দপঞ্‌হো** (পৃ ১৫০) গ্রন্থে শ্লোকটি আছে। **পালি ধম্মপদের** শ্লোকটি এইরূপ,—

ন অন্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ্ঝে ন পব্বতানং বিবরং পবিস্‌স
ন বিজ্জতী সো জগতি প্পদেসো যত্থট্‌ঠিতং ন প্পসহেথ মচ্চু॥
পাপবগ্‌গ ১৩।

২০। এই কার্য্য আমার কর্ত্তব্য; ইহা করিয়া আমি সম্পাদন করিব। যে লোক ইহা করিবে সে জরা মৃত্যুকে মর্দন করিবে।

[চীনা তৃতীয়ানুবাদে এই শ্লোক নাই। তিব্বতী ও সংস্কৃত শেষ পাদে 'মৃত্যু' শব্দ আছে। বিঘ্নের অনুবাদে আছে 'দুঃখ'। চতুর্থানুবাদে শ্লোকটি নাই।

সংস্কৃত উদানবর্গে শ্লোকটি এই,—

ইদম্ মে কার্য্যম্ কর্ত্তব্যম্ ইদম্ কৃত্বা ভবিষ্যতি।
ইত্যেবম্ স্পন্দনো মর্ত্য জরা মৃত্যুশ্চ মর্দতি॥ ৪১॥

মধ্য-এশিয়ায় তুখার ভাষায় ধর্মপদের অনুবাদ ছিল; মূলের সহিত তুখার-অনুবাদের খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে। সেই পুথিতে এই শ্লোকটির কিয়দংশ পাই। পালিতে শ্লোকটি পাই নাই; তবে প্রাকৃত ধম্মপদে শ্লোকটি আছে,—

ইদ জ মি কেচ ইদজি করিঅ ইদ করি··· ।
··· বিন মন অভিমদতি মুচু ··· স শোঅ ॥
Prak. Dhp., pp. 179-80.]

২১। ইহা জানিয়া লোকে আত্মশুদ্ধি করিতে পারে, ইহাতে সে দেখিতে পায় জীবনের ক্ষয়কে; ভিক্ষু মার-সেনাকে পরাভূত করিয়া জীবন ও মৃত্যু হইতে মুক্তি পায়।

[এই চীনা অনুবাদটি ভাল নয়; চতুর্থানুবাদটি ভাল, সংস্কৃতের সঙ্গে বেশ মেলে। তৃতীয়ানুবাদে এটি নাই। **সংস্কৃত উদানবর্গে** শ্লোকটি এই,—

তস্মাৎ সদা ধ্যানরতাঃ সমাহিতা
হ্যাতাপিনো জাতিজরান্ত দর্শিনঃ।
মারম্ সসৈন্যমভিভূয় ভিক্ষবো
ভবেত জাতি মরণস্য পারগাঃ ॥ ৪২ ॥

এইটি অনিত্যবর্গের শেষ শ্লোক। তুখার-পুথিতেও এই শ্লোকটি আছে। পালি ধম্মপদে শ্লোকটি নাই; তবে অন্য পালি গ্রন্থে আছে,—

তস্মা সদা ঝানরতা সমাহিতা
আতাপিনো জাতি খয়ন্ত দস্‌সিনো।
মারম্ সসেজম্ অভিভুয় ভিক্‌খবো
ভবথ জাতি মরণস্‌স পারগা ॥
ইতিবুত্তকঃ ২ বগ্‌গ, ৯; পৃ ৪১।

বিঘ্ন-কৃত **ধর্মপদসূত্রের** অনুবাদের এই প্রথম বর্গে যে ২১টি শ্লোক আছে, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি ১০ম শতাব্দীর ধর্মপদের অনুবাদ বা তিব্বতী অনুবাদে পাওয়া যায়।

চীনা ১ম		চীনা ৪র্থ	চীনা ৩য়	তিব্বতী	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত
শ্লোক ১	–	১	×	১	×	–	–
			১ম ভাগ				
২		৩	২	৩		+	+
৩		১২	১৭	১২		+	
৪		১৫	২০	১৫		+	+

চীনা ১ম	চীনা ৪র্থ	চীনা ৩য়	তিব্বতী	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত
			২য় ভাগ			
৫	১৮	৩	১৭		+	+
৬	২২	৯	২১			
৭	—	—	—		—	—
৮	২৪	১০	২২			
৯	—	১৪	২৩	২৩	+	
১০	—	১৯	২৮	২৭		
১১		২০	৩০	২৯	+	+
			৩য় ভাগ			
১২	৩২	১	৩১	৩০	+	+
১৩	—	৪	৩৪	৩৩	+	+
১৪	—	৭	৩৫	৩৪	+	+
১৫	—	৯	৩৭	৩৬	—	+
১৬	—	—	—	—	—	—
			১ম ভাগ			
১৭	৩৮	৮	৩৯	৪০	+	—
১৮	—	—	—	—	—	—
১৯	২৫	১৬	২৬	২৫	+	—
			২য় খণ্ড			
২০			৪২	৪১	—	+
২১		—	৪৩	৪২	+	—

দ্রষ্টব্য—ফা-চিউ-চিঙ বা চীনা ধম্মপদসূত্রের অনিত্যবর্গের মূল পুথির সহিত অধিক মিল পাই। তিব্বতী ও সংস্কৃত উদানবর্গের ৭ম, ১৬শ, ১৮শ শ্লোকের উৎপত্তি কোথায় জানি না। সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃতের অনেকগুলি শ্লোক পরস্পরের অনুবাদ মনে হয়।

বিঘ্ন তৃতীয় শতাব্দীতে চীনে সংস্কৃত উদানবর্গ পাইয়াছিলেন; এবং তাহা হইতে প্রথম ৮টি বর্গের অনেক শ্লোক গ্রহণ করিয়াছিলেন। পেলিও-আবিষ্কৃত ধর্ম্মপদ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের পুথি। এই প্রবন্ধের Reference আমি কিছুই বাহুল্য ভয়ে দিই নাই। ইংরেজী যে পাণ্ডুলিপি হইতে ইহা সংক্ষিপ্তাকারে লিখিয়া দিয়াছি, তাহাতে সমস্ত বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। লেখক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—(+) চিহ্ন-এর অর্থ শ্লোকটি আছে। (−) চিহ্ন, সন্দেহ বা নাই।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন বাঙ্গালার রত্ন-সম্পদ্

আমরা আজকাল যে দেশকে বাঙ্গালা বলিয়া থাকি, তাহা প্রাচীন কালেও সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভূমি বলিয়া পরিগণিত হইত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্ব্বভাগে যখন প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্থ সাং ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিতে আসেন, তখন তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধন, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণ—এই তিনটি উপবিভাগের ফলফুল ও শস্যসমৃদ্ধি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন[১]। কিন্তু ইহা ছাড়া রত্ন-সম্পদেও যে প্রাচীন বাঙ্গালা বঞ্চিত ছিল না—ইহার প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর নহে।

(ক)

বজ্র

সংস্কৃত সাহিত্যে রত্নশাস্ত্র বা রত্নপরীক্ষা নামক এক শ্রেণীর গ্রন্থ আছে। তাহাতে পুরাকালে ভিন্ন প্রকারের রত্নাদির উৎপত্তিস্থলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ১৮৯৬ সংবৎসরে ফরাসী পণ্ডিত লুই ফিনো (Louis Finot) *Les Lapidaires Indiens* নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহাতে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক ও তৎপরবর্তী কালের আটখানি রত্নশাস্ত্র সম্বলিত গ্রন্থ টীকা, টিপ্পনী ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত করা হয়। গ্রন্থগুলির নাম—বুদ্ধভট্ট-কৃত রত্নপরীক্ষা, বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতা (৮০-৮৩ অধ্যায়), অগস্তিমত, নবরত্নপরীক্ষা, অগস্তি-কৃত রত্নপরীক্ষা, রত্নসংগ্রহ, লঘুরত্নপরীক্ষা ও মণিমাহাত্ম্য। এই সকল গ্রন্থের বর্ণনা হইতে ফিনো মহোদয় বজ্রের আকরের যে এক তালিকা সঙ্কলন করিয়াছেন,[২] তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল,—

বুদ্ধভট্ট-কৃত রত্নপরীক্ষা ··	সুরাষ্ট্র	হিমালয়	মাতঙ্গ	পৌণ্ড্র	কলিঙ্গ	কোশল	বৈণ্যাতট	সূর্পকার
বৃহৎসংহিতা ··	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	বেণাতট	ঐ
অগস্তিমত ···	ঐ	ঐ	বঙ্গ	ঐ	ঐ	ঐ	বেণু	ঐ
নবরত্নপরীক্ষা ··	ঐ	ঐ	মাতঙ্গ	ঐ	ঐ	ঐ	বৈরাগর	সোপার
অগস্তি-কৃত রত্নপরীক্ষা···	ঐ	ঐ	মগধ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
রত্নসংগ্রহ ···	ঐ	ঐ	মাতঙ্গ	ঐ	ঐ	ঐ	আরব	ঐ

১ Watters' Yan Chwang, Vol. II, pp. 184-185, 189-191.

২ Les Lapidaires Indiens, Introd., p. XXV.

ইহা হইতে দেখা যায় যে, দুইখানি গ্রন্থে মাতঙ্গের স্থলে বঙ্গ ও মগধের উল্লেখ আছে। অন্য প্রমাণের অভাবে ইহাদিগের উক্তি যে কত দূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা বলা কঠিন। পক্ষান্তরে উপরোক্ত ছয়খানি গ্রন্থেই পুণ্ড্রদেশ বজ্রমণির আকরের তালিকামধ্যে স্থান পাইয়াছে। কেবল ইহাই নহে, দুইখানি গ্রন্থে পুণ্ড্রদেশের বজ্রের সহিত অন্য দেশোৎপন্ন হীরার বর্ণ-বৈষম্যের কথা উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধভট্ট বলিয়াছেন[৩],—

"শ্যামং পৌণ্ড্রভবং মতঙ্গবিষয়ে নাত্যন্তপীতপ্রভম্।
স্থর্পারং সিতসার্দ্রমেঘসদৃশং রক্তঞ্চ সৌরাষ্ট্রজম্।
আতাম্রং হিমশৈলজং শশিনিভং বৈণ্যাতটোত্থং তথা
কালিঙ্গং কনকাবভাসরুচিরং শৈরীষকং কৌশলম্॥"

বরাহমিহিরের উক্তি এইরূপ[৪],—

"বেণাতটে বিশুদ্ধম্ শিরীষকুসুমোপমঞ্চ কৌশলকম্ সৌরাষ্ট্রকম্ আতাম্রম্ কৃষ্ণম্ সৌর্পারকম্ বজ্রম্ ঈষত্তাম্রম্ হিমবতি মতঙ্গজম্ বল্লপুষ্পসঙ্কাশম্ আপীতম্ চ কলিঙ্গে শ্যামম্ পৌণ্ড্রেষু সম্ভূতম্।"

তাহা হইলে দেখা গেল যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্ব্ব হইতেই পৌণ্ড্রদেশ (মোটামুটি বর্ত্তমান উত্তর-বাঙ্গালা) হীরকের আকরগুলির অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

এখন দেখা যাউক যে, মোটামুটি কোন্ সময়ের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালায় হীরক উৎপন্ন হইত। ইহার উত্তরে সর্ব্বপ্রথমে আমরা অগস্তিমত ও নবরত্নপরীক্ষা হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিব। শ্লোক দুইটি এই,—

"কৃতে কোশলকালিঙ্গৌ ত্রেতায়াং বঙ্গহেমজৌ।
দ্বাপরে পৌণ্ড্রসৌরাষ্ট্রৌ কলৌ স্থর্পারবেণুজৌ"॥

অগস্তিমত[৫]

"কৃতযুগে কলিঙ্গেষু কোসলে বজ্রসম্ভবঃ।
হিমালয়ে মতঙ্গাদ্রৌ ত্রেতায়াং কুলিশোদ্ভবঃ॥

৩ Les Lapidaires Indiens., Introd., p. 7

৪ Ibid., p. 60

৫ Ibid., p. 80

পৌণ্ড্রকে চ সুরাষ্ট্রে চ দ্বাপরে পরিসম্ভতিঃ।
বৈরাগরে চ সোপারে কলৌ হীরকসম্ভবঃ॥"

নবরত্নপরীক্ষা [৬]

শেষোক্ত শ্লোকটি চালুক্যবংশীয় মহারাজ সোমেশ্বর ভূলোকমল্ল কর্ত্তৃক ১১৩১ শকে বিরচিত মানসোল্লাস নামক গ্রন্থে প্রায় অবিকৃতভাবেই দেখিতে পাওয়া যায় [৭]। এই সকল প্রমাণ হইতে বুঝা যায় যে, উল্লিখিত রত্নশাস্ত্রকারদিগের মতে উত্তর-বাঙ্গালায় হীরকের উৎপত্তির কাল তাঁহাদের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী। এই সিদ্ধান্তের আনুকূল্যে অন্য প্রমাণও পাওয়া যায়।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধিকরণের একাদশ অধ্যায়ের নাম কোশপ্রবেশ। রত্নপরীক্ষা অধ্যায়টির উদ্দেশ্য, কোষাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক রাজকোষে প্রেরিত রত্নাদির পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। ইহাতে মণি-মুক্তা, বৈদূর্য্য, বজ্র ও প্রবাল—এই পাঁচ প্রকার রত্নের পরিচয় দেওয়া আছে। অধ্যায়টি কোনও সুপ্রাচীন রত্নশাস্ত্রের উপাদান লইয়া গঠিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। উহাতে বজ্রের উৎপত্তিস্থল এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

"সভারাষ্ট্রকং মধ্যমরাষ্ট্রকং কাস্তীররাষ্ট্রকং (পাঠান্তর, কশ্মকরাষ্ট্রকম্) শ্রীকটনকং মণিমন্তক-মিন্দ্রবানকঞ্চ বজ্রম্।"

এই সকল দেশের নির্দ্ধারণ করা বর্ত্তমান কালে সম্ভব নয়। তবে টীকাকার ভট্টস্বামীর ব্যাখ্যা আশ্রয় করিয়া মধ্যমরাষ্ট্রকে কোশলদেশ ও ইন্দ্রবান্‌কে অবন্তিদেশ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অর্থশাস্ত্র-ধৃত অতি প্রাচীন রত্নশাস্ত্রের সময়ে কোশল এবং কলিঙ্গ দেশে হীরক উৎপন্ন হইত, পরন্তু পৌণ্ড্র ও সুরাষ্ট্রে হইত না।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেও যে বাঙ্গালা দেশে হীরক উৎপন্ন হইত না, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৬০ সম্বৎসরে এক গ্রীক্ নাবিক Periplus of the Erythraean Sea নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাতে পশ্চিমে লোহিত সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থিত বন্দর ও বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলির এক ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে ভারতবর্ষ হইতে হীরক রপ্তানির কথা উল্লিখিত আছে; কিন্তু তাহা বর্ত্তমান মালাবার উপকূলের বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, বাঙ্গালার প্রসঙ্গে নহে। বোধ হয়, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের পর হইতে চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতকের মধ্যে উত্তর-বাঙ্গালায় হীরক উৎপন্ন হইত।

---

৬ Les Lapidaires Indiens, Introd., p. 148.

৭ Manasollasa, Vol. I, p. 65, Gaekwad's Oriental Series.

(খ)

মুক্তা

অতি প্রাচীন কাল হইতেই সিংহলদ্বীপ মুক্তা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালাতেও যে মুক্তা পাওয়া যাইত, তাহার প্রমাণ বিরল হইলেও একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে। প্রাচীন রত্নশাস্ত্র ও তৎসম্বলিত গ্রন্থগুলিতে মুক্তার আকরের যে বর্ণনা আছে, তাহা নিম্নের তালিকাতে প্রদর্শিত হইল,—

অর্থশাস্ত্র—তাম্রপর্ণী পাণ্ড্যকবাট পাশিকা কুলা চূর্ণী মহেন্দ্র কর্দমা স্রোতসী হ্রদ হিমালয়।

রত্নপরীক্ষা—সিংহল পরলোক সুরাষ্ট্র তাম্র পুণ্ড্র কৌবেরবাট হিমালয়।

বৃহৎসংহিতা—সিংহল পরলোক সুরাষ্ট্র তাম্রপর্ণী পারশব কৌবেরবাট পাণ্ড্যবাট হিমালয়।

অগস্তিমত—সিংহল আরবতী পারসীক বর্ব্বর।

নবরত্নপরীক্ষা—সিংহল আরবতী পারসীক বর্ব্বর।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, এক রত্নপরীক্ষাতেই পুণ্ড্রদেশের উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, এই একমাত্র প্রমাণের উপর নির্ভর করা চলে না। কিন্তু আরও একটি প্রমাণ আছে, যাহাকে কোনও মতে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

Periplus of the Erythraean Sea নামক পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূল বর্ণনাকালে লিখিত হইয়াছে—"There is a river near it called the Ganges and it rises and falls in the same way as the Nile. On its bank is a market-town which has the same name as the river Ganges. Through this place are brought malabathrum and Gangetic spikenard and pearls". এখানে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, Gangetic pearls (অর্থাৎ গঙ্গাসমুত্থিত মুক্তা) বাঙ্গালাদেশের বাহিরে মগধ প্রভৃতি দেশেও উৎপন্ন হওয়া বিচিত্র নহে। পরন্তু ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, মহাভারতের সভাপর্ব্বের ত্রিংশ অধ্যায়ে ভীমের পূর্ব্বদিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সাগরোপকণ্ঠবাসী রাজগণ কর্ত্তৃকই মুক্তা উপঢৌকনের উল্লেখ আছে,—

স সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছনৃপতীন্ সাগরানুপবাসিনঃ।
করমাহারয়ামাস রত্নানি বিবিধানি চ॥
চন্দনাগুরুবস্ত্রাণি মণিমৌক্তিককম্বলম্।
কাঞ্চনং রজতঞ্চৈব বিদ্রুমঞ্চ মহাধনম্॥

অন্যান্য খনিজ পদার্থ

Periplus গ্রন্থে গঙ্গানদী ও নগরের উল্লিখিত বর্ণানাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "It is said that there are gold mines near these places and there is a gold coin which is called *Caltis.*" ইহা হইতে মনে হয়, গ্রন্থকার স্বয়ং বাঙ্গালাদেশে সুবর্ণখনির অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা ভারতের পূর্ব্ব উপকূলস্থিত প্রদেশগুলি সম্বন্ধে যে সামান্যই ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যদি উক্ত প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান ছোটনাগপুর কিংবা ত্রিপুরা প্রদেশে ঐ সকল খনি বিদ্যমান ছিল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল

বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারত

অনেকের বিশ্বাস যে, প্রাচীন ভারত দর্শনশাস্ত্রে ও ন্যায়শাস্ত্রে, সাহিত্য, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে উন্নতি করিয়াছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অথবা অপর বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষ কোন উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। আমরা দেখাইব যে, এ বিশ্বাস সত্য নহে। সত্য হইলেও ইহাতে লজ্জার কারণ আমাদের কিছুই ছিল না। কারণ, বিবিধ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শেষ পরিণতি দর্শনশাস্ত্রে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্রের মধ্য দিয়াই মানবকে পরমাত্মার চরণোপান্তে উপস্থিত করে। সুতরাং আমাদিগের লজ্জিত হইবার কোনই কারণ ছিল না। প্রাচীন ভারত বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

নিউটন মাধ্যাকর্ষণ প্রথম আবিষ্কার করেন বলিয়া পাশ্চাত্যদেশে যশস্বী হইয়াছেন। বস্তুতঃ মাধ্যাকর্ষণ তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন নাই। ভারতের ভাস্করাচার্য্য সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উহা প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নিউটনের প্রায় ৫০০ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এই আবিষ্কার সিদ্ধ হইয়াছিল। পাশ্চাত্যদেশে কোপারনিকাস প্রথমে শুনাইয়াছিলেন যে, পৃথিবী প্রত্যহ তাহার মেরুদণ্ডের উপর ঘোরে; কিন্তু আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডল পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘোরে না। পৃথিবীর এই আহ্নিক গতির ফলেই জ্যোতিষ্কমণ্ডল ঘোরার ন্যায় দেখা যায়। কোপারনিকাস খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আর্য্যভট্ট কোপারনিকাসের প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর আহ্নিক গতি মানব-সমাজে প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এবং ঐ আহ্নিক গতির বেগ-গণনা ও বর্ত্তমান যুগের গণনার মধ্যে প্রভেদ মাত্র ১·৩৪৮″।[১] পৃথিবী যে প্রায় গোলাকার, তাহাও ভারতবর্ষে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। মহাবীর আচার্য্য সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে গণিতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের প্রথম আবির্ভাব ও বিস্ময়কর সফলতা-লাভ অধুনা কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য, বরাহমিহিরের নাম নিউটন অপেক্ষা কোন অংশেই কম গৌরবান্বিত নহে। Differential Calculus উচ্চ অঙ্কের

---

১ Prof. Gokhale.

গণিতবিদ্যা। এ বিদ্যা ভারতেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ভাস্করাচার্য্য এই বিদ্যার প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। তিনি পৃথিবীর ব্যাসের পরিমাণ গণনা করিয়াছিলেন; এবং পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্বও প্রথম নির্ণয় করিয়াছিলেন। বিষুবরেখার ক্রান্তি সামান্য একটু গতিবিশিষ্ট। এই গতি (Precession of the Equinoxes) ভারতবর্ষেই বরাহমিহির প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ভারতীয় গণিতজ্ঞগণ দশমিক গণনা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়গণ সর্ব্বপ্রথম পাটীগণিত, বীজগণিত এবং Spherical Trigonometry-র গণনাবিদ্যায় সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস যে, Integral Calculus-এর গণনা-পদ্ধতিও ভারতেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

রসায়নশাস্ত্রেও ভারতীয়গণ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়ের প্রণীত Hindu Chemistry পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, এতদ্দেশীয় প্রাচীনগণ এই বিদ্যায় কত অধিক উন্নত হইয়াছিলেন। লৌহ দ্রব করিয়া, একটি অখণ্ড স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া প্রাচীনগণ কেবল দিল্লী নগরীর শোভা বৃদ্ধি করেন নাই, বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিকগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। রসায়নবিদ্যায় ইউরোপ আরবগণের নিকট ঋণী, এবং তাহারা ভারতের প্রচীন আর্য্যগণের নিকট ঋণী। এতদ্দেশীয় কবিরাজ মহাশয়েরা অতি সাধারণ যন্ত্রের সাহায্যে যেরূপে ধাতু-ঘটিত ঔষধ প্রস্তুত করেন, তাহাও আশ্চর্য্যজনক। চিকিৎসাশাস্ত্র প্রাচীন ভারতে অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদীয় এবং তান্ত্রিক চিকিৎসাকে কোন কোন অংশে অনুন্নত বলা সম্ভব হইলেও, ঐ দুই চিকিৎসা-প্রণালী মোটের উপর অতি গভীর গবেষণার পরিচয় দেয়। শব-ব্যবচ্ছেদ সম্ভবতঃ ভারতেই প্রথম হইয়াছিল। অস্ত্রচিকিৎসাও এদেশে কম উন্নতি লাভ করে নাই। ভগ্ন জানুকে গমন-সমর্থ করা, অন্ধকে দর্শন-সমর্থ করা অত্যন্ত অধিক উন্নতির পরিচয় দেয়।[২] এ বিষয়েও ভারতই সকলের শিক্ষাগুরু। এ কথা আজ পণ্ডিতমণ্ডলীতে একরূপ স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। পীড়িত হইবার পূর্ব্বে দেহকে পীড়ার আক্রমণ হইতে মুক্ত রাখিবার নিমিত্ত দেহমধ্যে প্রতিষেধক ঔষধ প্রবেশ করাইবার প্রণালী ভারতবর্ষেই প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল। আমরা বাল্যকালে বসন্ত রোগের নিবর্ত্তক বাঙ্গলা টীকা দিবার প্রথা দেখিয়াছি। দেহমধ্যে কৃত্রিম উপায়ে ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দিবার প্রথা মানবের প্রচুর উপকার করিতেছে এবং আরও করিবে। ইহা ইউরোপে উদ্ভাবিত হইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রথম প্রচলিত হয়। দেহে রক্ত চলাচল করে, এই সত্য হার্ভি আবিষ্কার করিবার বহু পূর্ব্বে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদেই প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল।

---

২ ঋগ্বেদ, ১।১১১।৮।

মনুসংহিতা, রাজমার্ত্তণ্ড, গর্ভোপনিষদ্ প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, ভ্রূণ-তত্ত্ব এবং বংশানুক্রম শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণাও ভারতবর্ষেই প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। এতদুভয় শাস্ত্রই বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু পাশ্চাত্ত্যগণ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও যে পরিমাণ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই, তাহা বোধ হয় এতদ্দেশীয়গণ সেই কালেই পারিয়াছিলেন। তাঁহারা শুক্র শোণিত হইতে পুংকীট[৩] ও স্ত্রীকীটের[৪] অস্তিত্ব অবগত হইয়াছিলেন ; অথচ প্রাচীন ভারতে অনুবীক্ষণ আবিষ্কৃত হয় নাই। এ কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

Sociology বা সমাজতত্ত্ব বেদে, কোন কোন ব্রাহ্মণে এবং প্রাচীন স্মৃতিতে যেরূপ উন্নত অবস্থায় দেখা যায়, সেরূপ উন্নতি পাশ্চাত্ত্যদেশে এখন পর্য্যন্তও দেখা যায় না। এ বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীনগণ যত পরীক্ষা করিয়াছেন এবং যেরূপ বিস্তৃত পরীক্ষা করিয়াছেন, সেরূপ পরীক্ষা পাশ্চাত্ত্যদেশে আরম্ভ হইবারই বহু বিলম্ব আছে। সমাজে শ্রমবিভাগ করা, গুণ এবং কর্ম্মবিভাগ করা, internal competetion বা আভ্যন্তরীক প্রতিযোগিতা যথাসম্ভব হ্রাস করা, ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের আত্ম-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং অপকৃষ্টত্ব গুণ-কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করা, মানুষে মানুষে মৌলিক ভেদ স্বীকার করিয়াও ঐ ভেদকে অলঙ্ঘ্য না করিয়া, সমাজে ঐক্য স্থাপনের উপায় উদ্ভাবন করা সমাজ-বিজ্ঞানে উৎকৃষ্ট উন্নতির পরিচয় দেয়।

পশুদিগকে গৃহপালিত করিয়া মানব-সমাজ অসভ্য অবস্থা হইতে ক্রমশঃ সভ্যাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি, সভ্যতার উন্নতির সহিত domestication of animals বা পশুপালন অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট। আমার যত দূর জানা আছে, তাহাতে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ই দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যগণই প্রথমে হস্তীদিগকে গৃহপালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডারুইন্ দেখাইয়াছেন যে, কুকুর গৃহপালিত বৃক, ও বিড়াল গৃহপালিত সিংহ শ্রেণীর জীব। আমার বোধ হয়, ইহা অল্পায়াসেই প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষেই পশু-পালন-কৌশল ও পশু-পালন-বিদ্যা প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। এ মীমাংসা সত্য হইলে ভারতবর্ষই মানব-সমাজে সভ্যতার প্রথম পথপ্রদর্শক।

ভারতীয় প্রাচীন অর্থশাস্ত্র এবং রাজনীতি মানব-সমাজে প্রথম দেখাইয়া দিয়াছে—রাজতন্ত্রের সহিত গণতন্ত্রের কিরূপ আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য হইতে পারে।

ঋগ্বেদসংহিতায় 'স্বকৃৎ' সৃষ্টির উল্লেখ আছে। অর্থাৎ সৃষ্টি একবার মাত্রই হইয়াছিল। সুতরাং উহা নিশ্চয়ই অবিশেষ (undifferentiated)। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হওয়া জানা যাইতেছে। এই দুই তত্ত্ব একত্র করিলে আমরা কি বুঝিতে পারি?

---

৩ Spermatozoon. ৪ Ovum.

যাহা বুঝিতে পারি, তাহা বর্ত্তমান যুগের বিবর্ত্তন-বাদ হইতে অধিক বিভিন্ন নহে; বরং আমার মতে ঐ বাদের সমধর্ম্মী বলিয়া স্বীকার করা যায়। বর্ত্তমান জগতে জড় বিবর্ত্তন-বাদ এখনও সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু ছান্দোগ্য-শ্রুতির "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি"—এই মন্ত্রে জড় ও জীবের প্রভেদ যেরূপভাবে অস্বীকৃত হইয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান যুগের Electron-বাদের কোনই পার্থক্য দেখিতে পাই না। লজ্, টম্‌সন্, রাদারফোর্ড, রিগী প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গবেষণা হইতে পরমাণুর গঠন যাহা বুঝা যাইতেছে, তাহাতে জড় আর কিছুই থাকিতেছে না। রিগী বলিয়াছেন, Matter is composed of Electrons and Electrons are not matter in the ordinary acceptation of the term[৫]। এ কথার সহিত "সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়"—এ মীমাংসার পার্থক্য ত নাইই, বরং শ্রুতির মীমাংসাই বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক মীমাংসা হইতে অনেক অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে। জড় যদি কিছুই না থাকিল, তবে সকলই চৈতন্যময় হইয়া গেল। ইহার সহিত যখন মনে করি যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞান-বিবর্ত্তন বাদকে অন্ধশক্তি-চালিত মনে করে না, বরং নানা উন্নতি ও অবনতির মধ্য দিয়া এক পথেই বিবর্ত্তন সিদ্ধ হইতেছে—এইরূপই মনে করে, তখন এ মীমাংসা অনিবার্য্য হইয়া উঠে যে, ভারতীয় প্রাচীনগণের সৃষ্টি-রহস্য ভেদ করিবার যে সাধনা ছিল এবং তাহাতে যে সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান যুগ অপেক্ষা অনেক অধিক উন্নত ও পরিপুষ্ট।

শ্রীশশধর রায়

---

[৫] Modern Theory of Physical Phenomena.

ব্রহ্মদেশে বোধিসত্ত্ব লোকনাথ ও মহাযান বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অন্যান্য দেবতা

(ক)

ব্রহ্মদেশ বহুদিন হইতেই, এবং বর্ত্তমানেও, হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মের দেশ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে রাজা ধম্মচেতি (১৪৭২-৯২) কি ভাবে নূতন করিয়া ব্রহ্মদেশের হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মে নবজীবন সঞ্চার করেন এবং এই নব অভ্যুদয় উপলক্ষ্য করিয়া সিংহলের সঙ্গে কি করিয়া নূতন ধর্ম্ম-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহার ইতিহাস পণ্ডিতেরা সকলেই জানেন। তাহারও বহুদিন আগে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রমঞ্ঞদেশের (নিম্নব্রহ্ম) রাজধানী থাটোন নগরী হইতে উত্তর-ব্রহ্মের রাজধানী পাগানে কি করিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করে, তাহার কাহিনীও আজ আর অজ্ঞাত নয় [১]। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম খাটোনে, তথা নিম্নব্রহ্মে, কবে এবং কি করিয়া এই থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইল, তাহার খবর আমরা এখনও জানিনা। দীপবংশ ও মহাবংশ নামক সিংহলী বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, দেবপ্রিয় রাজর্ষি অশোক সোন ও উত্তর নামক দুই ভিক্ষুকে সদ্ধর্ম্ম প্রচারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন সুবর্ণভূমিতে, অর্থাৎ ব্রহ্মদেশে। ধর্ম্মচেতির রাজত্বকালে উৎকীর্ণ পেগু সহরের নিকটস্থ কল্যাণী শিলালেখেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে [২]। তাহা ছাড়া, জনশ্রুতি এ কথাও বলে যে, স্থবির পণ্ডিত বুদ্ধঘোষও একবার ব্রহ্মদেশে গিয়া সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের হাতে ঐতিহাসিক প্রমাণ এত স্বল্প যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই প্রশ্নের কোনও সুমীমাংসা চলিতে পারে না। তাহার উপর বর্ত্তমানে পণ্ডিতদের আলোচনার গতি দেখিয়া মনে হয়, এই দুইটি ঘটনার একটিকেও তাঁহারা বিশ্বাস করিতে রাজী নহেন। তবে, এ কথা খুব জোর করিয়াই বলা চলে যে, ব্রহ্মদেশে, অন্ততঃ নিম্নব্রহ্মে, হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারলাভ করিয়াছিল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেই। বর্ত্তমান প্রোম সহর হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে জনবিরল হ্‌মজা গ্রামের সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কয়েকটি শিলালেখের খণ্ডাংশ, ও দুইটি স্বর্ণশাসন পাওয়া গিয়াছে [৩]। এই লেখগুলি হইতে পরিষ্কার

---

১ History of Burma—Harvey, p. 25-30.

২ Ep. Birminica, Vol. III, Part II, pp. 83-84 and 185-86.

৩ An. R. A. S. India, Excavations at Hmawza, 1910-11 and 1911-12.

করিয়া সুসংলগ্ন ভাবে কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু এ কথা বুঝা যায় যে, তাহাতে বিনয়পিটকের বৃহত্তম খণ্ড মহাবগ্‌গ হইতে কোন কোন অংশ ঐ লেখগুলিতে উদ্ধৃত আছে; এবং বৌদ্ধধর্ম্মের যাহা সার তত্ত্ব, সেই দুঃখ, দুঃখের স্বরূপ ও দুঃখের নিবৃত্তি সম্বন্ধে কিছু তত্ত্বকথার উল্লেখ আছে। তাহা ছাড়া, কয়েক বৎসর হইল, আমাদের দেশের প্রাচীন তালপাতার পুথির মতন, সোনার পাতার কুড়ি পৃষ্ঠার একটি পুথি এই হ্‌মজা গ্রামের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে [৫]। এই পুথিটির পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই, কিন্তু যতদূর আমি পড়িতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয় যে, অভিধম্ম ও বিনয়পিটক হইতে কিছু কিছু অংশ ইহার মধ্যে উদ্ধার করা আছে। ইহার প্রথম পাতায় 'পতিচ্চসমুপ্পাদ' সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আছে, এবং শেষ হইয়াছে 'ইতিপি স ভগবা অরহন্ সমাসম্বুদ্ধো' ইত্যাদি কথাদ্বারা। কাজেই এই শিলালেখগুলি এবং পাণ্ডুলিপিটির বিষয় যে হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। ইহাদের একটিতেও তারিখ কিছু নাই। তবে অক্ষরের গঠন ও আকৃতি দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের লিপিরীতি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর কানাড়া-তেলেগু লিপির মতন। কাজেই, এ কথা অনুমান করা সহজ যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেই হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রহ্মদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করিয়াছিল, এবং দক্ষিণ-ভারতের কানাড়া-তেলেগু প্রদেশ হইতেই তাহার যাত্রার সূচনা হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে যাহা হউক, তখন হইতে না হইলেও, অন্ততঃ পাগানে ঐ হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের কিছুদিন পর হইতেই, অর্থাৎ অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই ব্রহ্মদেশ একান্তভাবে হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, এবং বর্ত্তমানেও ব্রহ্মদেশবাসীর উহাই জাতীয় ধর্ম্ম। ঐদেশে কোনদিন যে অন্য কোন ধর্ম্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম অথবা মহাযান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম, প্রসার লাভ করিয়াছিল, এ কথা কোন ব্রহ্মদেশবাসীই আজ আর সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন না।

কিন্তু, অন্যত্র এ কথা আমি প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার ও প্রতিপত্তির কালেই পূজারী ব্রাহ্মণ ও জ্যোতিষীদের, হিন্দু শিল্পী ও বণিক্‌দের অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম একদিন ব্রহ্মদেশে, স্বল্প হইলেও, প্রসার লাভ করিয়াছিল, এবং রাজসভায় সে ধর্ম্মের প্রতিপত্তি ছিল [৬]। তেমনি, কথাটা নূতন বলিয়া মনে হইলেও ইহা সত্য যে, একসময় মহাযান এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মও ব্রহ্মদেশে হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মের পাশে পাশেই স্থান লাভ করিয়াছিল। এবং শুধু পাশে পাশেই নয়, উত্তর-ব্রহ্মের রাজধানী পাগানে হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম

---

৫ An. R. A. S. India, Excavations at Hmawza, p. 171 ff, 1926-27.

৬ Brahmanical Gods in Buddhist Burma—Ray.

প্রতিষ্ঠার আগেই মহাযান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম কতকটা প্রসার লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক সাহিত্যে অবশ্য উল্লেখ আছে যে, হীনযান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার আগে পাগানে বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়াই কিছু ছিল না; কিন্তু এ উল্লেখের মূল্য খুব বেশী নয়। ব্রহ্মদেশের পুরাতত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ মঁসিয় ডুরোয়াজেল (Mon. Charles Duroiselle) ঠিকই বলিয়াছেন যে, এই উল্লেখের একমাত্র অর্থই হইতেছে—নানা দুর্নীতিমূলক আচার-ব্যবহার সংবলিত ও হিংসামূলক তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মকে একান্তভাবে অস্বীকার করিবার একটা চেষ্টা, এবং এ চেষ্টা বর্ত্তমান হীনযান-ধর্ম্মাবলম্বী ইতিহাসলেখকদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।[৬] বৌদ্ধ ঐতিহাসিক লামা তারনাথ লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশে সেন রাজাদের আমলে যখন মুসলমানদের উৎপাত আরম্ভ হয়, তখন অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও আচার্য্য মগধ হইতে পাগান ও কম্বোজদেশে পলাইয়া যান, এবং তাহার ফলে পাগানে, আরাকানে ও হংসাবতীতে (পেগু) মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার লাভ করে। তারনাথ যে তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সমর্থন আমরা পাই পাগানের 'অরী' নামক একটি প্রাচীন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের ইতিহাস মধ্যে। পণ্ডিতবর ডুরোয়াজেল প্রমাণ করিয়াছেন যে, তান্ত্রিক মহাযান ধর্ম্মসমাজভুক্ত এই 'অরী' সম্প্রদায় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীতে পূর্ব্ব-ভারত হইতে উত্তর-ব্রহ্মে আসিয়াছিল। তিব্বতী গ্রন্থ হইতে তিনি পাগানে এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন; তাহা ছাড়া, পাগানের মিন্‌নান্‌থু গ্রামের দুইটি মন্দিরের প্রাচীর-চিত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যেও সে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অষ্টম শতাব্দীতে এই সম্প্রদায় তান্ত্রিক ধর্ম্মদ্বারা অভিভূত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে নানাপ্রকার হিংসা ও দুর্নীতিমূলক আচার-পদ্ধতি প্রসার লাভ করে; উল্লিখিত প্রাচীর-চিত্রগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। পাগান-রাজবংশের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা রাজা আন্‌ওরহ্‌থা এই 'অরী' সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই; পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহাদের অস্তিত্বের খবর শিলালেখ হইতে পাওয়া যায়। তাহার পরে বোধ হয়, রাজা ধম্মচেতি কর্ত্তৃক হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মের নব জাগরণের ফলে ইহারা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়।[৭]

এই মহাযান ধর্ম্মের অস্তিত্বের প্রমাণ ব্রহ্মদেশের নানাস্থানে আবিষ্কৃত মহাযান দেবদেবীর মূর্ত্তি হইতেও পাওয়া যায়। নিম্নব্রহ্মে হ্‌মজা গ্রামের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে চারিহস্তবিশিষ্ট একটি বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; শিল্পরীতি দেখিয়া মনে হয়, খ্রীষ্টীয় ৭ম অথবা ৮ম শতাব্দীর

---

৬ An. R. A. S. India, 1915-16, Ari of Burma and Tantric Buddhism—Duroiselle

৭ Ibid.

রচনা এই মূর্ত্তিটি (১নং চিত্র)। মূর্ত্তিটির পায়ের পাতা দুইটি, এবং কনুই'র নীচে হইতে বাঁ হাতখানি ভাঙিয়া গিয়াছে। কিন্তু সু-উচ্চ মুকুট-ভূষণের উপর ধ্যানী-বুদ্ধ অমিতাভের যে উপবিষ্ট মূর্ত্তিটি, তাহা হইতেই বুঝিতে পারি যে, ইনি অবলোকিতেশ্বর ছাড়া আর কেহই নহেন [৮]। পাগানের আনন্দ ম্যুজিয়মেও ব্রোঞ্জধাতু-নির্ম্মিত অবলোকিতেশ্বরের একটি ছোট মূর্ত্তি আছে (২নং চিত্র)। তাঁহার দক্ষিণ বাহুতে বরদমুদ্রা এবং বাম বাহুতে একটি পদ্মের মৃণাল [৯]। কিন্তু ইঁহাকে অবলোকিতেশ্বর বলিয়া চিনিবার প্রধান চিহ্ন হইতেছে—ইহার মুকুটের উপর ধ্যানাসনে উপবিষ্ট ধ্যানীবুদ্ধের মূর্ত্তিটি। অবলোকিতেশ্বরের শক্তি তারাদেবীরও একটি ছোট ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে ম্যাগ্‌ওয়ে জেলার মনাবগাঁও গ্রামে (৩নং চিত্র)। দেবী পদ্মাসনে উপবিষ্টা; তাঁহার দক্ষিণ বাহুতে বরদমুদ্রা, বাম বাহুতে বিতর্কমুদ্রা এবং একটি পদ্মের মৃণাল [১০]। পাগানের আনন্দ ম্যুজিয়মেও একটি ছোট তারামূর্ত্তি আছে; এবং তাঁহার দেহভঙ্গী দেখিয়া সহজেই তাঁহাকে চেনা যায়। [১১]

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন তৃতীয়বার ব্রহ্মদেশের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখিতে যাই, তখন রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জি এইচ ল্যুস্ (G. H. Luce) মহাশয় আমাকে অনেকগুলি 'তেলাইঙ' শিলালেখের কথা বলেন, এবং তাহাদের মধ্যে যে একই সঙ্গে (বোধিসত্ত্ব) লোকেশ্বর (অর্থাৎ অবলোকিতেশ্বর) ও মৈত্রেয়ের উল্লেখ আছে, সেদিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। শিলালিপির এই উল্লেখের আশ্চর্য্য সমর্থন পাওয়া যায় ব্রহ্মদেশের প্রাচীন মূর্ত্তি-শিল্পে। বুদ্ধদেবের এক পাশে দণ্ডায়মান অবলোকিতেশ্বর ও অন্য পাশে মৈত্রেয়, এমন প্রস্তর-চিত্র ব্রহ্মদেশের অনেকস্থানেই পাওয়া গিয়াছে। হ্‌মজা গ্রামে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর-চিত্রে দেখা যায়, বুদ্ধদেবের দুই পাশে দুইটি চামরধারী অলঙ্কার-ভূষিত পুরুষ দণ্ডায়মান। ইঁহারা দুইজন যে অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয়—এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই [১২]। টৌয়ান্‌টে জেলার (Twante) সুদঞ্‌গ্‌দ্যি বিহারের একটি প্রস্তর-চিত্রেও বুদ্ধদেবের দুই ধারে পদ্মের উপর দণ্ডায়মান অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয়ের প্রতিচিত্র দেখা যায় [১৩]। আরাকানের মহামুনি

---

৮ An. R. A. S. India, 1911-12, Plate LXVIII, Fig. 6.

৯ An. R. A. S. Burma, 1916, p. 3.

১০ Ibid., 1919.

১১ Ibid., 1916, p. 3.

১২ An. R. A. S. Burma, 1909.

১৩ Ibid, 1915, p. 17, also foot-note. অনুরূপ প্রস্তর-চিত্র পাগান এবং অন্যান্য স্থানেও দুই চারিটি পাওয়া গিয়াছে।

মূর্ত্তিটিকেও অনেকে মৈত্রেয়ের মূর্ত্তি বলিয়াই মনে করেন [১৪]। মৈত্রেয়ের (পালি—মেত্তেয়) উল্লেখ অনেক শিলালেখেও আছে; কোন পুণ্য কাজের ফলস্বরূপ পরজন্মে যাহাতে তিনি মেত্তেয়কে দেখিতে পান, সোয়েগুজ্যি শিলালেখে রাজা আলাউংসিথুর এ রকম ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে [১৫]। পাগানের আনন্দ ম্যুজিয়ুমে পদ্মাসনে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে। তাঁহার ডান হাতে একটি তরবারি মাথার উপরে ধরিয়া তিনি অজ্ঞানতার অন্ধকার দূব করিতেছেন [১৬]; অন্য হাতখানিতে সাধারণতঃ একটি বই বুকের উপর ধরা থাকে, কিন্তু সে-হাতখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শিল্পরীতি দেখিয়া মনে হয়, মূর্ত্তিটি দশম অথবা একাদশ শতাব্দীর রচনা। এই ম্যুজিয়ুমেই আর একটি অপূর্ব্ব শিল্প-নিদর্শন আছে; তাহাতে একটি নর ও নারী অত্যন্ত নিবিড় দৈহিক মিলনালিঙ্গনে আবদ্ধ। খুব সম্ভব কোন মহাযান দেবতা তাঁহার শক্তিকে 'যব্‌য়ুম' ভঙ্গীতে আলিঙ্গন করিয়া আছেন; কিন্তু অন্য কোন চিহ্ন বা অভিজ্ঞানের অভাবে ইঁহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া কঠিন [১৭]।

(খ)

কিন্তু মৈত্রেয় ও অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী ও তারাদেবী অপেক্ষা ব্রহ্মদেশে, অন্ততঃ উত্তর-ব্রহ্মের রাজধানী পাগানে, বোধিসত্ত্ব লোকনাথের প্রতিষ্ঠা অনেক বেশী ছিল বলিয়াই মনে হয়। পাগানে মহাযান ধর্ম্মের যে কয়টি দেবদেবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে লোকনাথের মূর্ত্তিই সকলের চেয়ে বেশী। পাগানের আনন্দ ম্যুজিয়ুমে লোকনাথের ব্রোঞ্জধাতু-নির্ম্মিত দুইটি মূর্ত্তি আছে (৪নং ও ৫নং চিত্র)। দু'টি মূর্ত্তিই পদ্মাসনে ললিত ভঙ্গীতে উপবিষ্ট; তাঁহাদের ডানহাতে বরদমুদ্রা, বাম হাতে লীলাকমল। দক্ষিণে ও বামে দুইটি উর্দ্ধমুখী পদ্মের মৃণাল সুবঙ্কিম ভঙ্গীতে পত্রে পুষ্পে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মূর্ত্তি দুইটির অঙ্গে অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য; গলায় হার, কানে কুণ্ডল, মণিবন্ধে বলয়, বাহুতে বাজুবন্ধ, পায়ে নূপুর, এবং কটিদেশে মেখলা। ইহাদের মণ্ডন রীতি ও গড়ন একটু স্থূল হইলেও সুন্দর সন্দেহ নাই। মাথায় জটামুকুট, তাহার নীচ হইতে কুঞ্চিত অলকদাম লীলায়িত ভঙ্গিমায় বিলম্বিত। বোধিসত্ত্ব লোকনাথ অবলোকিতেশ্বরেরই একটি বিশেষ

---

১৪ J. B. R. S., 1912, Vol. III, Part I, p. 101.

১৫ Ibid., 1920—Maung Tin and Luce.

১৬ Ananda Museum Exhibit no. V, 6.

১৭ Ibid., Exhibit no. III, 93.

প্রকাশ। লোকনাথের 'সাধনে' তাঁহার যে পরিচয় আমরা পাই, মূর্ত্তিতত্ত্বের দিক্ হইতে সেই পরিচয় ও বর্ণনার সঙ্গে এই মূর্ত্তি দুইটি অবিকল মিলিয়া যায়। চারিটি সাধনের মধ্যে তিনটি সাধনে লোকনাথের সঙ্গে তাঁহার সঙ্গী আর কোন দেব অথবা দেবীর উল্লেখ নাই। এই তিনটি সাধনের মতে লোকনাথের দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা, বাম হস্তে পদ্ম। তিনটি সাধনের মতে তিন বিভিন্ন ভঙ্গীতে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, ললিতাসন, পর্য্যঙ্কাসন ও অর্দ্ধপর্য্যঙ্কাসন [১৮]। পাগানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ব্রোঞ্জ ধাতু-নির্ম্মিত একটি বুদ্ধমূর্ত্তির 'চালি' (stele) পাওয়া গিয়াছে। ভগবান্ বুদ্ধ পদ্মাসনের উপর ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট, তাঁহার দুই পাশে দুইটি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি পদ্মাসনের উপর ললিত ভঙ্গীতে আসীন। এই দুইটি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিও যে লোকনাথের মূর্ত্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই (৬নং চিত্র)। দুইটি মূর্ত্তিই ললিতাসনে উপবিষ্ট, একটি পা আসনের উপর গুটানো, আর একটি পা সুকুমার ভঙ্গীতে আসন হইতে বিলম্বিত। ইঁহাদেরও বাম হাতে পদ্মের মৃণাল; শুধু ডান হাতটি বরদমুদ্রায় না হইয়া অভয়মুদ্রায় স্থিত। কিন্তু লোকনাথ-মূর্ত্তিতে ডান হাতে অভয়মুদ্রা একেবারে বিরল নয়। প্রায় ঠিক অনুরূপ একটি লোকনাথের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে ঢাকা জেলার রঘুরামপুর গ্রামে; মূর্ত্তিটি এখন ঢাকা ম্যুজিয়ুমে রক্ষিত; তাঁহারও ডান হাত অভয়মুদ্রায় স্থিত [১৯]।

বলিয়াছি, তিনটি সাধনে লোকনাথের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে একক দেবতারূপে; কিন্তু চতুর্থ সাধনটিতে তাঁহার পরিচয় আরও সুবিস্তৃত। এই সাধনের মতে তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন তারা ও হয়গ্রীব, আটটি দেবতা, চারিটি দেবী, এবং চারি দিক্পাল; বস্তুতঃ চতুর্থ সাধনটিতে বোধিসত্ত্ব লোকনাথের সমস্ত মণ্ডলটির পরিচয় আছে। লোকনাথ শ্বেতবর্ণ; তাঁহার ডান হাতে বরদমুদ্রা এবং বামে লীলাকমল। আরও আছে,—

> ললিতাক্ষেপসংস্থন্ত মহাসৌম্যং প্রভাস্বরম্।
> বরদোৎপলকা সৌম্যা তারা দক্ষিণতঃ স্থিতা॥
> বন্দনাদণ্ডহস্তস্ত হয়গ্রীবোঽথ বামতঃ।
> রক্তবর্ণো মহারৌদ্রো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরপ্রিয়ঃ॥

---

১৮ Buddhist Iconography—Bhattacharya, pp. 38-40. ব্রহ্মদেশে প্রাপ্ত এই মূর্ত্তিগুলিকে এতদিন পর্য্যন্ত সাধারণতঃ মৈত্রেয়ের মূর্ত্তি বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এ পরিচয় ভুল।

১৯ Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum —Bhattasali; Plate 6 (b), page 27.

অর্থাৎ, তিনি ললিতাসনে উপবিষ্ট; তাঁহার দক্ষিণে শান্তমূর্ত্তি তারা, তারাদেবীর এক হাত বরদমুদ্রায়, অন্য হাতে উৎপল। বামে হয়গ্রীব; তাঁহার দুই হাতে দণ্ড, এবং তিনি নমস্কার-পরায়ণ [২০]। কিন্তু সাধনে যে বিবরণ আমরা পাই, তাহা হইতে অনেকখানি পৃথক্ এমন লোকনাথ মূর্ত্তির পরিচয় ইতিমধ্যেই আমরা পাইয়াছি। প্রাচীন বাংলার অন্ততঃ দুইটি পাণ্ডুলিপি-চিত্রে আমরা লোকনাথের যে পরিচয় পাই, তাহাতে দেখি বোধিসত্ত্ব আভঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। তাঁহার দক্ষিণ হাত বরদমুদ্রায়, বাম হাতে উৎপল। ইহার একটির পরিচয় লিপি এইরূপ—"চম্পিতলা লোকনাথ সমতটে অরিষস্থানে"। এই চিত্রটিতে লোকনাথের দক্ষিণে তারা, তাঁহার ডান হাতে বরদমুদ্রা ও বাম হাতে লীলাকমল। বামে হয়গ্রীব। লোকনাথের মাথার উপর দুই ধারে দুইটি বিদ্যাধর [২১]। অপরটির পরিচয়-লিপি এইরূপ,—"চম্পিত লোকনাথ ভট্টারক।" এখানেও লোকনাথের দক্ষিণে ও বামে তারা ও হয়গ্রীব লীলায়িতভাবে উপবিষ্ট। তারা দেবীর জোড়কর; কিন্তু হয়গ্রীবের দক্ষিণ হাত ব্যাখ্যান-মুদ্রায়, বাম হাতে কমল।[২২] এই দুইটি মূর্ত্তি ছাড়াও একটি তৃতীয় লোকনাথ-মূর্ত্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, ইহা দণ্ডায়মান। মূর্ত্তিটির ছয়টি হাত। ফরাসী পণ্ডিত মঁসিয় ফুসে' (Foucher) এই মূর্ত্তিটির বিবরণ এইরূপ লিখিয়াছেন,—তিনটি ডান হাতের একটি বরদমুদ্রায়, একটিতে লীলাকমল, ও আর একটিতে অক্ষমালা। বাম হাতের একটি বরদমুদ্রায়, একটি অস্পষ্ট ও একটিতে বই। এক এক ধারে দুইজন করিয়া তাঁহার চারিজন সহকারী,—দক্ষিণে লম্বোদর চঞ্চুমুখ নতজানু একটি, দ্বিতীয়টি বোধিসত্ত্ব তারা। বামে রক্ততারা ও চারিহস্তযুক্ত হরিদ্র তারা।[২৩] ইহার পরিচয়-লিপি এইরূপ,—"হরিকেল দেশে সীল লোকনাথ"। কাজেই, সাধনের বিবরণের সঙ্গে একান্তভাবে না মিলিলেও, শুধু ইঁহাদের পরিচয়-লিপির জোরেই একবারে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইঁহারা বোধিসত্ত্ব লোকনাথেরই মূর্ত্তি।

---

২০ Buddhist Iconography—Bhattacharya, pp. 38-39.

২১ Cambridge Mss. no. Add. 1643. ছবি ও বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum—Bhattasali, pp. 12-13, Plate I (a).

২২ As. Soc. of Bengal, Mss. no. A. 15. ছবি ও বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Ibid., p. 14. Plate II (b).

২৩ Iconographique Buddhique, Vol. I, quoted in Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, p. 13.

ব্রহ্মদেশের প্রাচীন রাজধানী পাগানের মিন্‌পাগান পল্লীর চ্যাউবাউচ্যি (Kyaubaukkyi) মন্দিরের ভিতরের দিকের দেয়ালে একটি সুবৃহৎ প্রাচীর-চিত্র আছে। চিত্রটির নায়ক ঠিক মাঝখানে লীলায়িত আভঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান, তাঁহার দেহ সুউন্নত, এবং বর্ণ শ্বেত। কালের প্রভাবে, মানুষের অযত্নে, এবং প্রকৃতির অত্যাচারে ছবির অনেকখানিই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তবু এ কথা বলা সহজ যে, মূর্ত্তিটির ছয়টির পরিবর্ত্তে, দশটি হাত ছিল। তাহার মধ্যে দুইটি বুকের উপর প্রার্থনায় জোড়কর; বোধ হয়, মন্দিরস্থ বুদ্ধের সুবৃহৎ ইট ও প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তিটির প্রতি এই বোধিসত্ত্ব তাঁহার প্রণতি নিবেদন করিতেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ দুইটি হাতে পদ্মের মৃণাল লীলায়িত ভঙ্গীতে ধৃত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ হাত দুইটি বরদমুদ্রায় স্থিত। বাকী চারিটি হাতের ভঙ্গী, অথবা ধৃত বস্তু যে কি ছিল, জানিবার উপায় নাই। এই লীলায়িত সুদর্শন, সুউন্নত মূর্ত্তিটির মাথার উপরে দুই দিকে দুইটি মূর্ত্তি, তাঁহাদের উভয়ের তিনটি করিয়া মাথা, তাঁহারা পদ্মাসনে উপবিষ্ট, এবং হাতে লীলাকমল ধৃত। কিন্তু ইঁহাদের একজনের বর্ণ শ্বেত, আর একজনের রক্তাভ বাদামী। প্রধান মূর্ত্তিটির পায়ের কাছে দুই দিকে দুইটি নতজানু-জোড়কর মূর্ত্তি। আমার মনে হয়, প্রাচীর-চিত্রের এই মূর্ত্তিটি বোধিসত্ত্ব লোকনাথেরই প্রতিচ্ছবি, এবং পায়ের কাছের নতজানু মূর্ত্তি দুইটি তারা ও হয়গ্রীবের মূর্ত্তি। মাথার উপরকার মূর্ত্তি দুইটির পরিচয় নির্দ্দেশ করা একটু কঠিন; হইতে পারে সাধনে উল্লিখিত আটটি পার্শ্বদেবতার ইঁহারা দুইটি। তাহা ছাড়া, বোধিসত্ত্ব লোকনাথের এত বিচিত্র পরিচয় আমরা জানি, এবং চিত্রে ভাস্কর্য্যে এত বিভিন্ন প্রকারের মূর্ত্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে যে, সাধনে তাহার বিস্তৃত বিবরণের উল্লেখ থাকা সম্ভব নয়। সেই জন্যই চাউবাউচ্যি মন্দিরের প্রাচীর-চিত্রের এই মূর্ত্তিটিকে বোধিসত্ত্ব লোকনাথের মূর্ত্তি বলিয়া পরিচয় দিতে আমার কোন দ্বিধা নাই। কারণ, তাঁহার দাঁড়াইবার ভঙ্গী, হাতের মুদ্রা ও ভঙ্গী, এবং পার্শ্বদেবতা তারা ও হয়গ্রীবের বর্ণনার সঙ্গে সাধনে উল্লিখিত বর্ণনার মিল আছে।

এখন, এ কথা জানা দরকার, ব্রহ্মদেশের হ্‌মজা ও পাগানে এবং অন্য দুইএকটি স্থানে প্রাপ্ত এই দেবদেবী-মূর্ত্তিগুলির মধ্যে যে মহাযান ধর্ম্মের পরিচয় আমরা পাইলাম, এই মহাযান ধর্ম্ম ব্রহ্মদেশে প্রসার লাভ করিল কি করিয়া, কোথা হইতে এবং কবে? নিম্নব্রহ্মে হ্‌মজা (Hmawza) গ্রামে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তিটি সম্বন্ধে বলা যায়, খুব সম্ভব ঐ মূর্ত্তিটি বাহির হইতেই কোন মহাযানধর্ম্মী বণিক্ অথবা শিল্পী সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল গৃহদেবতারূপে বা শিল্পনমুনারূপে। মূর্ত্তিটির শিল্পরূপ দেখিয়া এই সন্দেহ মনে জাগে। এই মূর্ত্তিটি ছাড়া মহাযান ধর্ম্মের অন্য দুইএকটি দেবতার মূর্ত্তি নিম্নব্রহ্মে পাওয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু, তাহা হইলেও

নিম্নব্রহ্মে মহাযান ধর্ম্মের প্রসার সম্বন্ধে নিশ্চিততর প্রমাণ আমাদের আর কিছু জানা নাই। কিন্তু উত্তর-ব্রহ্মের প্রাচীন রাজধানী পাগান সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। কারণ, পাগানে মহাযান ধর্ম্মের আবির্ভাব ও প্রচার সম্বন্ধে আমাদের হাতে স্বাধীন প্রমাণের অভাব নাই। বাঙ্‌লা দেশের সেনরাজাদের আমলে মহাযানধর্ম্মী আচার্য্য ও ভিক্ষুশিষ্যরা কি করিয়া পাগানে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল, এবং তখন সহজেই এই ধর্ম্ম তাহার দেবদেবী লইয়া সেখানে কি করিয়া একটু একটু প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহা ছাড়া, পাগানের ও ব্রহ্মদেশের অন্যান্য স্থানের তান্ত্রিক 'অরী' সম্প্রদায় যে মহাযান ও বজ্রযান ধর্ম্মেরই একটা প্রকাশ, তাহাও পণ্ডিতবর মঁসিয় ছ্যুরোয়াজেল প্রমাণ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, পাগানে যে কয়েকটি ব্রোঞ্জধাতু ও প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের উপর স্থানীয় শিল্পবৈশিষ্ট্যের এমন পরিচয় আছে যে, ছোট হইলেও তাহাদের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলিবে না যে, ভারতীয় মহাযানধর্ম্মী বণিক্ ও শিল্পীরা তাহাদের সঙ্গে করিয়া এই মূর্ত্তিগুলি ব্রহ্মদেশে লইয়া আসিয়াছিল। শিল্পরীতি হইতে এ কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ব্রহ্মদেশের পাগান রাজধানীতেই এবং সেখানকার প্রয়োজনানুসারেই এই মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। চ্যাউবাউচ্যি মন্দিরের প্রাচীর-চিত্রটি তাহার অকাট্য প্রমাণ। প্রাচীর-চিত্র কেহ ভারতবর্ষ হইতে বহন করিয়া লইয়া যায় নাই; এবং তথাকার জনসাধারণের সম্মতি না থাকিলে, এবং তাহারা মহাযান দেবদেবীর বিরুদ্ধাচারী হইলে বোধিসত্ত্ব লোকনাথ তাঁহার দেবদেবীমণ্ডলী লইয়া ঐ মন্দিরে স্থান পাইতে পারিতেন না।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত পাগান-ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। পাগান তখন ধনে জনে সমৃদ্ধ; সুবৃহৎ নগরী বিহারে মন্দিরে তখন ভরিয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন দেশ হইতে, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব-ভারত হইতে, লোকজন বাণিজ্য সম্ভার লইয়া আসিতেছে, যাইতেছে; শিল্পীকুল, ব্রাহ্মণ পূজারীদল, বৌদ্ধ আচার্য্য ও ভিক্ষুদল দলে দলে পাগান রাজধানীতে রাজাদেশে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন; আর পাগানের বৌদ্ধসম্রাটেরা বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমতলে দূত পাঠাইতেছেন পূজা সম্ভার লইয়া। সাহিত্যে, শিল্পে, নানান দেশের, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব-ভারতের সংস্কৃতিতে, পাগান তখন পূর্ব্ব-এশিয়ার এক সমৃদ্ধ নগরী। পাগানের সঙ্গে এই সময় পূর্ব্ব-ভারতের, অর্থাৎ বর্ত্তমান বিহার ও বঙ্গদেশের আত্মীয়তা খুব বেশী। পাগানের বিরাট্ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ও নানান মন্দিরে যে সব পোড়ামাটির ও পাথরের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপর সমসাময়িক গৌড়মগধের শিল্পের প্রভাব যে খুব বেশী, তাহা অন্যত্র (Sculptures and Bronzes from Pagan) আমি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং এই দুই দেশের সম্বন্ধের স্বরূপও নির্দ্দেশ করিয়াছি। পাগানের স্থাপত্যে গৌড়মগধের সমসাময়িক স্থাপত্যের প্রভাব পড়িয়াছে, এ কথাও আমি

অন্যত্র প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তাহা ছাড়া, পাগানে পোড়ামাটির উপর উৎকীর্ণ যে অসংখ্য নাগরী লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অক্ষর একেবারে সমসাময়িক গৌড়মগধের নাগরী লিপির অনুরূপ। ইহা ছাড়া অন্যান্য প্রমাণেরও অভাব নাই, তাহার বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নয়।

এই একান্ত নিকট আত্মীয় সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়া এই অনুমান লইয়া আমরা যাত্রা করিতে পারি যে, উত্তর-ব্রহ্মদেশের রাজধানী পাগানে মহাযানধর্ম্মের প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল পূর্ব্ব-ভারতের গৌড়মগধ দেশ হইতেই, এবং তাহার আনুমানিক কাল দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ। হয়ত তাহার আগে নবম শতাব্দীতেই এই আত্মীয়তার প্রথম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দশম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত একটা ধারাবাহিক সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, এবং এ সম্বন্ধের মধ্যে, স্বল্প হইলেও, মহাযান ধর্ম্মের স্থান ছিল, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তারনাথ এই সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আমরা জানি, নবম ও দশম শতাব্দী হইতেই গৌড় ও মগধে মহাযান ধর্ম্ম তাহার দেবদেবীর সুবিস্তৃত মণ্ডলী লইয়া খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল; হরিকেল, সমতট, মগধ, বিক্রমপুর, জগদ্দল ও বিক্রমশিলা বিহার ও অন্যান্য আরও অনেক স্থান এই মহাযান ধর্ম্মের কেন্দ্র ছিল। এবং ইহা একান্তই স্বাভাবিক যে, পাগানের সঙ্গে ধর্ম্ম ও শিল্প-বাণিজ্যের সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া গৌড়মগধের মহাযানধর্ম্ম উত্তর-ব্রহ্মের রাজধানীতে প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়, পাগানে প্রাপ্ত এই মহাযান ধর্ম্মের দেব-দেবীগুলির শিল্পরূপ ও রীতির মধ্যে। আনন্দ ম্যুজিয়মে রক্ষিত ব্রোঞ্জধাতু-নির্ম্মিত, ললিতাসনে উপবিষ্ট লোকনাথের যে কয়টি মূর্ত্তি আছে এবং ঐখানেই বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর যে মূর্ত্তিটি আছে, তাহাদের মুখ ও দেহাকৃতির মধ্যে একটা বিশেষ রূপ আছে; সেরূপের সঙ্গে সমসাময়িক পাল ও সেন রাজাদের আমলের গৌড়মগধ-ভাস্কর্য্যের নরনারীর মুখ ও দেহাকৃতির একটু খুব নিকট সম্বন্ধ চোখে ধরা না পড়িয়াই পারে না। তাহাদের বসন ও অলঙ্কারের সজ্জা এবং বিন্যাসও একই প্রকার। সবচেয়ে সাদৃশ্য দেখা যায় গড়ন ও মণ্ডন রীতিতে; এবং এই সাদৃশ্য এত বেশী যে, আমরা যদি বলি, গৌড়মগধের সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পীরাই এই সব মূর্ত্তি রচনা ও পরিকল্পনা করিয়াছিল, তবে খুব ভুল করিব না। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য্য যে, এই প্রভাবের মাত্রা খুব বেশী হইলেও এই মূর্ত্তিগুলিকে একান্ত ভাবে গৌড়মগধ শিল্প বলা চলিবে না; কারণ, স্থানীয় শিল্পবৈশিষ্ট্যের ছাপও ইহাদের উপর কিছু কিছু আছে। যাহা হউক, আমাদের এই ধারণার সবচেয়ে ভাল প্রমাণ পাওয়া

---

২৪ আমার রচিত Brahmanical Gods in Burma গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে, এবং Sculptures and Bronzes in Pagan গ্রন্থে ইহার সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

যায়, চ্যাউবাউচ্যি মন্দিরের প্রাচীর-চিত্রটিতে। এই চিত্রের নরনারীর মুখ ও দেহাকৃতিতে, বসন এবং অলঙ্কার সজ্জায় ও বিন্যাসে, সর্ব্বোপরি রঙের লীলায় বা রেখার গতিতে এবং দেহের গড়নে যে শিল্পরীতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সঙ্গে যদি আমরা কেম্‌ব্রিজ লাইব্রেরী ও কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার সচিত্র পাণ্ডুলিপি দুইটিতে (Mss. Add. 1643 এবং Mss. A. 15)[২৫] বোধিসত্ত্ব লোকনাথের যে দুইটি চিত্র আছে, তাহাদের দুইটির মুখ ও দেহাকৃতি, বসন ও অলঙ্কার-বিন্যাস এবং শিল্পরীতির তুলনা করি, তাহা হইলে বুঝা যাইবে এই আত্মীয়তার স্বরূপটি কি, এবং এই সম্বন্ধ কত নিকট। ইহাদের রূপে ও আকৃতিতে, ইহাদের দেহভঙ্গীতে, সর্ব্ববিষয়ে ইহাদের সাদৃশ্য এত বেশী যে, মনে হয়, সবগুলি চিত্রই বুঝি একই শিল্পীর রচনা। শুধুই যে গৌড়মগধের শিল্পরীতিই সেখানে তাহার আপন প্রভাব বিস্তার করিয়ছিল, তাহাই নয়; সঙ্গে সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম এবং মূর্ত্তিতত্ত্বও গৌড়মগধ হইতেই পাগানে প্রসার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার, এই প্রসারের মাত্রা খুব বেশী নয়; এই ধর্ম্মকে সমগ্র জনসাধারণ কিংবা রাজবংশ একান্ত করিয়া আপনাদের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করে নাই। জনসমষ্টির একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই এই ধর্ম্মের প্রভাব আবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়, এবং তাহা বিশেষভাবে ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের মধ্যেই। খুব কম সংখ্যক মূর্ত্তি যে পাওয়া গিয়াছে, তাহাই এ কথার একটি প্রমাণ। তাহা ছাড়া, এ প্রভাব বেশী দিন স্থায়ীও হয় নাই; কারণ, ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর ব্রহ্মদেশে আমরা আর কোন মহাযান ধর্ম্মের দেবদেবীর মূর্ত্তি পাই নাই বলিলেই চলে।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

---

[২৫] Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum—Bhattasali, Plates I (figs a, c, d.) and II (figs a and b).

হিন্দুগণিতে প্রস্তার ও সংযোগ-বিধি

হিন্দুদিগের গণিতশাস্ত্র অতি প্রাচীন; এমন কি, বৈদিক সাহিত্যেও ইহার বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ (১২০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব) বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত সকল শাস্ত্রের মধ্যে গণিতকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছে, বেদাঙ্গ জ্যোতিষ বলিতেছে—"যেমন ময়ুরদিগের মস্তকে শিখা, নাগসমূহের শিরে মণি, তেমন বেদাঙ্গের অন্তর্গত শাস্ত্রসকলের শীর্ষস্থানে রহিয়াছে গণিত।"[১] জৈনদিগের নিকট গণিত বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থেও গণিতের আলোচনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। জৈনদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ চারি শাখায় বিভক্ত, তাহাদিগকে 'অনুযোগ' অর্থাৎ বিধিনিয়মের বিশ্লেষণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই চারিটি শাখার মধ্যে একটির নাম 'গণিতানুযোগ' অর্থাৎ গণিতের বিধিগুলির ব্যাখ্যা, ইহা জৈনদিগের শিক্ষার একটি প্রধান বস্তু ছিল। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মসাহিত্যেও গণিতকে শ্রেষ্ঠ কলা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।[২] এই সকল উল্লেখ হইতেই অবগত হওয়া যায় যে, প্রাচীন ভারতে গণিত শাস্ত্রের অনুশীলন কতটা সমাদৃত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্ব্বের শতাব্দীর রচিত গণিতগ্রন্থ এখন একখানিও পাওয়া যায় না, সেই সময়ের গণিতের পরিচয় এখন কেবল জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ গণিতানুশীলন হইতে লাভ করা যায়।

জৈনদিগের একটি ধর্ম্মগ্রন্থের নাম স্থানাঙ্গসূত্র, উহা খ্রীষ্ট-জন্মের তিনশত বর্ষ পূর্ব্বের সময়ে রচিত; উহাতে হিন্দুগণিতের আলোচ্য বিষয় নিম্নেলিখিত দশবিধ বলা হইয়াছে,—পরিকর্ম্ম, ব্যবহার, রজ্জু, রাশি, কলাসবর্ণ, যাবৎতাবৎ, বর্গ, ঘন, বর্গবর্গ ও বিকল্প।[৩] শেষোক্ত বিকল্পই প্রস্তার ও সংযোগ, ইংরেজিতে যাহাকে permutation ও combination বলে। অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু থাকিলে, তাহাদিগকে অথবা তাহাদিগের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বস্তুকে, কত প্রকারে সাজান যাইতে পারে, তাহা জানিতে স্বভাবতঃই

---

১ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ, ৪ ;—যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্দ্ধণি স্থিতম্॥

২ বিনয়পিটক, চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৭; মজ্‌ঝিমনিকায়, প্রথম খণ্ড, পৃ ৮৫; কুল্লনিদ্দেস, পৃ ১৯৯।

৩ সূত্র, ৭৪৭, পরিকম্ম ববহারো রজ্জুরাশি কলাসবন্নে য।
জাবংতাবতি বগ্গো ঘনো ত তহ বগ্গবগ্গো বিকপ্পো ত॥

কৌতুহল জন্মে, এবং তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয়ও হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর অগ্র-পশ্চাতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সাজানকে তাহাদের permutation বা প্রস্তার বলে; ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর অগ্রপশ্চাতের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টি গঠনকে তাহাদের combination বা সংযোগ বলে।

প্রাচীন জৈনেরা প্রস্তার ও সংযোগকে 'বিকল্পগণিত' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন এবং উহার আলোচনাকে গণিতে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিলেন। স্থানাঙ্গসূত্র এই বিকল্প বা ভঙ্গগণিতকে অতি সূক্ষ্ম বলিয়াছেন,[৪] এইস্থানে টীকাকার বলিতেছেন যে, যদিও প্রস্তার ও সংযোগ বস্তুতঃ গণিতের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি উহাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার নিমিত্ত পৃথগালোচনা হইয়াছে। সূত্রকৃতাঙ্গসূত্রের (৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ) টীকাকার শীলাঙ্ক তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তার ও সংযোগ-বিধি বুঝাইয়াছেন, সেইগুলি অধুনা-প্রাপ্ত কোনও গণিত গ্রন্থে পাওয়া যায় না; মনে হয়, তাহা লোপ পাইয়াছে। এই ভঙ্গ বা বিকল্পগণিত জৈনদিগকে এমন আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, তাঁহারা গণিতের এই বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান বহুক্ষেত্রে নিয়োগ করিয়াছিলেন।[৫] ভগবতীসূত্রে (খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৩০০) এই বিষয়ের অনেক উদাহরণ লিপিবদ্ধ আছে। ন সংখ্যক মূল দার্শনিক বিধিকে একবারে একটি লইয়া (একক সংযোগ), একবারে দুইটি লইয়া (দ্বিক সংযোগ), একবারে তিনটি লইয়া (ত্রিক সংযোগ) অথবা একবারে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক লইয়া কত রকম দার্শনিক বিধির সমষ্টিতে সাজাইতে পারা যায়, এই বিষয়ে আলোচনা রহিয়াছে;[৬] এইরূপভাবে বিভিন্ন করণগুলিকে কত প্রকার সমষ্টিতে সাজাইতে পারা যায়;[৭] কতকগুলি স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক জাতীয়কে এক, দুই বা তদপেক্ষা অধিক লইয়া কত প্রকার দলে গঠিত করা যায় এবং আরও অন্যান্য বস্তুর প্রস্তার ও সংযোগ সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে।[৮] এই সকল বিষয়ে লব্ধফল একেবারে নির্ভুল এবং আধুনিক প্রণালীতে নিম্নলিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়,—

---

৪ প্রস্তার ও সংযোগ-বিধির এইরূপ আদর প্রাচীন হিন্দুলেখকগণও দেখাইয়াছেন। তাঁহারা দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও ছন্দের ক্ষেত্রে এই বিকল্পগণিতের ব্যবহার করিয়াছেন।

৫ ভগবতীসূত্র, সূত্র ৩১৪

৬ ঐ, ৮।৫

৭ ঐ ৮।৪ (সূ ৩৪১)

৮ ঐ ৯।৩২ (সূ ৩৭১-৩৭৪); জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি, ২০।৪।৫, অনুযোগদ্বারসূত্র ৭৬, ৯২, ১২৬।

$$^{ন}স_{১} = ন, \quad ^{ন}স_{২} = \frac{ন(ন-১)}{১.২}, \quad ^{ন}স_{৩} = \frac{ন(ন-১)(ন-২)}{১.২.৩}, \ldots\ldots$$

$$^{ন}প_{১} = ন, \quad ^{ন}প_{২} = ন(ন-১), \quad ^{ন}প_{৩} = ন(ন-১)(ন-২) \cdots\cdots$$

[এখানে $^{ন}স_{র}$ = ন সংখ্যাক বস্তুর একবারে র সংখ্যাক লইয়া সমষ্টি, $^{ন}প_{র}$ = ন সংখ্যাক বস্তুর একবারে র সংখ্যাক লইয়া প্রস্তার অর্থাৎ সাজান।]

ভগবতীসূত্র এইরূপভাবে এক, দুই, তিন ও চারটি সংখ্যার প্রস্তার ও সংযোগ ফল দিয়া বলিতেছে, "এই নিয়মে পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ প্রভৃতি সংখ্যক ও অসংখ্য বস্তুর একবারে একটি, একবারে দুইটি, একবারে তিনটি অথবা আরও অধিক লইয়া সমষ্টি বা সংযোগ করা যাইতে পারে।" [৯]

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, টীকাকার শীলাঙ্ক প্রস্তার ও সংযোগ সম্বন্ধে তিনটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন; [১০] উহার দুইটি সংস্কৃতে, একটি অর্দ্ধমাগধীতে রচিত। এ পর্য্যন্ত অর্দ্ধমাগধীতে লিখিত কোনও গণিত গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, সুতরাং উহা যে লোপ পাইয়াছে এবং এককালে বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত সূত্র দুইটিও অধুনা-প্রাপ্ত কোনও গ্রন্থে নাই। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, একখানি অর্দ্ধমাগধীতে লিখিত এবং অন্ততঃ একখানি সংস্কৃতে লিখিত প্রাচীন গণিত গ্রন্থ অধুনা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শীলাঙ্ক যে তিনটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার প্রথমটিতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দ্রব্যকে কত প্রকারে সাজাইতে পারা যায়, তাহাই বলা হইয়াছে (ভেদসংখ্যাপরিজ্ঞানায়)[১১]—"এক হইতে আরম্ভ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পর্য্যন্ত পরস্পর গুণ করিয়া যে রাশি হয়, তাহাই বিকল্পগণিতে বাঞ্ছিত ফল।" অর্থাৎ যদি ন সংখ্যক বিভিন্ন দ্রব্য দেওয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদিগের সকলগুলি লইয়া প্রস্তার-সংখ্যা হইবে ১.২.৩.······(ন—১).(ন—২)।

---

৯ ঐ ৮।১ (সূ—৩১৪), এই অর্দ্ধমাগধী সূত্রের সংস্কৃত অনুবাদ—

"এবম্ এতেন ক্রমেণ পঞ্চষট্ সপ্ত যাবৎ দশ সংখ্যেয়ানি অসংখ্যেয়ানি অনন্তানি চ দ্রব্যাণি ভণিতব্যানি এককসংযোগেন দ্বিকসংযোগেন ত্রিকসংযোগেন যাবৎ দশসংযোগেন উপযুজ্য যথা যথা সংযোগ উত্তিষ্ঠন্তি তে সর্বে ভণিতব্যা······।"

১০ শীলাঙ্ক-কৃত সূত্রকৃতাঙ্গসূত্রের টীকা, সময়াধ্যায়ন, অনুযোগদ্বার, সূঃ ২৮।

১১ একাদ্যা গচ্ছপর্যন্তাঃ পরস্পর সমাহতাঃ।
রাশয়স্তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং বিকল্পগণিতে ফলম্।

অবশিষ্ট দুইটি সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তার-সংখ্যা অবগত হওয়া যায়। একটি যথা,—

"গণিতেঽন্ত্যবিভক্তে তু লব্ধং শেষৈর্বিভাজয়েৎ।
আদাবন্তে চ তৎ স্থাপ্যং বিকল্পগণিতে ক্রমাৎ॥"

অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রস্তার-সংখ্যাকে শেষ সংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া যে ভাগফল থাকিবে, তাহাকে অবশিষ্ট সংখ্যা দিয়া ভাগ করিবে। তারপর বিকল্পগণিতে এক হইতে আরম্ভ করিয়া সংখ্যাগুলি পরপর সাজাইয়া রাখিতে হইবে।

অর্দ্ধমাগধী শ্লোকটি এইরূপ,—

পুব্বানুপুব্বি হেট্টা সময়াভেএণ কুণজহাজেথম্।
উপরিমতুল্লং পুরন্ত নসেজ্জ পুব্বক্কম্মো সেসে॥

পূর্ব্বোক্ত সূত্র দুইটির ব্যাখ্যা বড় জটিল। সুতরাং টীকাকার শীলাঙ্ক একটি নিদর্শন দিয়া উহাদের অর্থ প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শীলাঙ্ক বলিতেছেন,—"$ক_১, ক_২, ক_৩, \cdots ক_ন$ এইরূপ ন সংখ্যক দ্রব্য আছে মনে করা যাউক, পূর্ব্ব নিয়ম অনুসারে উহাদের সকলগুলি লইয়া প্রস্তার সংখ্যা $= ১.২.৩......(ন—১).ন$, অথবা $\underline{|ন}$। ইহাদিগের মধ্যে যে সংখ্যাগুলির আদিতে $ক_ন$ আছে, তাহাদের প্রস্তার-সংখ্যা $= \frac{\underline{|ন}}{ন} = \underline{|(ন—১)}$। তাহা হইলে $\underline{|(ন—১)}$ সংখ্যক সাজান দলে $ক_ন$ আদিতে থাকে। আবার এই দলগুলির মধ্যে $ক_{ন-১}$ আদিতে আছে, তাহার প্রস্তার-সংখ্যা $\frac{\underline{|(ন—১)}}{(ন—১)} = \underline{|(ন—২)}$ অর্থাৎ $ক_ন$ এর পর $ক_{ন-১}$ আছে এবং $ক_ন$ আদিতে আছে, এইরূপ প্রস্তার-সংখ্যা $= \underline{|(ন—২)}$। এইরূপে $ক_{ন-২}, ক_{ন-৩}, ক_{ন-৪}$, পর পর থাকিবে—এইরূপ প্রস্তার-সংখ্যা বাহির করা যাইতে পারে। $ক_ন$-এর পর $ক_{ন-১}$, এবং তাহার পর যে কোনও নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য থাকিবে, এইরূপ সাজাইবার প্রস্তার-সংখ্যা $= \frac{\underline{|(ন—২)}}{(ন—২)} = \underline{|(ন—৩)}$। এইরূপভাবে অগ্রসর হইলেই দ্রব্যগুলির বিভিন্ন প্রস্তার-সংখ্যা পাওয়া যাইবে।"

এত প্রাচীন কালে পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানের গণিত গ্রন্থে প্রস্তার-সংখ্যা বাহির করিবার এইরূপ বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ হওয়ার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। হেমচন্দ্র সূরি (১০৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) তদ্‌রচিত অনুযোগদ্বারসূত্রের ৯৭ সূত্রের টীকায় এই নিয়মই উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হিন্দুগণ খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে প্রস্তার ও সংযোগ-বিধির বিশদ ব্যাখ্যা প্রদানে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং

অধ্যাপক ডক্টর ডি ই স্মিথ যে তদ্‌রচিত গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ ৫২৫) লিখিয়াছেন—"ভাস্কর লীলাবতী গ্রন্থে ইহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে হিন্দুগণের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকৃষ্ট হয় নাই"— ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

পৃথিবীর অন্যত্র এই বিষয়ের প্রথম আলোচনা হয় চীনদেশে। সেখানে পুরাতন I-king গ্রন্থে প্রস্তার সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। এ বিষয়ে গ্রীক্ লেখকেরা অধিক মনোযোগ দেন নাই। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৩৫০ সালে জেনোক্রেটেস নামক একজন দার্শনিক প্রস্তার-বিধির একটি নিদর্শন দিয়াছিলেন।[১২] ক্রিসিপ্প নামে আর একজন দার্শনিক (২৮০+২০৭ খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব) ও হিপার্কাস নামক একজন গণিতজ্ঞ (১৪০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব) প্রস্তার বিধির আরও দুইটি নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রীক্ লেখকদিগের মধ্যে কেহই সংযোগ-বিধির কোনও উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ নাই।[১৩] লাতিন লেখকদিগের মধ্যে বিথিয়াস্ (Boethius) ৫১০ খ্রীষ্টাব্দে সংযোগ-বিধির একটি নিদর্শন দিয়াছিলেন, ন সংখ্যক দ্রব্যের একবারে দুইটি করিয়া লইলে সমষ্টি কত হইবে, তাহাই তিনি দেখাইয়াছিলেন। মধ্যযুগে ইহুদি লেখকগণ গণিত-জ্যোতিষের আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। এজরা নামক পণ্ডিত (১১৪০ খ্রীষ্টাব্দে) গ্রহযুতিবিচারকালে সংযোগ-বিধির আলোচনা করিয়াছিলেন। শনিগ্রহ অপরাপর জ্ঞাত গ্রহগুলির একবারে দুইটি, তিনটি, অথবা তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক লইয়া কতপ্রকারে যুত হইতে পারে, তিনি তাহার নিদর্শন দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, সাতটি দ্রব্যের একবারে দুইটি করিয়া লইয়া সংযোগ-সংখ্যা, পাঁচটি করিয়া লইলে যে সংযোগ-সংখ্যা হইবে তাহার সমান; এইরূপে তিনটি করিয়া লইলে অথবা চারিটি করিয়া লইলে সংযোগ-সংখ্যা একই হইবে এবং ছয়টি করিয়া লইলে অথবা একটি করিয়া লইলেও সংযোগ-সংখ্যা সমান হইবে। তিনি কোনও সাধারণ নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন নাই, তবে ন সংখ্যক দ্রব্যের একবারে র সংখ্যক লইলে সংযোগ-সংখ্যা কি হইবে, তাহা তিনি অবগত ছিলেন।[১৪]

স্থানাঙ্গসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে গণিতের যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, সে সকল বিষয়ই পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গণিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মগুপ্তের মতে গণিতে ব্যবহারের আটটি বিষয় আছে, তন্মধ্যে মিশ্রকই অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয় ও

---

১২ গাউ (Gow), গ্রীক্‌গণিতের ইতিহাস, পৃ ৭১, ৮৬।

১৩ ডি ই স্মিথ, গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৫২৪।

১৪ ঐ ঐ ঐ পৃ ৫২৫।

প্রস্তার-সংযোগ প্রধান। ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের (৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে) পর শ্রীধরের ত্রিশতিকায় (৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে) এবং মহাবীরের গণিতসারসংগ্রহে (৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে) প্রস্তার ও সংযোগ সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ভাস্কয়াচার্য্যের লীলাবতী গ্রন্থের গণিত বিভাগে (১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে) প্রস্তার ও সংযোগ বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা হইয়াছিল। লীলাবতী গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রস্তার ও সংযোগ সম্বন্ধীয় অনেকগুলি প্রশ্নোত্তর রহিয়াছে, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সেই স্থানে ভাস্কর গায়ত্রীছন্দের দুই বা তদধিক বাক্যাংশ লইয়া প্রস্তার-সংখ্যা বাহির করিয়াছেন, নানাবিধ স্বাদ ও গন্ধের দুই বা তদধিক লইয়া সংযোগ-সংখ্যা বাহির করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ভাস্কর ন সংখ্যক বস্তু র সংখ্যা লইয়া কি প্রস্তার সংখ্যা হয়, তাহা জানিতেন, অর্থাৎ $^{ন}প_{র} = ন(ন-১)(ন-২)\cdot(ন-র+১)$ হইবে, ইহা তিনি জানিতেন। তিনি আরও জানিতেন যে, ন সংখ্যক বিভিন্ন বস্তর প্রত্যেক বারে র সংখ্যক লইলে $^{ন}স_{র} = \frac{ন(ন-১)\ (ন-২)\cdots\cdots(ন-র+১)}{১.\ ২.\ ৩.\ ৪.\cdots র}$ হইবে।

হিন্দুগণিতে প্রস্তার ও সংযোগ-বিধির মোটামুটি ইতিহাস দেওয়া হইল। অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু থাকিলে, তাহাদিগকে অথবা তাহাদিগের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বস্তুকে, কত প্রকারে সাজাইতে পারা যায়, তাহা জানিবার কৌতুহল মানুষের সহজেই আসিয়া থাকে এবং এই কৌতুহলের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের সেই সাজাইবার প্রণালীর জ্ঞানও যে সর্ব্ব প্রথমে জন্মিয়াছিল, ইহাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

তিব্বতী ভাষায় কয়েকটি বৌদ্ধগান

পঁচিশ শত বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ তথাগত যে সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক শতাব্দীর মধ্যে যাহা হীনযান ও মহাযান—এই দুই বিরাট্ সম্প্রদায়ে এবং অন্যান্য নানা ক্ষুদ্র-বৃহৎ শাখায় ভাগ হইয়া গেল, দীর্ঘ শতাব্দীর মধ্যে তাহা কোন্ পরিণতি লাভ করিল, কোন্ পথে সেই অনাত্মবাদী মূর্ত্তিপূজাবিরোধী ধর্ম্ম শত শত দেবদেবীকে আশ্রয় করিল, সে কি এদেশ হইতে একেবারেই লুপ্ত হইয়া গেল—কোন চিহ্নই রাখিয়া গেল না—বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই প্রশ্ন ঐতিহাসিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; বৌদ্ধধর্ম্মের শেষদিক্‌কার ইতিহাসটা ঠিক বোঝা যাইতেছিল না। ঠিক এই সময়ে বাংলা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মনে আর একটা সমস্যা জাগিয়াছিল; শূন্যপুরাণ, ধর্ম্মমঙ্গল, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি কোনটিতেই বাংলা ভাষার আদিম রূপ পাওয়া যায় না; তবে কি এই ভাষার জন্মরহস্য চিরদিনই অভেদ্য যবনিকায় আবৃত থাকিবে? এমন সময়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন—পূজনীয় আচার্য্য মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত "হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালায় বৌদ্ধগান ও দোহা" এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন"। বাংলা ভাষার ইতিহাসে এই দুইখানিই অমূল্য গ্রন্থ; শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন চতুর্দ্দশ শতকের বাংলার রূপ কি ছিল দেখাইল; বৌদ্ধগান ও দোহার যে অংশ বাংলা বলিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বাংলা ভাষার জন্মকালকে আরও কয়েক শতাব্দী পিছাইয়া লইয়া গেল এবং এই ভাষার বনিয়াদিয়ানার অধিকার পাকা করিয়া দিল, বৌদ্ধগান ও দোহায় লুই ও অন্যান্য সিদ্ধাচার্য্যগণের যে চর্য্যাপদগুলি পাওয়া গেল, সেগুলি বাংলার প্রাচীনতম রূপ দেখাইল।

এত' গেল বাংলাভাষার দিকের কথা। বৌদ্ধগান ও দোহা আমাদের আর একটা নূতন জিনিস দিল, আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আর একটা নূতন জগৎ প্রকাশিত করিল। তাহার সাহায্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ পরিণতির ইতিহাস কিছু কিছু আমরা বুঝিতে পারিলাম। ভগবান্ বুদ্ধের ধর্ম্ম কোন্ পথে বীভৎস তান্ত্রিক আচার-বিচারে পরিণত হইয়াছিল, এই তান্ত্রিকতার মতবাদটি কি, তাহার কিছুটা ধরা গেল। বেণ্ডল সাহেবের সুভাষিতসংগ্রহ, শাস্ত্রী মহাশয়ের বৌদ্ধগান ও দোহা ও আরও দু'একটা ছিন্ন পুথির অংশ ঐতিহাসিকগণের নিকট অমূল্য হইয়া উঠিল; এইগুলিই সে যুগের বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনার একমাত্র উপাদান হইল।

পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় অনেক নূতন কথা শুনাইলেন; কথাগুলি অদ্ভুত ঠেকিল, ঠেকিবার কথাই বটে।

শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধগান ও দোহার ভূমিকার শেষে লিখিলেন, "সুতরাং মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বাংলা দেশে একটা প্রবল বাঙ্গালা সাহিত্যের উদয় হইয়াছিল। তাহার একটা ভগ্নাংশ মাত্র আমি বাঙ্গালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি। ভরসা করি, তাঁহারা যেরূপ উদ্যম সহকারে বৈষ্ণব সাহিত্য ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন, ঐরূপ উৎসাহে বৌদ্ধ ও নাথ সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করিবেন। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে তিব্বতী ভাষা শিখিতে হইবে, তিব্বত ও নেপালে বেড়াইতে হইবে, কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ, মণিপুর, সীলেট প্রভৃতি প্রান্তবর্ত্তী দেশে ও প্রান্তভাগে ঘুরিয়া গীতি, গান ও দোহা সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক পরিশ্রম হইবে, অনেকবার হতাশ হইয়া ফিরিতে হইবে। কিন্তু যদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, যাঁহারা এ পর্য্যন্ত কেবল আপনাদের কলঙ্কের কথা কহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা একেবারেই সত্য কথা কহেন নাই।"

বাংলার আদি খুঁজিতে হইলে, তিব্বতে দেখিতে হইবে, এ কথাটা নূতনই বটে; কিন্তু কথাটা যে কতখানি সত্য, তাহা এতদিন পরে বোঝা যাইতেছে।

তেঙ্গুরের একটা অংশে অনেকগুলি গীতিকার তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যায়। ইহাদের মূল ভাষা কি ছিল, তাহা আজ বলা দুঃসাধ্য; কিন্তু ইহাদের একটিও যে অন্ততঃ বাংলা ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা Indian Historical Quarterlyতে "তত্ত্বস্বভাবদৃষ্টিগীতিকাদোহা" নামক লূইপাদ-কৃত একটি দোহার তিব্বতী অনুবাদ ও শাস্ত্রী মহাশয়-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বাংলা মূলের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছিলাম; ইহাতে অন্ততঃ এইটা প্রমাণ হয় যে, প্রায় হাজার বছর আগেও বাংলা ভাষার এমন একটি গৌরব ছিল যে, বাংলা দোহা তিব্বতীতে অনূদিত হইত। এই একটি দোহার নজীরে তেঙ্গুরের এই অংশের অন্যান্য গীতিকা ও দোহাসংগ্রহগুলির ভাষাও বাংলা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় কিনা, ঠিক বলিতে পারি না। হয়ত' হইতে পারে, হয়ত' বা নাও হইতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয় অবশ্য ধরিয়া লইয়াছেন, সেগুলার ভাষা বাংলা। যদি বৌদ্ধগান ও দোহার মত অন্য কোন সংগ্রহ এবং তেঙ্গুরের এই অংশে তাহাদের তিব্বতী অনুবাদ আমরা কোন দিন পাই, তবেই এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এরূপ সংগ্রহ যে আরও অনেক আছে, তাহার সন্ধান আমরা পাইয়াছি। আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভি আমাদের জানাইয়াছেন যে, নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগারে আরও কয়েকটি দোহাকোষ আছে। সেগুলার জন্য লেখাও হইয়াছিল, কিন্তু এখনও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। যদি কোন দিন কেহ এগুলিকে উদ্ধার করিতে পারেন, তবে আশা করা যায়, অনেক নূতন কথা আমরা শুনিতে পাইব।

এই গীতিকাগুলি সহজযানের গ্রন্থ; মহাযানের শেষ পরিণতি বজ্রযান, সহজযান। ইহাদের দার্শনিক মতবাদ যে কি ছিল, বলা দুষ্কর; কারণ এই মতের অতি অল্প কয়েকখানি গ্রন্থই আমরা এখন পর্য্যন্ত পাইয়াছি। তবে এ কথা বলা যায় যে, খাঁটি বাংলাভাষার ও বাংলাদেশের mysticism-এর একটি আশ্চর্য্য রূপ ইহাদের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি শাস্ত্রী মহাশয়ের "অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ" Gaekwad's Oriental Series-এ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তবুও বিষয়টা দুর্ব্বোধ্যই রহিয়া গিয়াছে। তাহার উপর আর এক অসুবিধা—একখানি পুথির সাহায্যে গ্রন্থ সম্পাদিত হইলে, তাহাতে অনেক ত্রুটি থাকিবার কথা; সম্পাদিত গ্রন্থগুলির অনেক অংশের এই কারণে অর্থ বোঝা যায় না। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের এই শেষ পরিণতির ইতিহাস রচনা এখনও সম্ভব নহে, রচিত হইলে তাহাতে বস্তু অপেক্ষা কল্পনাই বিশেষরূপে প্রকাশ পাইবে।

কিন্তু সে যুগে সহজযানের অনেক গ্রন্থই তিব্বতীতে অনূদিত হইয়াছিল; অনেক সময়ে মূলের দুর্ব্বোধ্য অংশ তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে বোঝা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি, অদ্বয়বজ্রসংগ্রহের অনেকগুলি ভুল তিব্বতীর সাহায্যে সংশোধন করা যাইতে পারে—এটি আমরা দেখিয়াছি। বৌদ্ধগান ও দোহার অন্তর্গত কৃষ্ণবজ্রাচার্য্যপাদের ও সরহপাদের অপভ্রংশ ভাষার দোহাকোষগ্রন্থ দুইটির তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে শ্রীযুক্ত শহিদউল্লাহ্ সাহেব পাঠের অনেক সংশোধন ও অর্থনির্ণয় করিতে পারিয়াছেন। অতি দুর্ব্বোধ্য যে ডাকার্ণব, তিব্বতী অনুবাদের সহিত মিলাইয়া তাহারও কিছু কিছু অর্থগ্রহণ করা যাইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় যে লাহোরে নিখিল ভারতীয় ভারততত্ত্ববিদ্‌গণের সম্মেলনীতে সভাপতিরূপে বলিয়াছেন, তিব্বতী অনুবাদ অত্যন্ত আক্ষরিক বলিয়া, তাহা বিশেষ কাজে আসেনা, এ কথা সত্য নহে; বরং এই গুণেই অনেক স্থলে অনুবাদ বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

মোটের উপর তিব্বতী ভাষার সহায়তা আমাদের লইতেই হইবে এবং সংস্কৃত ও অন্যান্য অপভ্রংশ ভাষার মূলগ্রন্থের অভাবে তাহাদের তিব্বতী অনুবাদগুলির সহায়তা লইয়াই তবে সহজযান, বজ্রযানের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে; কাজটা সহজ নয় সত্য, কিন্তু উপায় নাই। বিষয়টা যে তিব্বতী অনুবাদের ভিতর দিয়া কি রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উদাহরণ স্বরূপ এখানে দুইটি তিব্বতী গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ আমরা দিব।

তেঙ্গুরের "তন্ত্রবৃত্তি" (র্গ্যুদ) অংশে অনেকগুলি গীতিকা পাওয়া যায়, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। (Cordier-এর Catalogue du Fonds Tibetain, Vol II. পৃ ২৩০ দ্রষ্টব্য)। ইহাদের মধ্যে দুইটি গ্রন্থের নাম "সহজগীতি" ও "লুইপাদগীতি", "সহজগীতি"র লেখক শান্তিদেব; "লুইপাদগীতি"র লেখকের নাম গ্রন্থমধ্যে বা তেঙ্গুরের শেষে যে গ্রন্থতালিকা আছে, তাহার মধ্যে কোন

উল্লেখ নাই; তবে লুইপাদই যে গীতিকার, তাহা ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত নহে; লেখকের নামে গীতের পরিচয়ের উদাহরণ দুর্ল্লভ নহে। সহজগীতিকার শান্তিদেব যে কে ছিলেন, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে কিছু বলা যায় না। লুইপাদ সম্বন্ধে কিন্তু নানা আলোচনা হইয়া গিয়াছে, নানা লোকে তাঁহার সময়ের ভিন্ন ভিন্ন হিসাব দিয়াছেন। লুইপাদ আদি সিদ্ধাচার্য্য। তাঁহার সময় সম্বন্ধে আধুনিকতম মত শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাধনমালার ২য় খণ্ডের ভূমিকায় পাওয়া গেল; তিনি যে কেমন করিয়া লুইপাদের সময় ৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়াছেন, তাহা ঠিক বোঝা গেল না এবং ইহার স্বপক্ষে তিনি যেটুকু যুক্তি দিয়াছেন, তাহার সারবত্তাও ধরা গেল না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই।

আদি সিদ্ধাচার্য্যের রচিত গ্রন্থ বলিয়া এই গ্রন্থটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু সে মূল্য যে কতখানি, অনুবাদ পাঠ করিলে বোঝা যাইবে। শাস্ত্রী মহাশয় ইহাকে "বাঙ্গালা সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলী" বলিয়াছেন। চারিটি পদের সমষ্টিকে গ্রন্থ বলা চলে কিনা জানি না, পদাবলী বলিলেও বোধ করি, বেশী বলা হয়।

দুইখানি গ্রন্থই "গীতি"; অর্থাৎ এগুলি গানের জন্য রচিত হইয়াছিল। প্রথম গ্রন্থ "সহজগীতির" মধ্যে যে কাব্যরস আছে, তাহা অনুবাদের মধ্যেও সুস্পষ্ট; কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থটি কতকটা স্তোত্রধরণের; দেবতার গুণবর্ণনাচ্ছলে তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা হইয়াছে। দুইখানিই সহজযানের পুথি।

আমরা দুইটি গ্রন্থের মূল তিব্বতী পাঠের জন্য বিশ্বভারতী-গ্রন্থাগারে রক্ষিত তেঙ্গুরের নারথাঙ সংস্করণ ব্যবহার করিয়াছি; লুইপাদের গ্রন্থটির পাঠের সহিত আমাদের ও এশিয়াটিক সোসাইটির তেঙ্গুরের পাঠও মিলান হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রভেদ পাওয়া যায় নাই। উভয় গ্রন্থেরই বিবরণ Cordier সাহেবের Catalogue-এ ২৩০ ও ২৩৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

তিব্বতী মূল।

গ্য' গর' স্কদ' দু।

স' হ' জ' গী' তি॥

বোদ' স্কদ' দু।

ল্হন' চিগ' স্ক্যেস' প'ই' গ্লু॥

ব্র' ম' দম' প' ল' ফ্যগ' 'ছল' লো॥

১

স্তোঙ' প'ই' নগস' লস' মে' তোগ' রব' র্গ্যাস' প।
মে' তোগ' গচিগ' ল' খ' দোগ' স্ন' ছ়োগস' তে।
দপে' মেদ' মে' তোগ' স্ক্যেস' ন' ফ্যোগস' লস' র্গ্যাল।
রিন' থঙ' মেদ' প'ই' মে' তোগ' লোঙ' শিঙ' দঙ॥

২

দে' ল' র্চ় ব' মেদ' চিঙ' য়ল' 'দব' মেদ।
গ্রোগস' দগ' সের' খ' সু়ঙ' পো'ই' ফ্যোগস' র্গ্যাস' ল্তোস।
দপে' মেদ ... ...

৩

গে' সর' ব্লঙস' পস' স্গ্যু' 'ফ্রুল' মথন' পো' য়িন।
র্দো' র্জে' দবঙ' ফ্যুগ' ছোস' ক্যি' দব্যিঙস' ল' মছোদ।
দপে' মেদ ... ...

৪

মছোগ' দঙ' দগ' 'ব্রল' র্নম' পর' বর্তগস' তে[১] স্নু়ঙস[২]।
ব্ল' ম' দম' প'ই' শব্স়' ল' গুস' পস' মছোদ।
দপে' মেদ ... ...

র্নল' 'ব্যোর' গ্যি' দবঙ' ফ্যুগ' শা' স্ত' দে' বস' মজদ়' প' র্জো়গস সো॥

---

১ পুথিতে আছে র্তে।

২ ঐ স্নুঙ।

বাংলা অনুবাদ

ভারতীয় ভাষায়

সহজগীতি।

ভোট ভাষায়

ল্‌হন' চিগ' স্ক্যেস' প'ই' গ্লু।

সদ্‌গুরুকে নমস্কার।

শূন্য বন হইতে ফুল ফুটিয়াছে ;
একটি ফুলের রং বিচিত্র।
অনুপম পুষ্প জন্মিয়া সকলের উপর জয়ী হয়।
অমূল্য পুষ্প, তুমি ওঠ॥ ১ ॥
তাহার মূল নাই, শাখাপল্লব নাই।
সঙ্গিগণ, উত্তম ছিদ্রের দিগ্বিজয় দেয়।
অনুপম পুষ্প ইত্যাদি॥ ২ ॥
কেশর লইয়া মায়াবী হয়।
বজ্রেশ্বর ধর্ম্মধাতুকে পূজা কর।
অনুপম পুষ্প ইত্যাদি॥ ৩ ॥
উত্তম ও অপ্রিয় ইহাদের বিচার করিয়া গ্রহণ কর।
সদ্‌গুরুর চরণকে ভক্তির সহিত পূজা কর।
অনুপম পুষ্প ইত্যাদি॥ ৪ ॥
যোগীশ্বর শান্তদেব-কৃত সম্পূর্ণ॥

টীকা

১—এই 'ফুল' কি 'উষ্ণীষকমল' ?

২—'উত্তম ছিদ্র' অর্থে 'শূন্য'।

৩—'কেশর' অর্থাৎ 'বিভূতি' ?

৪—প্রথম পংক্তির মূলে দগ' ব্রল ইহার প্রকৃত অর্থ 'নিরানন্দ'; এখানে শ্রেয় ও প্রেয়ের প্রভেদ করা হইয়াছে।

তিব্বতী মূল

লু স্নি প'ই গ্লু ॥

সঙস র্গ্যস ল ফ্যগ্ 'ছল লো ॥

১

সেমস' চন' ঞোন' মোঙস' গডুঙ' বস' স' স্তেঙ' বস্কোর' ব'ই' ল্হ।
দে' ল্ত' ন' ম্রঙ' বদে' ছেন' ছুঙ' ম'ই' লুস' মি' 'দোর[৩]।
ক্যে' ক্যে' দপে' মেদ' ছুঙ' ম' ল' নি' রব' তু' ছগস।
বস্কল' প' দপগ' মেদ' মি' 'ব্রল' গচো' বো'ই' 'জিগ' তের্ন' ল্হ॥

২

শিন' তু' ঙো' মছর' বডুদ' ক্যি. ছুঙ' ম' দে' মি' লেন।
গশন' লস' থ্যদ' পর' 'ফগস' প'ই'[৪] গসুগস' মছোগ' মঙ' ব'ই ল্হ।
ক্যে' ক্যে ... ...

৩

'গ্রো' ব' বর্গ্যা' ফ্রগ' মঙ' পো' নদ' ক্যি[৫]' থেবস' ল' বস্কোর।
দে' দগ' বদে' স্তের' ল্হ' নি' থমস' গসুম' মে' লোঙ' ম্রিন।
ক্যে' ক্যে ... ...

৪

মঞম' মেদ' মঞম' প'ই' বদে' গসোল' ম' তি' রো' হ' ন।
গ্যাল' ব'ই' ম্নোন' তন' মঙ' ল্দন' ক' র্শ' প' ন'ই' ল্হ।
ক্যে' ক্যে ... ...

---

৩ পুথিতে আছে 'দের

৪ পুথিতে আছে থ্যদ' 'ফগস' গসু.গস'

৫ পুথিতে আছে ক্যিস

লু ষি প'ই' ম্নু ৰ্জোগ সসো ॥

বাংলা অনুবাদ

লূইপাদ-গীতিকা।

বুদ্ধকে নমস্কার।

সত্ত্ব ক্লেশের দ্বারা তপ্ত, ভূতল মণ্ডলদেব
তাহা দেখিয়া মহাসুখজায়ার দেহ ত্যাগ করেন না।
অহো অনুপম জায়ানুরক্ত,
অপরিমেয় কল্পে(ও) অবিচ্ছিন্ন প্রভু, লোকেশ্বর! ॥ ১ ॥
অত্যদ্ভুত কামজায়া, তাহাকে তিনি গ্রহণ করেন না;
অপর (সকল) হইতে বিশেষরূপে ভিন্ন (সেই) দেব পরমরূপবান্।
অহো অনুপমজায়ানুরক্ত ইত্যাদি ॥ ২ ॥
জগৎ বহুশতসহস্র ব্যাধিপরম্পরা দ্বারা পরিবৃত;
তাহাদের (=জীবগণের) সুখদ দেব ত্রিলোকের আদর্শ।
অহো ইত্যাদি ॥ ৩ ॥
মতিরোহণ সমানভাবে (সকলের) অতুল্য সুখ প্রার্থনা করেন।
খসর্পণদেব বহুজিনগুণসম্পন্ন।
অহো ইত্যাদি। ॥ ৪ ॥

টীকা

১। প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তির মূলে আছে দে' লত' ন' অঙ—ইহার অর্থ 'তাহা দেখিয়া' করা হইয়াছে; ইহার পরিবর্ত্তে দ' লত' ন' ষ্ণঙ পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ হইবে 'এখনও'। শ্লোকের অর্থ কি জীবের দুঃখ দেখিয়াই দেবতা মহাসুখকে আশ্রয় করিয়াছেন? তাঁহার এই অনুপম জায়ানুরক্তি জগতের কল্যাণেরই জন্য।

২। এই শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'কামজায়া' ও 'মহাসুখজায়া'র প্রভেদ করা হইয়াছে। কামজায়া অত্যাশ্চর্য্য তবুও তিনি তাহাকে গ্রহণ করেন নাই।

৪। এই শ্লোকের প্রথম পংক্তির অর্থ সুস্পষ্ট নহে; মতিরোহণ কে? এইখানে কি তিব্বতী অনুলিপিতে কোন ভুল আছে? বর্ত্তমান পাঠে প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির মধ্যে কোন যোগ নাই। দ্বিতীয় পংক্তিতে ত খসর্পণ দেবের গুণবর্ণনা করা হইয়াছে। তিব্বতী মূলে আছে ক' র্‌শ' প' ন দেব; এরূপ কোন দেবতার অস্তিত্ব জানা নাই। তবে সংস্কৃত শব্দের তিব্বতী অনুলিপি অনেক সময়ে গোলমাল হইয়া যায়। মনে হয়, এই ক' র্‌শ' প' ন ও খসর্পণ দেব অভিন্ন। খসর্পণ দেবের সাধনা শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত সাধনমালার প্রথম খণ্ডে পাওয়া যাইবে (পৃ ৫৪, ৬৪)। খসর্পণ পুতি বজ্রযানের দেবতা।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

প্রবন্ধে গৃহীত তিব্বতী অক্ষরের বাংলা অনুলিপি,—

k	kh	g	ṇ	c	ch	j	ñ	t	th	d	n
ক	খ	গ	ঙ	চ	ছ	জ	ঞ	ত	থ	দ	ন
p	ph	b	m	ts	tsh	dz	w	z´	z	h	y
প	ফ	ব	ম	চ.	ছ.	জ.	ব়	শ.	স.	’	য়
r	l	ṡ	s	h	a	j	u	e	o		
র	ল	শ	স	হ	অ	ি	ু	ে	ো		

প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

(খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে)

প্রাচীন বৌদ্ধ পালি গ্রন্থাদি হইতে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্বন্ধে অনেক সংবাদ আমরা জানিতে পারি। তখন দেশে একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিল না। দেশ কতকগুলি খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের একজন করিয়া রাজা ছিলেন। এই রাজাদের এবং রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ হইত। ইহাদের মধ্যে যিনি ক্ষমতাবান্, তিনি অপরের রাজ্য অধিকার করিয়া নিজের রাজ্য বিস্তার করিতেন, এবং এইভাবেই এক একটা অপেক্ষাকৃত বড় রাজ্য গড়িয়া উঠিত। কিন্তু সেই রাজা বেশী দিন স্থায়ী হইতেন না। তাহার এক কারণ, ক্ষমতাবান্ রাজার বংশধরেরা প্রায়ই হইতেন দুর্ব্বল ও অক্ষম, সুতরাং রাজ্য রক্ষার এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা তাঁহাদের থাকিত না। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিবেশী রাজ্যগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাজ্যগুলির ধ্বংস সাধনের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট হইয়া থাকিত এবং সুযোগ পাইলেই নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিত। মহাপরিনিব্বাণসুত্তে দেখিতে পাই—মগধরাজ অজাতসত্তু (অজাতশত্রু) বেসালী (বৈশালী) রাজ্য আক্রমণের আয়োজন করিতেছেন এবং তাহা করিতে গিয়া তিনি বেসালীর প্রধান প্রধান রাজবংশের মধ্যে একটা বিবাদ ঘটাইয়া দিলেন। ইহা ছাড়া, তিনি লিচ্ছবিদের গণরাষ্ট্রকেও পরাজিত করিলেন।

খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে চারিটি প্রধান রাজ্য ছিল—মগধ, কোসল (কোশল), বচ্ছ (বৎস) এবং অবন্তী। প্রতিবেশী দুর্ব্বল রাজ্যগুলি অধিকার করিয়াই এই চারিটি রাজ্য নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

মগধের রাজধানী ছিল রাজগহ (রাজগৃহ), এবং রাজা ছিলেন নৃপতি বিম্বিসার। বিম্বিসার বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের খুব অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু তাঁহাকে বন্দী করিয়া উপবাসে রাখিয়া হত্যা করেন এবং নিজে রাজা হন (সামঞ্ঞ-ফলসুত্ত, দীঘনিকায়, ১ম ভাগ)। অজাতশত্রু বিদেহ রাজকুমারীর পুত্র ছিলেন (সামঞ্ঞফল-সুত্ত)। কোশলের রাজা মহাকোশলের পুত্র প্রসেনজিতের সঙ্গে অজাতশত্রুর এক যুদ্ধ হইয়াছিল। সে যুদ্ধের উল্লেখ অনেক পালিগ্রন্থেই আছে (লোহিচ্চসুত্ত, দীঘনিকায়, ১ম ভাগ;

ধম্মপদঅট্‌ঠকথা, ৩য় ভাগ; কোশলসংযুত্ত, সংযুত্তনিকায়, ১ম ভাগ)। প্রসেনজিতের ভগ্নী কোশল দেবী বিম্বিসারের মহিষী ছিলেন। তাঁহার বিবাহে বিম্বিসার কাশীরাজ্য যৌতুক পাইয়াছিলেন। পুত্রের হাতে বিম্বিসারের মৃত্যু হইলে, কোশল দেবী স্বামীশোকে প্রাণত্যাগ করেন; এবং অজাতশত্রুর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রসেনজিৎ উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত কাশীরাজ্য তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ইহা লইয়া দুই রাজ্যে যুদ্ধ বাধে; প্রথম অজাতশত্রুই জয়ী হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে পরাজিত হইয়া প্রসেনজিতের হাতে বন্দী হন এবং সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সন্ধির সূত্রানুসারে প্রসেনজিতের কন্যা বজিরাকে তিনি বিবাহ করেন এবং কাশীরাজ্য যৌতুক স্বরূপ ফিরিয়া পান।

একবার উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোতের সঙ্গে অজাতশত্রুর যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়; ভীত হইয়া মগধরাজ রাজধানী রাজগৃহ সুরক্ষিত করেন (গোপকমোগ্‌গল্লানসুত্ত, মজ্‌ঝিমনিকায়, ৩য় ভাগ)। কিন্তু সত্য সত্যই ইঁহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছিল কি না, এ সম্বন্ধে কোন খবর পালিগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

লিচ্ছবি-বজ্জিগণরাষ্ট্র এক সময়ে ঐশ্বর্য্যে, ক্ষমতায়, বিস্তারে মগধরাজ্যের সমকক্ষ ছিল, এবং দুই রাজ্যে খুব সম্প্রীতিও ছিল; কিন্তু বিম্বিসারের মৃত্যুর পর অজাতশত্রুর সঙ্গে এই গণ-রাষ্ট্রের যুদ্ধ হয়। লিচ্ছবিরা যুদ্ধে পরাজিত হয় বটে, কিন্তু অজাতশত্রু ইহাদের সংঘরাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিতে পারেন নাই (মহাপরিনিব্বাণসুত্ত, দীঘনিকায়, দ্বিতীয় ভাগ; পরমত্থজ্যোতিকা, খুদ্দকপাঠ, রতনসুত্ত)।

কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী, এবং রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ। তিনিও বুদ্ধ-দেবের পরমভক্ত ছিলেন। কিন্তু বোধ হয়, তিনি প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না। কোসলসংযুত্তে আছে যে, তিনি একবার এক সুবৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রসেনজিতের খুব ইচ্ছা ছিল—বিবাহসূত্রে তিনি শাক্যকুলের সঙ্গে আবদ্ধ হন; শাক্যকুল-প্রধানেরা তাঁহার ইচ্ছা পূরণের জন্য বাসবখত্তিয়া (বাসবক্ষত্রিয়া) নামে এক দাসী-কন্যাকে তাঁহার কাছে প্রেরণ করেন। এই বিবাহের ফলে বিড়ূড়ভ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; তিনি শাক্যদের এই চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইঁহাদের অনেককে হত্যা করেন।

অবন্তীরাজ্যের রাজা ছিলেন প্রদ্যোত এবং বৎসরাজ্যের রাজা ছিলেন উদয়ন (সংযুত্ত, ৪র্থ ভাগ, সড়ায়তনসংযুত্ত, গহপতিবগ্‌গ)। বৎসরাজ্যের রাজধানী ছিল কৌশম্বী এবং অবন্তির রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। অবন্তি ও কৌশম্বী রাজবংশ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিল। ধম্মপদ-অট্‌ঠকথায় (১ম ভাগ, পৃ ১৯২) রাজা উদয়ন ও রাজা প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তার বিবাহের

বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায়। সড়ায়তনসংযুত্তে (সংযুত্ত, ৪র্থ ভাগ) রাজা উদয়নের বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বনের বিস্তৃত বিবরণ আছে। প্রসিদ্ধ ভিক্ষু পিণ্ডোলের উপদেশেই তিনি এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

অঙ্গুত্তরনিকায় (১ম ভাগ, মহাবগ্‌গ, পৃ ২১৩) গ্রন্থে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ষোলটি মহাজনপদের উল্লেখ আছে—অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বজ্জি, মল্ল, চেদি, বংশ, কুরু, পঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অস্মক, অবন্তি, গান্ধার এবং কাম্বোজ। এই নামগুলি প্রকৃতপক্ষে বিশেষ বিশেষ দেশের নাম নয়, বস্তুতঃ জাতি বা জনগোষ্ঠী-বিশেষের নাম; মগধ বলিতে মগধ জাতিকেই বুঝাইত, কোন ভৌগোলিক সংস্থানকে নয়।

অঙ্গ এবং মগধরাজ্যের মধ্যসীমা ছিল চম্পা নদী। এই দুই রাজ্যের মধ্যে বিবাদ ছিল বলিয়াই মনে হয়; কারণ, এক সময়ে অঙ্গ মগধরাজ্যের প্রাধান্য স্বীকার করিত; অন্য সময়ে মগধ অঙ্গরাজ্যের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বকে মানিয়া লইয়াছে (চম্পেয়-জাতক, জাতক চতুর্থ ভাগ)।

ভোজাজানীয়-জাতক (জাতক ১ম ভাগ) হইতে জানা যায় যে, কাশীরাজ্য এক সময় খুব ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। উহা হইতে আরও জানা যায় যে, এক সময়ে সাতটি ছোট ছোট খণ্ড রাজ্য একত্র হইয়া কাশীরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু পরাজিত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। অন্য সময়ে কাশীরাজ্য মগধ, কোশল ও অঙ্গরাজ্যের উপরও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইহার আধিপত্য খর্ব্ব হইয়া এবং কাশীরাজ্য লইয়া কোশল এবং মগধরাজ্যের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয় (সোণনন্দজাতক, জাতক ৫ম ভাগ)।

মিথিলার বিদেহজাতি ও বৈশালীর লিচ্ছবিরা মিলিয়া বজ্জিগণরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ধম্মপদঅট্‌ঠকথায় (২য় ভাগ, পৃ ৩৩৬) উল্লেখ আছে যে, লিচ্ছবিদিগের সাত হাজার সাত শত সাত জন রাজা ছিলেন এবং একজনের পর একজন করিয়া রাজা হইতেন। অজাতশত্রু এক সময়ে লিচ্ছবিদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নষ্ট করিতে পারেন নাই। চুলসচ্চকসুত্তে (মজ্‌ঝিমনিকায়, ১ম ভাগ) দেখিতে পাওয়া যায় যে, বজ্জি ও মল্ল একই সংঘভুক্ত ছিল। মল্লদের দুইটি প্রতিষ্ঠান ছিল—একটি কুশীনারায় আর একটি পাবায় (মহাপরিনিব্বাণসুত্ত, দীঘনিকায়, ১ম ভাগ)।

চেদি, কুরু, পঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অশ্মক, গান্ধার এবং কাম্বোজ রাষ্ট্রের তেমন কিছু প্রাধান্য ছিল না। চুল্লকলিঙ্গ-জাতকে (জাতক ৩য় ভাগ) কলিঙ্গ-রাজের সঙ্গে অস্মক-রাজের যুদ্ধের উল্লেখ আছে। পলাশি-জাতক (জাতক ২য় ভাগ) হইতে জানা যায় যে, তক্ষশীলা-রাজের সঙ্গে কাশীরাজের যুদ্ধ হইয়াছিল।

পালিগ্রন্থে অনেক গণরাষ্ট্রের উল্লেখ আছে। মহাপরিনিব্বাণসুত্তে নিম্নলিখিত গণরাষ্ট্রগুলির নাম দেখিতে পাই, বৈশালীর লিচ্ছবিগোষ্ঠী, কপিলবস্তুর শাক্যকুল, অল্লকপ্পের বুলিগোষ্ঠী, রামগামের কোলিয়গোষ্ঠী, পাবা ও কুশীনারার মল্লগোষ্ঠী এবং পিপ্‌ফলিবনের মোরিয়গোষ্ঠী। এই গণরাষ্ট্রগুলি বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহাবশেষ লইয়া তাহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি গণরাষ্ট্র ছিল। যথা,—সুংসুমার পর্ব্বতের ভগ্‌গগোষ্ঠী, কেশপুত্তের কালামগোষ্ঠী এবং মিথিলার বিদেহগোষ্ঠী। বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থাতেই শাক্য এবং কোলিয়দের মধ্যে একবার যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল (ধম্মপদঅট্‌ঠকথা, ২য় ভাগ, পৃ ২৫৪-৫৭); কিন্তু বুদ্ধদেবের চেষ্টায় সে যুদ্ধ হয় নাই। এ বিষয়ে যাঁহারা বিশদভাবে জানিতে চাহেন, তাঁহারা আমার "Some Kṣatriya Tribes of Ancient India", "Ancient Mid-Indian Kṣatriya Tribes" এবং "Ancient Indian Tribes" পুস্তকগুলি দেখিতে পারেন। তেলপত্ত-জাতকের অংশ-বিশেষ হইতে আমরা প্রাচীন ভারতের রাজতন্ত্র-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকটা জানিতে পারি। ঐ জাতকে লিখিত আছে যে, "আমার রাজ্যে যাহারা বাস করে তাহাদের উপর আমার কোন আধিপত্য নাই; আমি তাহাদের প্রভু নই। যাহারা বিদ্রোহী, অথবা যাহারা আইন অমান্যকারী, কেবল তাহাদের উপরই আমার আধিপত্য আছে"। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, প্রজাবর্গের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোন রাজার অধিকার ছিল না। কট্‌ঠহারী-জাতকে (জাতক ১ম ভাগ) লিখিত আছে যে, রাজার প্রধানা মহিষীর জ্যেষ্ঠ পুত্রই সাধারণ কর্ত্তৃক রাজপ্রতিনিধির পদে বৃত হইতেন এবং রাজার মৃত্যুর পর তিনিই রাজা হইতেন।

শিকার রাজাদের প্রধান সখের বস্তু ছিল, কাশীর রাজা শিকারে খুব উৎসাহী ও দক্ষ ছিলেন এবং প্রজাবর্গকে লইয়া শিকারে বাহির হইতেন। নিগ্রোধমিগ-জাতক (জাতক ১ম ভাগ) এবং কুক্কুর-জাতকে দেখিতে পাই যে, এক রাজা রাজকার্য্যের পর তাঁহার উদ্যানে আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিতেন।

অভিন্ন-জাতক হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে ঢাকের সাহায্যে রাজাজ্ঞা ঘোষণা করা হইত। দুই শ্রেণীর কর্ম্মচারী রাজাকে রাজকার্য্যে সাহায্য করিতেন। প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন, অমচ্চ (মহিলামুখ-জাতক), বিনিচ্ছয় মহামচ্চ (কুটবানিজ-জাতক), সেনাপতি (ধম্মধ্বজ-জাতক), নগররক্ষক (ছবক-জাতক), চোরঘাতক (খন্তিবাদি-জাতক), গাম অবুত্তক (ধম্মপদঅট্‌ঠকথা, ১ম ভাগ, পৃ ১৮০), অমচ্চ-ভটবলথ-দোবারিক অনিকট্‌ঠ পারিসজ্জ (মিলিন্দপঞ্‌হ, পৃ ২৪০) সৈন্য, দূত, দৌবারিক এবং পারিষদ্‌বর্গ এবং পুরোহিত (মিলিন্দপঞ্‌হ, পৃ ২৪১)। দ্বিতীয়

শ্রেণীতে ছিলেন গুপ্তচরগণ। কোসলসংযুত্তে (সংযুত্তনিকায়, ১ম ভাগ) উল্লেখ আছে যে, রাজা প্রসেনজিৎ গুপ্তচর সংবাদবাহীদের সাহায্যে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন।

প্রাচীন ভারতে বিচারগৃহ (বিনিচ্ছয়ট্‌ঠান) রাজপ্রাসাদেই অবস্থিত ছিল। সেইখানেই রাজা মন্ত্রিবর্গের সাহায্যে বিচারকার্য্য পরিচালনা করিতেন (রাজোবাদ জাতক); অবিচার যে হইত না এমন নহে, অনেক অবিচারের উল্লেখও পাওয়া যায়। কিংছন্দ-জাতকে এক পুরোহিতের উৎকোচ গ্রহণ করিয়া মিথ্যাসাক্ষ্য দিবার কথার উল্লেখ আছে। কোসল-সংযুত্ত হইতে জানিতে পারা যায়, বিচার ইত্যাদি কার্য্যে নানা প্রকার মিথ্যা ও উৎকোচের প্রচলন দেখিয়া কোশলরাজ প্রসেনজিৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কোন এক বিশেষ রাজকর্ম্মচারীর উপর বিচারগৃহের ভার অর্পণ করেন।

গণতন্ত্র-রাজকার্য্য পরিচালনের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও পালি গ্রন্থাদি হইতে জানিতে পারা যায়। *অম্বট্‌ঠসুত্তে শাক্যদের পরিষদ্‌গৃহের উল্লেখ আছে। এই পরিষদ্‌গৃহে আবালবৃদ্ধ শাক্য-প্রধানেরা সমবেত হইতেন। মহাপরিনিব্বাণসুত্তে মল্লদের পরিষদ্‌গৃহেরও উল্লেখ আছে।* ভিক্ষু আনন্দ যখন বুদ্ধদেবের মহাপরিনিব্বাণের খবর পাইয়া মল্লদেশে যান, তখন মল্লপ্রধানেরা তাঁহাদের পরিষদ্‌গৃহে সেই বিষয়েরই আলোচনা করিতে সমবেত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, এই পরিষদ্‌গৃহ বা সন্থাগারেই অধিকসংখ্যক লোকের মতানুযায়ী রাজকার্য্য পরিচালিত হইত।

কপিলবস্তুর শাক্যগোষ্ঠী ও অল্লকপ্পের বুলিগোষ্ঠী গণতন্ত্ররাষ্ট্র ছিল, কিন্তু শুদ্ধোদন শাক্যদের 'রাজা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন এবং ধম্মপদঅট্‌ঠকথায় (পৃ ১৬১) বুলিদেরও এক 'রাজার' উল্লেখ আছে। এই উল্লেখ একটু আশ্চর্য্যজনক, কারণ গণতন্ত্ররাষ্ট্র-ব্যবস্থায় 'রাজার' কোন স্থান নাই। সেই জন্য মনে হয় যে, গণপ্রধানদের মধ্য হইতে একজনকে সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া নির্ব্বাচন করা হইত এবং তাঁহাকেই 'রাজা' বলা হইত।

কোলীয় গণরাষ্ট্রের নিযুক্ত এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিল, যাহারা লোকের উপর অত্যন্ত অত্যাচার ও অবিচার করিত (সংযুত্তনিকায়, ৪র্থ ভাগ, পৃ ৩৪১)। মল্লদেরও এই শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিল (দীঘনিকায়, ২য় ভাগ, পৃ ১৫৯, ১৩১)।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

পঞ্জাব ও কাবুলের শাহিয় রাজবংশ

গজনীর অধিপতি আমির সবুক্তিগীনের সহিত যে হিন্দু রাজা জয়পালের যুদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহার সম্বন্ধে ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার প্রাচীন ভারত ইতিহাসে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন,—

"সিন্ধু প্রদেশের উত্তরস্থিত পঞ্জাবের অধিকাংশ ও সিন্ধুনদের উপত্যকার ঊর্দ্ধভাগ জয়পালের বিশাল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং ইহা পশ্চিমের গিরিমালা হইতে পূর্ব্বে হকরা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল ভাটিণ্ডা।"

তৎপর পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"ইলিয়ট ভাটিণ্ডার রাজবংশের সহিত ওহিন্দ্ অথবা কাবুলের শাহিয় রাজবংশ মিলাইয়া একটি অবোধ্য কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণও এই ভ্রান্তিমূলক তথ্যই গ্রহণ করিয়াছেন।"

অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন—"কণিষ্কের বংশধর তুর্কী শাহিয় রাজগণ ৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাবুলে রাজত্ব করেন। উক্ত বর্ষে আরব-সেনাপতি ইয়াকুব-ই-লাইস্ কাবুল অধিকার করিলে তাঁহারা সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী ওহিন্দে রাজধানী স্থাপিত করেন। ব্রাহ্মণ লল্লিয় তুর্কীরাজকে পরাভূত করিয়া হিন্দু শাহিয় নামে পরিচিত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১০২১ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণ এই রাজবংশের ধ্বংস করেন।" [১]

---

[১] "In those days a large kingdom comprising the upper valley of the Indus and most of the Panjab to the north of Sindh, extending westward to the mountains and eastward to the Hakra river, was governed by a Raja named Jaipal, whose capital was at Bathindah (Bhatinda), a town situated to the SSE of Lahore and westward from Patiala" (p. 382).

"Elliot mixes up the dynasty of Bathindah with that of the Shahiyas of Ohind, commonly called of Kabul and so renders the whole story unintelligible" (p. 383 fn. 1).

"During his reign the last of the Turki Shahiya kings, the descendants of Kanishka, was overthrown by the Brahman Lalliya. The Turki Shahiya kings had ruled in Kabul until the capture of that city by the Arab general Yākub-i-Lāis in A. D. 870" (A. H. 250).

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ কাবুল অথবা ওহিন্দের শাহিয় রাজ্য এবং জয়পালের ভাটিণ্ডা রাজ্য এই দুইটিকে পৃথক্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে এই মতটি ভ্রান্ত এবং সবুক্তিগীনের প্রতিদ্বন্দ্বী জয়পালই শাহিয় বংশের রাজা। এ সম্বন্ধে প্রমাণগুলি এতই সুস্পষ্ট যে, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ ও তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার গ্রন্থের সম্পাদক এডওয়ার্ডস্ যে এই ভ্রান্তিমূলক তথ্য কিরূপে এতদিন পোষণ করিয়াছিলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

হিন্দু শাহিয় বংশের উৎপত্তি ও ধ্বংসের ইতিহাস আলবেরুণীর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আলবেরুণী প্রথমে বর্হতকীন নামক একজন তুরুষ্ক কর্তৃক কাবুলে রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা এবং উক্ত বংশের ৬০ পুরুষ পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপর এই বংশের কনিক অথবা কণিষ্কের কাহিনী বর্ণনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"তাঁহার বংশের শেষ রাজার নাম 'লগতুর-মান'। কল্লর নামে তাঁহার এক মন্ত্রী ছিল। কল্লর গুপ্তধন পাইয়া সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন। সুতরাং লগতুরমানের অত্যাচারে প্রপীড়িত প্রজাগণ তাঁহার নিকট অভিযোগ করিলে তিনি উক্ত রাজার চরিত্র সংশোধনের জন্য তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখেন। কিন্তু একবার রাজত্বের আস্বাদ পাইয়া তিনি অর্থের সাহায্যে অবিলম্বে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার পরে ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ জাতীয় সামন্দ (সামন্ত), কমলু, ভীম, জয়পাল, আনন্দপাল ও তরোজনপাল (ত্রিলোচনপাল) রাজত্ব করেন। তরোজনপাল ৪১২ হিজরী (১০২১ খ্রীঃ) এবং তাঁহার পুত্র ভীমপাল পাঁচ বৎসর পরে (১০২৬ খ্রীঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

"এই হিন্দু শাহিয় বংশের এখন আর কোন চিহ্নই নাই। এই বংশের রাজগণ মহৎ ও উদার ছিলেন এবং সর্ব্বদা সৎকার্য্যে রত থাকিতেন। আনন্দপাল তাঁহার পরম শত্রু মামুদের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নিম্নলিখিত অংশটি বিশেষ প্রশংসনীয়। "শুনিয়াছি তুর্কীরা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে এবং খোরাসানে অগ্রসর হইতেছে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি ৫০০০ অশ্বারোহী ১০,০০০ পদাতিক ও এক শত হস্তী লইয়া স্বয়ং আপনার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইব। অথবা উহার দ্বিগুণ সৈন্যবল সহ আমার পুত্রকে পাঠাইব। আমি আপনার দয়া বা কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করিবার জন্য এই প্রস্তাব করিতেছি না। আপনি আমাকে পরাজিত করিয়াছেন, সুতরাং আর কেহ আপনাকে পরাজয় করে আমি এরূপ ইচ্ছা করি না।"

"উক্ত রাজার পুত্র মুসলমানদের হস্তে বন্দী হওয়ার পর হইতে তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে

After that date the capital was shifted to Ohind on the Indus. The dynasty founded by Lalliya, known as that of the Hindu Shahiyas, lasted until A. D. 1021, when it was extirpated by the Muhammadans (p. 373-74).

বিষম ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিতেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র তরোজনপাল (ত্রিলোচনপাল) পিতার ঠিক বিপরীত ছিলেন"।[২]

আলবেরুণীর এই আখ্যান পাঠ করিলে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে, সবুক্তিগীন ও মামুদের প্রতিদ্বন্দ্বী জয়পাল, আনন্দপাল প্রভৃতি হিন্দু শাহিয় বংশের রাজা ছিলেন। আলবেরুণী উক্ত রাজগণের সমসাময়িক লোক এবং ভারতবর্ষে বহুদিন অবস্থান করায়, তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার যথেষ্ট সুযোগও তাঁহার ছিল। তাঁহার সময়েই এই রাজবংশের ধ্বংস হয় এবং ইঁহার সম্বন্ধে তাঁহার মনে বেশ উচ্চ ধারণাই ছিল। সুতরাং আলবেরুণীর উক্তি প্রামাণিক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দু শাহিয় বংশের উৎপত্তি ও প্রথম তিনজন রাজার সম্বন্ধে আলবেরুণী যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে হয়ত সন্দেহ করা যাইতে পারে, কারণ, তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা নহে; কিন্তু জয়পাল ও পরবর্ত্তী রাজগণ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি অবিশ্বাস করা যায় না।

আলবেরুণী শাহিয় বংশের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, অন্য প্রমাণদ্বারা তাহা কি পরিমাণ সমর্থিত হয়, অতঃপর তাহারই আলোচনা করিব। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন যে, যে তুরুষ্ক বংশে কণিষ্কের জন্ম, তাহা ৬০ পুরুষ রাজত্ব করার পরে ব্রাহ্মণ কল্লর হিন্দু শাহিয় বংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই কল্লর ও তাঁহার পরবর্ত্তী তিনজন রাজা রাজত্ব করিবার পর জয়পাল রাজা হন। জয়পাল সবুক্তিগীনের সমসাময়িক রাজা; সুতরাং দশম শতাব্দীর শেষ পাদ তাঁহার রাজ্যকাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চারিজন রাজার মোট রাজত্ব-কাল পঁচাত্তর হইতে একশত বৎসর কাল ধরিলে, কল্লর দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে অথবা নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। সুতরাং আলবেরুণীর মতে কণিষ্কের সময় হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত তুরুষ্ক শাহি বংশ এবং তৎপর হিন্দু শাহিয় বংশ আফগানিস্থানে রাজত্ব করেন।

কণিষ্ক, বাসিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব এই চারিজন রাজার রাজত্বের পর বিশাল কুষাণ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হয়। এই চারিজন রাজার রাজত্বকাল মোটামুটি একশত বৎসর ধরা যাইতে পারে। কণিষ্কের রাজ্যারম্ভকাল এখনও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই। ইহা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগ অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধরা যাইতে পারে। সুতরাং দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ অথবা তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে কুষাণ সাম্রাজ্যের অবসান হয়। ইহার পরও যে কুষাণ বংশীয় রাজগণ পঞ্জাবে ও আফগানিস্থানে রাজত্ব করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কারণ, এই সমুদয় স্থানে কুষাণ-রাজ কণিষ্ক ও বাসুদেবের নামাঙ্কিত এবং উক্তরাজগণের মুদ্রার গ্রীক্ লেখের অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ্য অনুকরণ সংযুক্ত স্বর্ণ ও তাম্র মুদ্রা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। এই সমুদয় মুদ্রা ও পারস্যের 'শাসান

২ Sachau—Alberuni, II, pp. 10-14.

বংশীয় রাজগণের সহিত কুষাণ রাজগণের বৈবাহিক ও অন্যান্য সম্বন্ধ হইতে প্রমাণিত হয় যে, কুষাণ-বংশীয় রাজগণ এই অঞ্চলে বহুদিন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতি রক্ষার্থ কণিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতির নাম ব্যবহার করিতেন। সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার বিজয়স্তম্ভ-লিপিতে যে দেবপুত্র শাহি-শাহানুশাহির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই বংশীয় রাজগণকে সূচিত করিতেছে; সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বকালের রাজনামের ন্যায় রাজ-উপাধিসমূহও ব্যবহার করিতেন, দেখা যায়।

কুষাণবংশ তুরস্ক ইউ-চি জাতির অন্যতম শাখা। চীনদেশীয় গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ইউ-চি জাতির নায়ক কি-তো-লো হিন্দুকুশের উত্তরে ইপ্থালাইট্ হূণগণের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া হিন্দুকুশ পর্ব্বত পার হইয়া আসিয়া গান্ধারে অর্থাৎ কাবুল নদীর উপত্যকা ও পশ্চিম পঞ্জাব জুড়িয়া একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 'কিদার' নামাঙ্কিত অনেকগুলি মুদ্রা এই অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। এই কিদার ও চীনদেশীয় গ্রন্থোক্ত কি-তো-লো সম্ভবতঃ অভিন্ন। কিদার যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা কিদার-কুষাণ অথবা 'ক্ষুদ্র ইউ-চি' নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ ৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধারে এই নূতন কুষাণ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুমিত হয় যে, তৎকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোল্লিখিত, সম্ভবতঃ কণিষ্কের বংশজাত, কুষাণগণই এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, এবং তাঁহাদিগকে পরাভূত করিয়াই এই নূতন কিদার-কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

কিদার-কুষাণগণ অধিককাল পর্য্যন্ত নিরুদ্বেগে গান্ধারে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। আনুমানিক ৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইপ্থালাইট হূণগণ গান্ধার অধিকার করে—তখন কিদার-কুষাণগণ চিত্রল, গিলগিট কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুতরাং ৪২৫ হইতে ৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দ এই ৫০ বৎসর কাল কিদার-কুষাণগণ গান্ধারে রাজত্ব করেন। কিদার-কুষাণ-শাহি এই উপাধিভূষিত ও কিদার নামাঙ্কিত বহু স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য স্বর্ণমুদ্রায় শ্রী শিল, শ্রী কৃতবীর্য্য, শ্রী বিশ্ব, শ্রী কুশল এবং শ্রী প্রকাশ প্রভৃতি রাজার নাম এবং রাজমূর্ত্তির বাহুর নিম্নে 'কিদার' এই শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমুদয় রাজা কিদারের বংশধর এইরূপ অনুমান করাই সঙ্গত।

কিদার-কুষাণগণ যে কিছুকাল কাশ্মীর অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রচারিত মুদ্রাই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ। তাহার পর কাশ্মীর হূণগণের অধিকারভুক্ত হয়। এই কাশ্মীর দেশীয় হূণগণ কিদার-কুষাণগণের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা প্রচারিত করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরের পরবর্ত্তী কালের নাগ অথবা কর্কোটক বংশের রাজগণের মুদ্রাও কিদার-কুষাণগণের মুদ্রার স্পষ্ট অনুকৃতি এবং ইহাতে 'কিদার' এই নামটি লিখিত আছে।

৫২০ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশীয় পরিব্রাজক সুঙ্গ-ইয়ুন গান্ধার রাজ্য পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,—"ইয়েথাগণ এই রাজ্য ধ্বংস করিয়া 'লয়ে-লি'কে ইহার রাজা করিয়াছিল। তাহার পর দুই পুরুষ

অতিবাহিত হইয়াছে।" ইয়েথা অর্থে ইপ্‌থালাইট হূণগণকেই বুঝিতে হইবে; সুতরাং কিদার-কুষাণগণের পরাজয়ের পরে আনুমানিক ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে হূণ-নায়ক লয়ে-লি গান্ধারের অধিপতি হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত হূণরাজ তোরমাণ ও মিহিরকুল সম্ভবতঃ এই বংশেরই রাজা।

আনুমানিক ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে যশোধর্ম্মন কর্ত্তৃক মিহিরকুলের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই হূণগণের শক্তি খর্ব্ব হয়। সম্ভবতঃ এই সময়ই কিদার-কুষাণগণ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠেন।

মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, কিদার-কুষাণ ও হূণগণ অতঃপর পঞ্জাব ও আফগানিস্থানে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজত্ব করিতে থাকে। তাহাদের মুদ্রা দেখিতে প্রায় একই রকমের এবং উভয় জাতীয় রাজারাই মুদ্রায় 'শাহি' উপাধি ব্যবহার করিতেন।

কানিংহাম বলেন যে, চিত্রলের পার্ব্বত্য নায়কগণ এখনও 'শাহ কিতোর' এই উপাধি ধারণ করে এবং কানিংহামের মতে এই 'কিতোর' কিদারেরই অপভ্রংশ। বস্তুতঃ শাহি রাজগণের আবিষ্কৃত মুদ্রা হইতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহারা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজত্ব করিতেন ও সময় সময় বিস্তৃত ও পরাক্রান্ত রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। এই অঞ্চলে শাহি উপাধিযুক্ত বহু রাজার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে,—যথা শাহি হিরণ্যকুল, শাহি জর, দেব শাহি,—কোন কোনটিতে কেবল মাত্র শ্রী শাহি উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় মুদ্রায়ই ভারতীয় অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং কতকগুলিতে কুষাণগণের মুদ্রার অনুকরণে সিংহাসনে উপবিষ্টা দেবী (লক্ষ্মী) মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলির অনুরূপ কতকগুলি মুদ্রাতে ত্রিলোক, পূর্ব্বাদিত্য, নরেন্দ্র প্রভৃতি রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদিগকেও শাহিবংশীয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে; কারণ, দেখা গিয়াছে যে, একই রাজার কোন কোন মুদ্রায় শাহি উপাধি আছে, কোন কোন মুদ্রায় নাই!

কোন কোন মুদ্রার লিপি ভারতীয়, পহ্লবী ও অজ্ঞাত কোন সিথিয়ান—এই তিন প্রকার ভাষা ও অক্ষরেই লিখিত হইয়াছে। কোন কোন মুদ্রায় ত্রিশূল, বিষ্ণুমূর্ত্তি, ভারতীয় দেবী (লক্ষ্মী) মুর্ত্তি, সূর্য্যমূর্ত্তি, আবার কোনটিতে অগ্নিবেদীও উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং যে সকল রাজা ইহা প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিদেশীয় হইলেও ক্রমশঃ হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজেরও অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন—ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

শাহি তিগিন নামক এক রাজার বহুসংখ্যক মুদ্রা সিন্ধুনদের উভয় তীরে এবং কাবুল ও হিন্দুকুশের উত্তরে পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রার এক ধারে রাজার মুর্ত্তি আর এক ধারে সূর্য্যের মূর্ত্তি। রাজার উষ্ণীষের উপর ব্যাঘ্র-মস্তক ও ত্রিশূল। মুদ্রার লিপি ভারতীয় ও পহ্লবী অক্ষরে লিখিত। কানিংহাম ভারতীয় লিপির নিম্নলিখিতরূপ পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন।

"শ্রীহিতিবি চ ঐরান্ চ পরমেশ্বর শ্রী ষাহি তিগিন দেবজ" অর্থাৎ "ভারত ও পারস্যের সৌভাগ্যশালী রাজা দেবপুত্র ষাহি তিগিন।" পহ্লবী অক্ষরে লিখিত লিপিরও কানিংহাম পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। বাম পার্শ্বে "সফ্-তখিফ-তেফ" অর্থাৎ শ্রী তিগিন দেবজ। দক্ষিণ পার্শ্বে "তকান্ খোরসান্ মলকা" অর্থাৎ তাকি ও খোরাসানের অধীশ্বর। তাকি পঞ্জাবের সুপরিচিত নাম। সুতরাং ভারতীয় লিপির 'ভারত ও পারস্য' আর পহ্লবী লিপির 'পঞ্জাব ও খোরাসান' একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

শাহি তিগিনের মুদ্রালিপি ও মুদ্রাপ্রাপ্তির স্থান আলোচনা করিলে, সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে, তিনি পারস্যের পূর্ব্বভাগ হইতে পঞ্জাবের পশ্চিম ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন।

শাহি তিগিনের মুদ্রার অনুরূপ আরও কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, প্রভেদের মধ্যে ইহাতে রাজার মস্তক পারস্যরাজ খুসরু পরভেজের মস্তকের অনুকরণে উৎকীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ভারতীয় লিপিতে "শ্রী বাসুদেব তুকান জাউলস্তান সপর্দ্দলক্ষান" এবং পহ্লবী লিপিতে "সফ্ বসু তেফ বহ্মন মুলতান মল্কা" লিখিত আছে। 'সফ্ বসু তেফ' "শ্রী বাসুদেব, তুকান= পঞ্জাব; জাউলস্তান=জাবুলিস্থান, বর্ত্তমান গজনী ও কান্দাহার অঞ্চল। সপর্দ্দলক্ষণ শব্দ কানিংহাম সপাদলক্ষের সহিত অভিন্ন ধরিয়া রাজপুতানা অর্থ করিয়াছেন। 'বহমন্' শব্দের অর্থ অনিশ্চিত। কানিংহাম ইহাকে সিন্ধুদেশের রাজধানী 'ব্রাহ্মণাবাদ' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'সিন্ধু ও রাজপুতানা' এই দুই দেশের কথা অনিশ্চিত বিধায় ছাড়িয়া দিলেও বাসুদেব যে পঞ্জাবের মধ্যভাগ অর্থাৎ মুলতান অঞ্চল ও জাবুলিস্থানের অধীশ্বর ছিলেন, ইহা সহজেই অনুমিত হইবে।

শাহি তিগিন ও বাসুদেব উভয়েই যে সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণে তাহা এক প্রকার নিশ্চিত বলিয়াই ধরা যাইতে পারে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজনৈতিক অবস্থার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, হিন্দুকুশ পর্ব্বত হইতে দক্ষিণে বান্নু পর্য্যন্ত সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থিত বিস্তৃত ভূভাগ লইয়া এক পরাক্রান্ত রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। কপিশার ক্ষত্রিয় জাতীয় রাজা ইহার অধীশ্বর ছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে মুসলমান আক্রমণের বিবরণ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাবুলের শাহি রাজা ও জাবুলিস্থানের রাজা বহুদিন যাবৎ মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। ইহার সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত মুদ্রাতত্ত্বের সিদ্ধান্ত স্মরণ করিলে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, হিউয়েন সাং-বর্ণিত বিস্তৃত কপিশা রাজ্য ও শাহিরাজ্য অভিন্ন। কপিশার রাজা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইহার সহিত এই অনুমানের কোন বিরোধ নাই।

কারণ, আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, এই সমুদয় শাহি রাজগণ ভারতীয় ভাষা ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহারা যে ভারতীয় সমাজে মিশিয়া ক্ষত্রিয়-পদবী গ্রহণ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই।[৩]

অতঃপর আল্‌বলাধুরি-প্রণীত কিতাব-ফুতুহ্-অল-বুলদান গ্রন্থ অবলম্বনে কাবুলের শাহ উপাধিধারী রাজগণের সহিত মুসলমানগণের বিরোধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। যখন মুআবিয়া খলিফার পদে আসীন (৬৬১-৮০ খ্রীষ্টাব্দ) সেই সময় সিস্তানের শাসনকর্ত্তা আব্দর রহমান-ইবণ সমুরা কাবুল আক্রমণ করেন। বহুদিন কাবুল দুর্গ আক্রমণ করার পর, অবশেষে ইহা মুসলমানদের হস্তে আত্মসমর্পণ করে। ইহার কিছুদিন পরে কাবুলের শাহ উপাধিধারী রাজা কাবুল হইতে সমুদয় মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দেন এবং জাবুলিস্থানের রাজার সহায়তায় মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দশলক্ষ মুদ্রা দিয়া অবশেষে তাঁহারা মুসলমানগণের সহিত সন্ধি করেন। ইহার পরেই কাবুল-শাহ আবার মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে মুসলমান সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে একদল মুসলমান সৈন্য কাবুল পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। কাবুলরাজ পশ্চাতের গিরিসঙ্কটগুলি অবরোধ করায়, মুসলমান সৈন্য বহু কষ্টে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল; কিন্তু তাহাদের বহু সৈন্য বিনষ্ট হইল। এইরূপে বহু যুদ্ধবিগ্রহের পর অবশেষে খলিফা আল ম'মুনের (৮১৩-৩৩) সময় কাবুল অধিকৃত হয়।[৪]

পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, কাবুল পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সিজিস্থানের অধিপতি লাইস-পুত্র ইয়াকুব পুনরায় কাবুল অধিকার করেন।

---

৩ শাহিগণের মুদ্রা ও ঐতিহাসিক বিবরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য—

(ক) Cunningham—Later Indo-Scythians.

(খ) Specht—Etudes sur l' Asie central, pp. 12 ff.

(গ) Rapson—Indian Coins, 74-76, 103-109.

আলোচ্য মুদ্রাগুলিতে যে সমুদয় রাজার নাম পাওয়া যায়, তাঁহারা আদিতে হূণ, কুষাণ, শক অথবা পারসীক ছিলেন তৎসম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যে ধর্ম্মে, ভাষায় ও আচার-ব্যবহারে ভারতীয় হইয়া গিয়াছিলেন এবং কুষাণ রাজগণের উত্তরাধিকারী হিসাবে 'শাহি' উপাধি ব্যবহার করিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৪ উল্লিখিত বিবরণ 'Francis Clark Murgotten কর্ত্তৃক অল-বুলদান গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ হইতে গৃহীত। Raverty এই বিষয়ে যে সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে বিভিন্ন (Notes on Afghanistan, pp. 62 ff.)। Raverty কাবুলের শাহ ও জাবুলিস্থানের অধিপতি রণবিলকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু অল-বুলদানে স্পষ্টতঃ এই দুই রাজাকে পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

কিন্তু তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশের ধ্বংসের পরে কাবুল আবার স্বাধীনতা লাভ করে। পরবর্ত্তী সামানী বংশীয়ের রাজ্যকালে কাবুল মুসলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

প্রাচীন মুদ্রা, চীনদেশীয় ইতিহাস, হিউয়েন সাঙ্গের বৃত্তান্ত ও আরবদেশীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ অবলম্বনে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, শাহি উপাধিধারী বিদেশীয় রাজগণ কণিষ্কের সাম্রাজ্যের অবসানের পরেও প্রায় নবম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত আফগানিস্থানে রাজ্য করিয়াছেন। সুতরাং আলবেরুণীর কথিত ৬০ পুরুষ যাবৎ তুরুষ্ক রাজার রাজত্বের কথা একেবারে অলৌকিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। অবশ্য এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ যে, একই বংশের রাজগণ অব্যাহতভাবে রাজত্ব করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু মোটের উপর ৫০।৬০ জন বিদেশীয় শাহি উপাধিধারী রাজা যে নয়শত বৎসর আফগানিস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। তাঁহারা কণিষ্কের বংশধর না হইতে পারেন—কিন্তু 'শাহ' উপাধি ধারণ করিয়া তাঁহারা উক্ত রাজবংশের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তীকালে জনপ্রবাদ তাঁহাদিগকে কণিষ্কের বংশধর বলিয়াই গণ্য করিয়াছে।

অতঃপর আলবেরুণী-বর্ণিত হিন্দু শাহি বংশের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আলবেরুণীর মতে এই বংশের প্রথম রাজা কল্লর। তৎপর যথাক্রমে সমন্দ (সামন্ত), কমলু, ভীম, জয়পাল, আনন্দপাল, তরোজনপাল ও ভীমপাল রাজত্ব করেন। জয়পাল ও তাঁহার পরবর্ত্তী তিন জন রাজার সম্বন্ধে মুসলমান ইতিহাসে উল্লেখ আছে। প্রথম চারিজন রাজার সম্বন্ধে আলবেরুণীর উক্তি যে মোটামুটি সত্য, রাজতরঙ্গিণীতে তাহার প্রমাণ আছে।

রাজতরঙ্গিণীতে শাহিদিগের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় চতুর্থ খণ্ডের ১৪৩ শ্লোকে। এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, শাহি এবং অন্যান্য রাজগণ রাজা ললিতাদিত্যের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে তুরুষ্ক শাহি রাজগণ ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর শঙ্কর বর্ম্মণের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে কহ্লণ উদভাণ্ডপুরের অধিপতি লল্লিয় শাহির উল্লেখ করিয়াছেন। লল্লিয় শাহির বীর্য্যবত্তা ও খ্যাতির প্রশংসা করিয়া কহ্লণ লিখিয়াছেন যে, শঙ্কর বর্ম্মণ তাঁহাকে স্বীয় অধীনতায় আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। বরং লল্লিয় শঙ্কর বর্ম্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী গুর্জ্জরাধিপতি অলখানের সহায় হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য রাজাকেও আশ্রয় দিয়াছিলেন (রাজতরঙ্গিণী ৫।১৫২-৫৫)। শঙ্কর বর্ম্মণের রাজ্যকাল ৮৮৩ হইতে ৯০২ খ্রীষ্টাব্দ।

শঙ্কর বর্ম্মণের মৃত্যুর পর ৯০২ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল বর্ম্মণ রাজা হন। তাঁহার রাজ্যকালে মন্ত্রী

প্রভাকরদেব উদভাণ্ডপুরের শাহি রাজ্য জয় করেন এবং এই বিদ্রোহী শাহি রাজ্য লল্লিয়-পুত্র তোরমানকে দান করেন। প্রভাকরদেব তোরমানকে 'কমলূক' এই নূতন নাম প্রদান করেন। গোপাল বর্ম্মণ ৯০২ হইতে ৯০৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং ৯০৩ খ্রীঃ কমলূকের রাজ্যারম্ভ ধরা যাইতে পারে (রাজতরঙ্গিণী ৫।২৩২-৩৩)।

ইহার অর্দ্ধশতাব্দী পরে ক্ষেমগুপ্ত কাশ্মীরের রাজা হন। ক্ষেমগুপ্তের রাণী দিদ্দা, ভীম শাহির দৌহিত্রী ছিলেন। ক্ষেমগুপ্তের রাজ্যকালে ভীম শাহি ভীমকেশব নামে এক বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন (রাজতরঙ্গিণী ৬।১৭৬-৭৮)। ক্ষেমগুপ্তের রাজ্যকাল ৯৫০-৯৫৮ খ্রীঃ অঃ।

কহ্লণ-বর্ণিত কমলূক ও ভীম শাহি যে, আলবেরুণী-বর্ণিত হিন্দু শাহিয় বংশের রাজা কমলু ও ভীম, তাহা নিঃসন্দেহে ধরা যাইতে পারে। সুতরাং আলবেরুণী ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যে (১) কল্লর ও (২) সমন্দ রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথাক্রমে কহ্লণ বর্ণিত (১) লল্লিয় শাহি ও (২) কমলুর পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্রোহী ও প্রভাকরদেব কর্ত্তৃক পরাভূত শাহি রাজার সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আলবেরুণীর গ্রন্থের মাত্র একখানি পুঁথিতে কল্লর নাম আছে—ইহা যে আরবীয় বানান-বিভ্রাটের সুপরিচিত নিয়মানুসারে সহজেই ললিয়ের রূপান্তর হইতে পারে, অধ্যাপক সিবোল্ড তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।[৫] সুতরাং আলবেরুণীর উক্তি ও রাজতরঙ্গিণীর বর্ণনা মিলাইয়া আমরা নিম্নলিখিতরূপে হিন্দু শাহিয় বংশের প্রথম চারি জন রাজার নাম ও সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

সমসাময়িক কাশ্মীর রাজার নাম ও তারিখ		নাম	রাজ্যারম্ভকাল (আনুমানিক)
শঙ্কর বর্ম্মণ	(৮৮৩-৯০২)	১। লল্লিয় শাহি	৮৮০
গোপাল বর্ম্মণ	(৯০২-৯০৪)	২। সমন্দ (সামন্ত) শাহি	৯০০
		৩। তোরমান বনাম কমলূক শাহি	৯০৩
ক্ষেমগুপ্ত	(৯৫০-৯৫৮)	৪। ভীম শাহি	৯৪০

কহ্লণ বলিয়াছেন যে, লল্লিয় শাহি উদভাণ্ডপুরের রাজা ছিলেন (৫।১৫২-৫৫)। আবার প্রসঙ্গান্তরে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভীম শাহির রাজধানীও ছিল উদভাণ্ডপুরে (৭।১০৮১)। সুতরাং এই চারিজন রাজাই যে উদভাণ্ডপুরে রাজত্ব করিতেন, তাহা নিঃসংশয়ে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই উদভাণ্ডপুর, আলবেরুণী-কথিত গান্ধারের রাজধানী ওয়াইহিন্দ, ও হিউয়েন সাং-বর্ণিত

৫ Z. D. M. G., XLVIII, p. 700.

গান্ধারের অন্তর্গত 'উ-তো-কিয়-হন্-চ' যে একই নামের রূপান্তর এবং ইহা যে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী আটক নামক প্রসিদ্ধ নগরী হইতে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী, বর্ত্তমানকালে ওহিন্দ অথবা উন্দ নামে পরিচিত গ্রামে অবস্থিত ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।[৬] অনুমান হয় যে, কাবুল মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইলে শাহি রাজগণও উদভাণ্ডপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

উদভাণ্ডপুরের উল্লিখিত চারিজন শাহিয় রাজার সম্বন্ধে অন্যবিধ প্রমাণও কিছু কিছু পাওয়া যায়। শ্রীসামন্তদেব এবং শ্রীভীমদেব নামাঙ্কিত মুদ্রা আফগানিস্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই দুইজন রাজাকে যথাক্রমে উল্লিখিত দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাজার সহিত অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। জমি-উল-হিকায়ৎ নামক গ্রন্থে হিন্দুস্থানের রাজা কমলুর সহিত জাবুলিস্থানের মুসলমান শাসনকর্ত্তা ফর্দ্দঘানের যুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ফর্দ্দঘান, খোরাসানের শাসনকর্ত্তা অমরু বিন্ লাইস কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অমরু বিন্ লাইস ৮৭৮ হইতে ৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত খোরাসানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সুতরাং উল্লিখিত 'কমলুক শাহি' ও হিন্দুস্থানের রাজা 'কমলু' অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। উক্ত যুদ্ধের ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বিদেশীয় শাহিয় বংশের সহিত মুসলমানদের যেরূপ বিবাদ-বিসংবাদ হইত, হিন্দু শাহিয় বংশের রাজাদের আমলেও তাহা চলিয়াছিল। ভীম শাহির পরবর্ত্তী জয়পালের সম্বন্ধে অনেক তথ্য মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কারণ, জয়পাল গজনীর রাজা আমির সবুক্তিগীন ও তৎপুত্র সুলতান মামুদের সহিত অনেক যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সমুদয়ের সবিস্তার বর্ণনার এখানে প্রয়োজন নাই। কেবল মূল ঘটনাগুলির সার মর্ম্ম দিলেই শাহিয় বংশের সাধারণ ইতিহাস বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।[৭]

সবুক্তিগীন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিলেন এবং জয়পালের অধীন কয়েকটি দুর্গ ও নগর অধিকার করিলেন। ইহার প্রতিশোধ দিবার মানসে জয়পালও সসৈন্যে সবুক্তিগীনের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। জালালাবাদ ও গজনীর মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে দুই সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হইল। কয়েকদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল, কিন্তু বিশেষ কোন

---

৬ Kalhana-Rajatarangini—Eng. Transl. II, p. 337 ff.

৭ সবুক্তিগীন ও সুলতানমামুদের সহিত শাহি রাজগণের যুদ্ধের বিবরণ Elliott's History of India vol. II গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রধানতঃ এই গ্রন্থ ও Brigg's English Translation of Firishta অবলম্বনে এই বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। সমসাময়িক লেখক আল উৎবীর বিবরণই প্রামাণিক ধরিয়া লইয়া তাহাই প্রথমে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। পরবর্ত্তীকালের লেখকদের বিবরণ প্রয়োজন মত সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি মাত্র।

ফল হইল না। অবশেষে একদিন অকস্মাৎ ঝড়বৃষ্টি হইয়া জয়পালের সৈন্য বিপর্য্যস্ত হয় এবং জয়পাল সবুক্তিগীনের সহিত সন্ধি করিয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ঘটনার তারিখ সম্ভবতঃ ৩৬৯ হিঃ (৯৭৯ খ্রীঃ)।[৮]

জয়পাল নিরাপদে স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া এই সন্ধির সর্ত্ত পালন না করায় সবুক্তিগীন তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া জালালাবাদ ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ লুণ্ঠন করিলেন।

জয়পাল আর একবার সবুক্তিগীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া তিনি সবুক্তিগীনের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধেও জয়পালের পরাজয় হয়। ফেরিস্তার মতে জালালাবাদের নিকটেই এই যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধের ফলে সবুক্তিগীন সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরস্থ ভূভাগের অধিপতি হন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল উৎবি এই যুদ্ধের স্থান সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই এবং তাঁহার মতে যুদ্ধজয়ের ফলে সবুক্তিগীন বহু ধনরত্ন এবং ২০০ রণহস্তী লাভ করেন। রাজ্যবিস্তারের কোন উল্লেখ আল উৎবি করেন নাই। ফেরিস্তা আরও বলেন যে, এই যুদ্ধে দিল্লী, আজমীঢ়, কালঞ্জর, কনৌজ ও অন্যান্য দেশের হিন্দু রাজারা জয়পালের সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। আল উৎবি ইহারও কোন উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু তিনিও জয়পালের লক্ষাধিক সৈন্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং জয়পাল অন্যান্য হিন্দু রাজার সাহায্য পাইয়াছিলেন, ইহা খুবই সম্ভব। এই যুদ্ধের তারিখ সম্ভবতঃ ৩৭৮ হিঃ (৯৮৮ খ্রীঃ)[৯]।

১৩ বৎসর পরে পেশবারের নিকটে আবার জয়পালের সহিত সুলতান মামুদের যুদ্ধ হয় (৩৯২ হিঃ, ৮ মহরম; ২৭এ নভেম্বর, ১০০১ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে জয়পাল গুরুতররূপে পরাজিত হন এবং পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সহ বন্দী হন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল উৎবী লিখিয়াছেন যে, এই যুদ্ধে জয়পালের সঙ্গে ১২,০০০ অশ্বারোহী ৩০,০০০ পদাতিক ও ৩০০ রণহস্তী ছিল; আরও সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেছিল এবং ইহাদের আগমন প্রতীক্ষায় তিনি সুলতান মামুদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে বিলম্ব করিতেছিলেন। কিন্তু সুলতান মামুদ এই সাহায্যকারী সৈন্য পৌছিবার পূর্ব্বেই জয়পালকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন।

আল উৎবী আরও লিখিয়াছেন যে, জয়পালের পুত্র আনন্দপালের রাজ্য সিন্ধুনদের অপর পারে অবস্থিত ছিল। জয়পাল তাঁহাকে এই দুর্ঘটনার বিষয় জানাইয়া তাঁহাকে ৫০টি রণহস্তী পাঠাইবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া এক পত্র লেখেন। আনন্দপাল-প্রেরিত ৫০টি হস্তী পাইয়া সুলতান মামুদ জয়পালের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু জয়পাল

৮ Raverty—English Translation of Tabaqat-i-Nasiri, p. 74. fn. 2.

৯ Raverty—Eng. Transl. of Tabaqat-i-Nasiri, p. 74. fn. 3.

যাহাতে সন্ধির সর্ত্ত পালন করেন, তাহার জন্য তাঁহার এক পুত্র ও পৌত্রকে জামিন রাখেন। ফেরিস্তার মতে জয়পাল বার্ষিক কর ও মুক্তির মূল্যস্বরূপ নগদ এককালীন অনেক টাকা দিবেন এই সর্ত্তে সন্ধি হয়। আল উৎবী সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই।

আল উৎবীর উল্লিখিত বর্ণনা একটু রহস্যজড়িত বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ তাঁহার বর্ণনা অনুসারে আনন্দপাল ও তাঁহার পিতা সিন্ধুনদের দুই পারে দুই ভিন্ন রাজ্যে রাজত্ব করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাবও ছিল না। কারণ, পিতার এত বড় একটা দুর্ঘটনা হইয়া গেল অথচ আনন্দপাল কিছুই সাহায্য করিলেন না, এবং ৫০টি রণহস্তী পাঠাইবার জন্যও জয়পাল তাঁহাকে "অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া" পত্র লিখিলেন। আল উৎবী স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আনন্দপালের প্ররোচনায়ই জয়পাল, বন্দী অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া চিতানলে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া সকল অপমান ও লাঞ্ছনার হাত এড়াইলেন।

আল উৎবীর মতে পেশবারের যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর সুলতান মামুদ ওয়াইহিন্দ অধিকার করেন। ফেরিস্তা ও নিজামুদ্দিন লিখিয়াছেন যে এই স্থানের নাম 'বাটিণ্ড' এবং এই স্থানেই জয়পাল বাস করিতেন। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ 'বাটিণ্ড' পাঠ গ্রহণ করিয়া পঞ্জাবের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত বাটিণ্ডা নামক স্থানে জয়পালের রাজধানী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইলিয়ট সমুদয় প্রমাণ আলোচনা করিয়া উক্ত স্থান যে প্রকৃতপক্ষে ওয়াইহিন্দ (বর্ত্তমান ওহিন্দ) তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু র‍্যাভের্টি এই মত অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ব্বপ্রচলিত 'বাঠিণ্ড' পাঠই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু কয়েকটি বিষয় আলোচনা করিলে ওয়াইহিন্দ পাঠই যে প্রকৃত, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না।

প্রথমতঃ পেশবার হইতে বাঠিণ্ডা বহুদূরে; পঞ্জাবের অধিকাংশ জয় করিতে না পারিলে বাঠিণ্ডা পৌঁছান যায় না। অথচ ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে, মামুদ পেশবার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিটুণ্ডা (বাঠিণ্ডা) অবরোধ ও দখল করিলেন। ওহিন্দ পেশবারের সন্নিকটবর্ত্তী; সুতরাং জয়পালকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া মামুদ অনতিদূরবর্ত্তী তাঁহার রাজধানী ওহিন্দ আক্রমণ করিবেন—ইহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয়তঃ আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, রাজতরঙ্গিণী মতে উদভাণ্ডপুর অথবা ওহিন্দেই শাহিয় রাজগণের রাজধানী ছিল। ফেরিস্তা ও নিজামুদ্দিন প্রভৃতি লেখকও মামুদের অধিকৃত স্থানকে জয়পালের রাজধানী বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন; সুতরাং এই স্থান ওয়াইহিন্দ (ওহিন্দ) ধরিলেই উভয় মতের সামঞ্জস্য হয়।

তৃতীয়তঃ সর্ব্বপ্রাচীন ও মামুদের সমসাময়িক লেখক আল উৎবী এই স্থানের নাম লিখিয়াছেন

ওয়াইহিন্দ এবং জয়পাল ও আনন্দপালের সম্বন্ধে তাঁহার যে বর্ণনা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, তাঁহার মতে জয়পাল সিন্ধুনদের পশ্চিমে ও আনন্দপাল সিন্ধুনদের পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং জয়পালের রাজধানী লাহোরের দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থিত বাঠিণ্ডা হইতে পারে না। বাঠিণ্ডার সমর্থনকল্পে র‍্যাভের্টি যে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তারিখ-ই-মিরাৎ-ই-জহান-নুমা নামক যে গ্রন্থের তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আলোচ্য স্থানের নাম বাহিন্দ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বাহিন্দ, বাঠিণ্ডা অপেক্ষা ওয়াইহিন্দেরই রূপান্তর বলিয়া গ্রহণ করা অধিকতর সঙ্গত। তারপর তিনি একজন হিন্দু রচিত জম্মুর রাজবংশের ইতিহাসে বাঠিণ্ডা জয়পালের রাজধানী এইরূপ উল্লেখ দেখিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থ খুব সম্ভবতঃ আধুনিক। সুতরাং রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত উদভাণ্ডপুর শাহিবংশের রাজধানী ছিল—ইহা অগ্রাহ্য করিয়া এই আধুনিক গ্রন্থের প্রমাণ গ্রহণ করা যায় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাঠিণ্ডা জয়পালের রাজধানী ছিল—এই মতটি একটি পরবর্ত্তীকালের ভ্রান্ত পাঠের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার সপক্ষে কোনও যুক্তি নাই। অথচ সমসাময়িক লেখক আল উৎবী ও প্রাচীন গ্রন্থ রাজতরঙ্গিণী এ উভয়ের মতেই জয়পালের রাজধানী উদভাণ্ডপুর অথবা ওহিন্দ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে ভিনসেণ্ট স্মিথের যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, অতঃপর তাহার অসারতা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। তথাকথিত ভাটিণ্ডা ও ওহিন্দের রাজবংশ বস্তুতঃ দুই নহে, এক ও অভিন্ন। স্মিথ ও তাঁহার অনুসরণকারী ঐতিহাসিকগণ এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কল্পনা করিয়া বিষম ভুল করিয়াছেন।

জয়পালের পর তাঁহার পুত্র আনন্দপাল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন ৩৯৬ হিঃ (১০০৬ খ্রীঃ)। সুলতান মামুদ মুলতানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার কালে আনন্দপালের নিকট তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া সৈন্য লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু আনন্দপাল ইহাতে সম্মত না হইয়া সসৈন্যে মামুদকে বাধা প্রদান করেন। আনন্দপাল পরাভূত হন। মামুদ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহার রাজ্য ছারখার করিতে করিতে প্রায় কাশ্মীরের সীমান্তে আসিয়া উপনীত হন। তিন বৎসর পরে সুলতান মামুদ পুনরায় আনন্দপালের রাজ্য আক্রমণ করেন। আনন্দপালের পুত্র ব্রাহ্মণপাল সিন্ধুনদের পারে তাঁহার গতিরোধ করেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে। হিন্দু সৈন্যই জয়লাভ করিবার উপক্রম করিয়াছিল; কিন্তু অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে অতর্কিত আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া পলায়ন করিল। মামুদ জয়লাভ করিয়া ভীমনগর অথবা নগরকোট দুর্গ অধিকার করিলেন। ফেরিস্তা ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ এই যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ইহার কিছুদিন পরেই আনন্দপাল সুলতান মামুদের সহিত সন্ধি করিলেন। আনন্দপাল বার্ষিক করস্বরূপ মূল্যবান্ দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ ৫০টি হস্তী ও সুলতানের অধীনে কার্য্য করিবার জন্য দুই হাজার সৈন্য পাঠাইতে স্বীকৃত হইলে মামুদ আর তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবেন না—এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন।

কিন্তু এই সন্ধি বেশী দিন স্থায়ী হইল না। ৪০৪ হিঃ (১০১৩।১৪ খ্রীঃ) মামুদ পুনরায় তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। নার্দ্দিন নামক স্থানে তিনি হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন।

আল উৎবীর মতে এই প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম 'নিদর ভীম' অর্থাৎ 'নির্ভীক ভীম', নিজামউদ্দিনের মতে 'পুরুজয়পাল' অথবা 'তরুজয়পাল'। আলবেরুণীর মতে আনন্দপালের উত্তরাধিকারীর নাম তরোজনপাল এবং ইনি ১০২১ খ্রীঃ পরলোকে গমন করেন। সুতরাং নিজামউদ্দিনের গ্রন্থের 'তরুজয়পাল' পাঠ ধরিয়া ইঁহাকে তরোজনপালের সহিত অভিন্ন গ্রহণ করাই সঙ্গত। আলবেরুণীর মতে তরোজনপাল অথবা ত্রিলোচনপালের উত্তরাধিকারীর নাম ভীমপাল। আল উৎবীও অন্যত্র লিখিয়াছেন যে, পুরুজয়পালের পুত্র ভীমপাল (৪৭ খ্রীঃ)। ইহাও 'পুরুজয়পাল' ও 'ত্রিলোচনপালে'র অভিন্নতা প্রমাণিত করিতেছে।[১০]

সুতরাং অনুমান করিতে হইবে যে, ১০১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন সময়ে আনন্দপালের মৃত্যু হয় এবং তৎপুত্র তরোজনপাল অথবা ত্রিলোচনপাল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন।

ফেরিস্তার মতে সুলতান মামুদের আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই আনন্দপালের মৃত্যু হয়; কিন্তু তিনি আনন্দপালের পরবর্ত্তী রাজার নাম 'জয়পাল' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'পুরুজয়পাল' এই বিকৃত পাঠ হইতেই এই দ্বিতীয় 'জয়পালের' সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ এক্ষেত্রে আলবেরুণীর মতই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত। ত্রিলোচনপালের পুত্র ভীমপাল সম্ভবতঃ সুলতান মামুদের

---

১০ এ বিষয়ে আরও একটি প্রমাণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আল উৎবী লিখিয়াছেন যে, পুরুজয়পালের পুত্রের নাম ভীমপাল (Elliot II, p. 47) এবং তাহার কিছু পরেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভীমপালের পিতৃব্য ও অন্যান্য আত্মীয় মুসলমানদের হস্তে বন্দী হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ওদিকে আলবেরুণীও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ত্রিলোচনপালের ভ্রাতা (অতএব ভীমপালের পিতৃব্য) মুসলমানের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। সুতরাং আল উৎবীর কথিত ভীমপাল ও আলবেরুণী-বর্ণিত ভীমপাল একই ব্যক্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে ভীমপালের পিতা ত্রিলোচনপাল (আলবেরুণী মতে) ও পুরুজয়পাল (আল উৎবীর মতে) অভিন্ন বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

বিরুদ্ধে যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন। আল উৎবী-কথিত নিদর ভীম ও আলবেরুণী কর্ত্তৃক উল্লিখিত ত্রিলোচনপালের পুত্র ভীমপাল সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি।

কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সংগ্রামরাজের রাজত্বকালে (১০০৩-২৮ খ্রীঃ) শাহিরাজ ত্রিলোচনপালের সাহায্যার্থ কাশ্মীর হইতে একদল সৈন্য তুরুষ্কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে। এই যুদ্ধে কাশ্মীর সৈন্য পরাজিত হয়, ত্রিলোচনপালও অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অবশেষে তুরুষ্কদের হস্তে পরাজয় স্বীকার করেন এবং ইহার অনতিকাল পরেই শাহি রাজ্যের গৌরব রবি অস্তমিত হয়। কহ্লণ-বর্ণিত তুরুষ্ক যুদ্ধ সম্ভবতঃ ১০১৩ খ্রীষ্টাব্দের অভিযানই সূচিত করিতেছে (৭।৪৭-৬৯)।

আল উৎবীর মতে কয়েক বৎসর পরেই পুরুজয়পালের সহিত সুলতান মামুদের দ্বিতীয় বার যুদ্ধ হয় এবং সুলতান জয়লাভ করেন। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে এই পুরুজয়পাল যে ত্রিলোচনপালেরই নামান্তর, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। এই যুদ্ধ কোথায় হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। আল উৎবীর মতে 'রাহিব নদীর তীরে' (ইলিয়টের অনুবাদ) অথবা 'কোন নদীর তীরে রাহিব নামক স্থানে (রেণল্ডসের অনুবাদ), পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণের মতে যমুনা নদীর তীরে। নিজামউদ্দিনের মতে চন্দেল্লরাজ গণ্ডের বিরুদ্ধেই মামুদ অভিযান করিয়াছিলেন এবং ত্রিলোচনপাল গণ্ডের সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়াতেই মামুদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়। আল উৎবী এই যুদ্ধের তারিখ নির্দ্দেশ করেন নাই। নিজামউদ্দিনের মতে এই যুদ্ধ ৪১০ হিঃ (১০১৯খ্রীঃ) এবং ফেরিস্তার মতে ৪১২ হিঃ (১০২১ খ্রীঃ) ঘটিয়াছিল। আলবেরুণীর মতে এই শেষোক্ত বৎসরে ত্রিলোচনপালের মৃত্যু হয়।

রাহিবের যুদ্ধের বর্ণনার সঙ্গেই আল উৎবীর গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তীকালের ঘটনা সম্বন্ধে নিজামউদ্দিন বলেন যে, ৪১৩ হিঃ (১০২২ খ্রীঃ) সুলতান মামুদ লাহোর আক্রমণ করেন। ফেরিস্তা বলেন যে, লাহোরের রাজা আজমীঢ়ে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন এবং সুলতান মামুদ লাহোর ও অন্যান্য স্থানে মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এইরূপে হিন্দু শাহি রাজ্য মুসলমানগণের অধিকৃত হয়। আলবেরুণীর মতে ত্রিলোচনপালের পুত্র ভীমপাল ১০২৬ খ্রীঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন। আল উৎবী লিখিয়াছেন যে, পুরুজয়পালের (ত্রিলোচনপালের) সহিত চাঁদ রায় নামক এক রাজার শত্রুতা ছিল। চাঁদ রায়ের কন্যার সহিত স্বীয় পুত্র ভীমপালের বিবাহ দিয়া এই শত্রুতার অবসান করিবার জন্য ত্রিলোচনপাল তাঁহাকে চাঁদ রায়ের নিকট প্রেরণ করেন; কিন্তু এই সুযোগে চাঁদ রায় তাঁহাকে বন্দী করেন।

ভীমপাল সম্ভবতঃ কারামুক্ত হইয়া রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন এবং ১০২২ খ্রীঃ আজমীঢ়ে আশ্রয়

লইয়াছিলেন। এইরূপে চারি বৎসর কাল জীবন যাপন করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শাহি রাজবংশের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হয়।

শাহি রাজবংশের পতন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই রাজবংশের গৌরবময় স্মৃতির প্রতি ভারতবাসী যে কিরূপ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিত, তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত আলবেরুণীর উক্তি এবং রাজতরঙ্গিণীর সপ্তম অধ্যায়ের তিনটি শ্লোক হইতে (৬৬-৬৯) কতক বুঝিতে পারি। শাহি রাজ্যের ধ্বংসের পর শাহি বংশীয় রাজপুত্রগণ কাশ্মীরে সসম্মানে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন এবং শাহি বংশীয় কোন কোন রাজকন্যা কাশ্মীরের রাজমহিষী হইয়াছিলেন (রাজতরঙ্গিণী সপ্তম অধ্যায় ১৪৪-৭৮)।

আশ্বিন ১৩৩৬

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

চৈতন্য-সম্প্রদায় ও মাধ্ব সম্প্রদায়

চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্বন্ধে আজকাল এইরূপ একটি মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে, এই সম্প্রদায় প্রাচীনতর মাধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। চৈতন্য-সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁহার তিনখানি গ্রন্থে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এই মতবাদের প্রতিধ্বনি করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই দেশে মাধ্ব সম্প্রদায়ের গৌরব প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং চৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদবর্গ যে শুধু এই পূর্ব্বতন সম্প্রদায়ের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন, তাহা নহে; এই সম্প্রদায়কে গুরু-সম্প্রদায় বলিয়া বরণ করিয়া স্বয়ং চৈতন্যদেব প্রকারান্তরে ইহার অন্তর্ভুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। এই মতবাদ কত দূর সমীচীন, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি আকারে প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহার বিস্তৃত সমালোচনার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই সময়ে মাধ্ব মতের প্রচুর প্রচলন সম্বন্ধে কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বা প্রবাদ পাওয়া যায় না। জয়দেব বা চণ্ডীদাসের পদাবলীতে যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়, তাহার সহিত মাধ্ব মতের কোনও সম্পর্ক দেখা যায় না। রাস-পঞ্চাধ্যায় মাধ্ব বৈষ্ণবগণের স্বীকৃত নহে; এবং যে শ্রীরাধা বা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা জয়দেব ও চণ্ডীদাসের উপজীব্য, তাহা মাধ্ব উপাসনা-তত্ত্বে উচ্চ স্থান অধিকার করে না। জয়দেব ও চণ্ডীদাসের গ্রন্থাদিতে প্রতিফলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের যাহাই স্বরূপ হউক না কেন, ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের গ্রন্থে বিশিষ্ট মাধ্ব মতের পরিপোষক কিছুই পাওয়া যায় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অনতিপূর্ব্বে যাঁহাদের প্রেরণায় এই দেশে বৈষ্ণব ভক্তিরসের প্রচার হইয়াছিল, তাঁহাদের অগ্রগণ্য ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী নামক একজন সন্ন্যাসী। সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণব-তোষণী টীকার নমস্ক্রিয়ায় বলিয়াছেন যে, মাধবেন্দ্র পুরীর দ্বারাই কৃষ্ণভক্তিরূপ রস-তরু অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন,—"ভক্তিকল্পতরুর তিঁহ প্রথম অঙ্কুর"। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে, ভক্তিরসের আদি সূত্রধার বলিয়া মাধবেন্দ্র পুরী কীর্ত্তিত হইয়াছেন; এবং কবিকর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, উজ্জ্বলাদি-রস-প্রধান গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম মাধবেন্দ্র পুরীর দ্বারাই প্রবর্ত্তিত। কথিত আছে যে, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে অদ্বৈত আচার্য্য মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় তাঁহার সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। মাধবেন্দ্রের সহিত চৈতন্যদেবের কখনও দেখা হইয়াছিল কি না, জানা

যায় না; বোধ হয় তৎপূর্ব্বেই মাধবেন্দ্র দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু মাধবেন্দ্রের অন্যতম শিষ্য ঈশ্বর পুরী তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন এবং কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার সন্ন্যাস-গুরু কেশব ভারতীও মাধবেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। চৈতন্যভাগবতাদিতে মাধবেন্দ্র পুরীর যে সমাধি ও ভাবোন্মাদের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা চৈতন্যদেবেরই অনুরূপ। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

মাধবেন্দ্রপুরী কথা অকথ্য কথন।
মেঘ দরশন মাত্র হয় অচেতন॥

ইহা হইতে মনে হয় যে, চৈতন্যদেবের ন্যায় তিনিও ভাবপ্রধান সন্ন্যাসী ছিলেন, এবং তাঁহার ভক্তিরসময় সাধনার ধারায় চৈতন্যদেবের ভাব-জীবনের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়।

কিন্তু শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন-প্রমুখ লেখকগণের মতে চৈতন্যদেবের অগ্রগামী এই মহাপুরুষ মাধ্ব সন্ন্যাসী ছিলেন; এবং ইঁহাকে পরমগুরু বলিয়া স্বীকার করাতে চৈতন্যদেবকে সম্প্রদায়-অনুরোধে মাধ্ব সন্ন্যাসী বলিতে হইবে। ইহা হইতে তাঁহারা আরও অনুমান করেন যে, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে মাধ্ব মতের বহুল প্রচার ছিল। কিন্তু এই সকল অনুমানের কোনও ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ, মাধবেন্দ্র পুরীকে মাধ্ব সন্ন্যাসী বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রমাণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের কোনও প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেবের যে কয়খানি চরিতগ্রন্থ আছে এবং চৈতন্য-লীলা অবলম্বনে কবিকর্ণপুর যে কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছিলেন, একমাত্র তাহাতেই মাধবেন্দ্র পুরীর উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু কুত্রাপি তিনি মাধ্ব সন্ন্যাসী বলিয়া বর্ণিত হন নাই। মাধ্ব সম্প্রদায়ের আদিগুরু মধ্বাচার্য্য, অচ্যুতপ্রেক্ষ বা পুরুষোত্তম তীর্থের দ্বারা দীক্ষিত হইয়া, 'আনন্দ তীর্থ' এই সন্ন্যাস নাম গ্রহণ করেন। পরে শঙ্করের অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে স্বীয় দ্বৈতবাদ প্রচার করিলেও শঙ্কর-সম্প্রদায়ের এই তীর্থ-আখ্যা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত শিষ্যানুক্রমে মাধ্ব-গুরুগণ শঙ্করের দশনামী সম্প্রদায়ের এই 'তীর্থ' আখ্যাদ্বারা পরিচিত; তাঁহাদের মধ্যে 'পুরী' বা 'ভারতী' এই সন্ন্যাস-উপাধি পাওয়া যায় না। 'তীর্থে'র শিষ্য 'পুরী' বা 'ভারতী' হইতে পারেন না—'তীর্থ'ই হইবেন। ইহা হইতে মনে হয়, মাধবেন্দ্র ও তৎশিষ্য ঈশ্বর পুরী শঙ্কর-সম্প্রদায়ী ছিলেন, এবং কেশব ভারতীও এই সম্প্রদায়-ভুক্ত। ইহা আরও উল্লেখযোগ্য যে, শঙ্কর সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীরা 'শিখা' ও 'সূত্র' পরিত্যাগ করেন, কিন্তু মাধ্ব সন্ন্যাসীরা তাহা করেন না। চৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য, তৃতীয় অধ্যায়) লিখিত আছে যে, মাধবেন্দ্র শিখা-সূত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং চৈতন্যদেবও কাটোয়াতে সন্ন্যাসগ্রহণের সময় সেইরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া সর্ব্বত্র লিখিত আছে।

চৈতন্যদেবের মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্তির যেমন কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না, তেমনি

শঙ্কর-সম্প্রদায়-ভুক্তির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য, তিনি যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার সহিত তাঁহার বিশিষ্ট সম্প্রদায় ভুক্তির কোনও সম্পর্ক নাই; কারণ, তাঁহার ধর্ম্মমত তাঁহার নিজস্ব ও সাম্প্রদায়িক মতের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের স্মার্ত্ততত্ত্ব, দার্শনিক তত্ত্ব ও উপাসনা-তত্ত্ব, মাধ্ব বা শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সেই সব তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সুতরাং তাঁহাকে অন্য কোন আচার্য্য-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিলে তাঁহার সম্প্রদায়ের কোনও গৌরব হানি হয় না। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে মনে হয় যে, সন্ন্যাসগ্রহণের সময় তিনি কেশব ভারতীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া আপনাকে প্রথমে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী বলিয়াই জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের একাধিক স্থলে চৈতন্যদেব আপনাকে 'মায়াবাদী' সন্ন্যাসী বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু কোথাও মাধ্ব সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দেন নাই। পুরীতে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট তিনি ভারতী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন; এবং কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসীর কঠোর প্রস্থান পরিত্যাগ করার জন্য অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দ তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে আরও জানা যায় যে, দাক্ষিণাত্য পর্য্যটনকালে মধ্বাচার্য্যের স্থান উড়ুপীতে উপনীত হইয়া, চৈতন্যদেব মাধ্ব তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নিরাস করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় মতে আনিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সব আলোচনা করিলে তাঁহাকে কোন মতে মাধ্ব সন্ন্যাসী বলা যায় না।

কিন্তু মায়াবাদী সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া চৈতন্যদেব ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মাধবেন্দ্র-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ কিরূপে সগুণ উপাসনা ও ভক্তিবাদের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে শঙ্করের পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতের ধারা বুঝিতে হইবে। এই যুগে অদ্বৈতবাদ ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার সহিত কোনও বিশিষ্ট দেবতার আরাধনা যে কখনও পরস্পরবিরোধী বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। প্রবাদ আছে যে, স্বয়ং শঙ্করের ইষ্টদেবতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ; বিষ্ণুপুরাণাদির টীকার নমস্ক্রিয়া হইতে জানা যায় যে, শঙ্কর-সম্প্রদায়ী শ্রীধর স্বামী, শঙ্কর-শিষ্য পদ্মপাদের ন্যায়, নৃসিংহমূর্ত্তির উপাসক ছিলেন। এইরূপ একাধিক অদ্বৈতবাদী শঙ্কর-সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী নির্গুণ ব্রহ্মের নির্দ্দেশক হিসাবে প্রতীক-উপাসনার অনুমোদন করিয়াছেন। সুতরাং, শ্রীমদ্ভাগবতের ও ভগবদ্গীতার টীকায় শ্রীধর স্বামী যে শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সহিত ভাগবত ভক্তিবাদ মিশ্রিত করিবেন—ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। শ্রীধর স্বামীর টীকায় এই বিরোধ লক্ষ্য করিয়া জীব গোস্বামী (তত্ত্বসন্দর্ভ, বহরমপুর সংস্করণ, পৃ ৬৭-৬৮) এইরূপ সমাধান করিয়াছেন যে, শ্রীধর সত্য সত্যই পরম বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদীদিগের নিকট ভগবন্মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে, তিনি অদ্বৈতমতের দ্বারা স্বীয় মত কর্ব্বুরিত করিয়া, তাঁহাদিগের গ্রহণযোগ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুমানের সপক্ষে কোনও

প্রমাণ নাই, বরং তদীয় ভগবদ্গীতার টীকার প্রারম্ভে শ্রীধর, ভাষ্যকার শঙ্করের মতের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন, এবং বহু স্থলে শঙ্কর-বিবৃতির উল্লেখ করিয়া বাহুল্য হইতে বিরত হইয়াছেন। যদিও ভক্তিব্যাখ্যাই তাঁহার টীকা-সমূহের বৈশিষ্ট্য, তথাপি তিনি অদ্বৈতবাদের প্রতিও যথেষ্ট অনুরাগ দেখাইয়াছেন। এই ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় প্রয়াসের যাহাই মূল্য হউক না কেন, ইহা তৎকালীন বিশিষ্ট দার্শনিক মনোভাবের পরিচায়ক। প্রবাদ আছে যে, শ্রীধরের এই অপূর্ব্ব চেষ্টার ফলে, কাশীধামে স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে দৈববাণীর দ্বারা শ্রীধরী ব্যাখ্যারই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল। বোধ হয়, শ্রীধরী ব্যাখ্যার অনুসরণে এই সময় হইতেই, এক শ্রেণীর ভাবপ্রধান সন্ন্যাসীর উদ্ভব হইয়াছিল, যাঁহারা অদ্বৈত-সন্ন্যাসের কঠোরতাকে ভক্তিবাদের সরস ধারায় অভিষিক্ত করিয়া, ধর্ম্মকে শুষ্ক দর্শনের গণ্ডী হইতে জীবনের বিচিত্র ভাবধারার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতি এই ধরণের সন্ন্যাসী ছিলেন। এবং চৈতন্যদেবও বোধ হয়, এই প্রস্থানের ভক্তিপ্রবণতায় আকৃষ্ট হইয়া প্রথমে এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ভক্তিবাদী হইয়াও অদ্বৈত আচার্য্যেরও যে অদ্বৈত জ্ঞানবাদের প্রতি পক্ষপাত ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তীরভুক্তির বিষ্ণুপুরীও এই শ্রেণীর সন্ন্যাসী ছিলেন; তাঁহাকেও মাধ্ব বলিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। শ্রীধরের সরণি অনুসরণ করিয়া বিষ্ণুপুরী শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিপ্রধান শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিয়া 'ভাগবত ভক্তিরত্নাবলী' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের শেষে একটি শ্লোক আছে, তাহাতে সংগ্রাহক স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রীধরের ব্যাখ্যাই তাঁহার উপজীব্য এবং শ্রীধরের লিখন হইতে স্বরচনায় যদি কিছু ন্যূনাধিক দৃষ্ট হয়, তাহার জন্য সুধীবর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছেন। বাস্তবিক, পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মমতের উপর শ্রীধর স্বামীর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। স্বয়ং চৈতন্যদেব শ্রীধর স্বামীর মতের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং একবার পুরীতে বল্লভভট্ট-বিরচিত ভগবদ্গীতার কোনও ব্যাখ্যাকে তিনি, 'স্বামী'মতের বিরোধী বলিয়া, শ্লেষপূর্ব্বক 'ভ্রষ্টা' এই আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণব-তোষণী নামক শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে শ্রীধর স্বামীর ভক্তি-ব্যাখ্যার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন; এবং চৈতন্য-সম্প্রদায়ের পরম দার্শনিক জীব গোস্বামী তাঁহার ষট্সন্দর্ভে (বিশেষতঃ ভগবৎসন্দর্ভে ও পরমাত্মসন্দর্ভে) বারংবার শ্রীধর স্বামীর টীকা উদ্ধৃত করিয়া তাহার উপর স্বীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

চৈতন্য-সম্প্রদায় বা ইহার ধর্ম্মমতের আদি উৎস হইতেছে শ্রীমদ্ভাগবত। যেমন শ্রী, ব্রহ্ম প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়-চতুষ্টয় এই মহাগ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া স্বকীয় ভক্তিবাদের প্রচার করিয়াছিল, তেমনি চৈতন্য-সম্প্রদায়ও স্বাধীনভাবে উক্ত গ্রন্থকে আপন ধর্ম্মমতের দার্শনিক ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ

করিয়াছিল, অন্য কোনও প্রচলিত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব বা সাহায্য স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় নাই। শ্রীধরী ব্যাখ্যা অনুসৃত হইলেও, ইহার জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় চৈতন্য সম্প্রদায় কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয় নাই; কিন্তু শ্রীধরের ব্যাখ্যার ফলস্বরূপ যে এক নূতন শ্রেণীর ভক্তিবাদী সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রেরণা ও ভক্তির আদর্শ বাঙ্গালা দেশের এই নূতন সম্প্রদায়কে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কিন্তু তৎকালীন কোনও বিশিষ্ট বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাব বা অন্তর্ভুক্তির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। জীব গোস্বামীর দার্শনিক গ্রন্থসমূহে অনেক স্থলে রামানুজীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে রামানুজ-মতাবলম্বী বলা যায় না। তেমনি কোন কোন মতের সাদৃশ্য বা ঋণ দৃষ্ট হইলেও, চৈতন্য-সম্প্রদায়কে নিম্বার্ক বা মাধ্ব সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন বলিয়া গণনা করা যায় না, এবং বল্লভাচারী-সম্প্রদায় তো ইহার প্রায় সমসাময়িক। চৈতন্যদেবের নিত্যপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমুদয় শাস্ত্রগ্রন্থের আদি রচয়িতা বৃন্দাবনের (ছয়) গোস্বামী মহাশয়গণ, তৎপ্রেরিত হইয়া যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সম্প্রদায় মাধ্ব মতাবলম্বী ছিল বলিয়া কোন কথাই পাওয়া যায় না। পরন্তু, জীব গোস্বামী তদীয় সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—ইহার কোন বাদকেই স্বসম্প্রদায়-নিরূপিত বাদ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। রূপ গোস্বামী তাঁহার লঘুভাগবতামৃতে মাধ্ব ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব-তোষণী টীকায় উক্ত ভাষ্য-মত দুই এক স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন; জীব গোস্বামীও তাঁহার ভগবৎসন্দর্ভাদিতে মধ্ব-ভাষ্য প্রমাণিত শ্রুতিবাক্য কয়েক স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি, শ্রীজীব তদীয় তত্ত্বসন্দর্ভে মধ্বাচার্য্যের বৈষ্ণবমতের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, বিজয়ধ্বজ, ব্রহ্ম তীর্থ ও ব্যাস তীর্থ, এই তিন মাধ্ব আচার্য্যের রচিত ক্রমান্বয়ে ভাগবত-তাৎপর্য্য, ভারত-তাৎপর্য্য ও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য নামক গ্রন্থসমূহ হইতে তিনি উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্ব-গৌড়ীয়বৈষ্ণব-মান্য এই তিন জন গোস্বামী কুত্রাপি মধ্বাচার্য্যদিগকে পূর্ব্ব গুরু বলিয়া উল্লেখ বা স্বীকার করেন নাই।

মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্তির উল্লেখ একমাত্র বলদেব বিদ্যাভূষণের গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁহার গোবিন্দ ভাষ্যের প্রারম্ভে ও প্রমেয়-রত্নাবলীতে, মধ্বাচার্য্য হইতে মাধবেন্দ্র পুরী ও ঈশ্বর পুরী পর্য্যন্ত চৈতন্যদেবের গুরু-পরম্পরার একটি তালিকা পাওয়া যায়; কিন্তু বলদেবের উক্তি ভিন্ন, চৈতন্যদেব ও মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতির মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্তির অপর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে সকল মাধ্ব আচার্য্যগণের নাম এই তালিকায় উক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহাদের ঐতিহাসিক পরম্পরা বা কাল-নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার নহে;

কিন্তু শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র রায় ইতিপূর্ব্বে উদ্বোধন পত্রিকায় (১৩৩৬-৩৭) দেখাইয়াছেন যে, এই তালিকায় মাধ্ব গুরুদিগের যে পৌর্ব্বাপর্য্য উক্ত হইয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট গোলযোগ রহিয়াছে। এই তালিকার কিছু ঐতিহাসিকতা থাকিলেও, মোটামুটি ইহা কল্পনা-প্রসূত অথবা অপর্য্যাপ্ত তথ্য অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই তালিকার অনুরূপ একটি গুরুপ্রণালিকা কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় দৃষ্ট হয়; কিন্তু এই দুই তালিকার এরূপ আক্ষরিক সাদৃশ্য আছে যে, তাহাতে মনে হয়, এই তালিকাটি বলদেব বিদ্যাভূষণের গ্রন্থ হইতে কবিকর্ণপূরের গ্রন্থে পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কারণ, কবি কর্ণপূর অন্যত্র তাঁহার চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের পঞ্চম অঙ্কে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব অদ্বৈতবাদীদিগের তুরীয় আশ্রম (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, উড়িষ্যা-নিবাসী বলদেব বিদ্যাভূষণ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক, এবং চৈতন্যদেবের বহু পরবর্ত্তী। তিনি রূপ গোস্বামীর স্তবমালার যে টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ১৬৮৬ শকাব্দ অথবা ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ এইরূপ তারিখ দিয়াছেন। চরমা প্রাপ্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐক্যমত না দেখাইলেও, তাঁহার বিবিধ গ্রন্থে মাধ্ব সম্প্রদায় ও তন্মতবাদের প্রতি তিনি স্পষ্ট অনুরাগ দেখাইয়াছেন। অতি আধুনিক সময়ে তিনি সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ও সর্ব্বজনমান্য দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু ছয় গোস্বামীর মত, তিনি চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ অনুচর বা নিত্যপার্ষদ ছিলেন না। সুতরাং, তাঁহার উক্তি বা মতবাদকে এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক বা ঐতিহাসিক তথ্যের অভ্রান্ত নিদর্শক হিসাবে গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ হইবে না। কিন্তু বলদেব বিদ্যাভূষণের এই মাধ্ব-অনুরাগের বোধ হয়, একটি ঐতিহাসিক কারণ ছিল। এরূপ প্রবাদ আছে যে, তাঁহার সময়ে অপেক্ষাকৃত নূতন চৈতন্য-সম্প্রদায়কে কোন্ প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করিতে হইবে, এই প্রশ্ন লইয়া বৃন্দাবনের বৈষ্ণব-সমাজে একটি বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল; এবং জয়পুর রাজ্যের গল্‌তা উপত্যকায় যে বৈষ্ণব-সমাজের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বলদেব ইহার মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যে কেন ইহা করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। মাধ্ব মতের প্রতি তাঁহার তো অত্যধিক অনুরাগ ছিলই; কিন্তু এই ব্যক্তিগত কারণ ছাড়িয়া দিলে, মনে হয় যে, সেই সময়ে অর্ব্বাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে কোনও প্রাচীনতর সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের অনুভুর্ক্ত বলিয়া স্বীকার করা তিনি শ্রেয়স্কর পন্থা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গোবিন্দভাষ্য রচনার ইতিহাসও এই ঘটনার সহিত সম্পৃক্ত। অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে স্বকীয় বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ স্থাপন করিবার জন্য, পূর্ব্বতন সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের

প্রত্যেকেই বেদান্ত-সূত্রের আপন মতানুযায়ী ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাহা করেন নাই; কারণ, তাঁহাদের মতে ব্যাস-রচিত শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের আদি ও অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে অপেক্ষাকৃত নূতন চৈতন্য-সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, বেদান্তসূত্রের নূতন ভাষ্য রচনা করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল; তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে বলদেব বিদ্যাভূষণ এই অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই ভাষ্যের প্রারম্ভে যে কাল্পনিক মাধ্ব গুরু-পরম্পরার তালিকা বিবৃত হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় এই ঘটনা-প্রসূত।

কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, মাধ্ব মতের সহিত চৈতন্য-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্য নাই। ইহার স্মৃতি, দর্শন ও উপাসনাতত্ত্ব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত শ্রীমদ্ভাগবতই ইহার ভক্তিবাদের প্রেরণার মূলে রহিয়াছে; সেই জন্য ইহার উৎপত্তি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত স্বাধীনভাবেই হইয়াছিল। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের তুরীয় আশ্রম গ্রহণ করিলেও, শ্রীধর স্বামী মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতি শঙ্কর-সম্প্রদায়ীর মত, চৈতন্যদেব ভক্তিবাদী হইয়া, স্বীয় সাধনার বলে স্বসম্প্রদায়কে অতিক্রম করিয়া এত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নূতন সম্প্রদায় বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এই জন্য চৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকায় আনন্দী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, তাঁহারই পার্ষদগণ সাম্প্রদায়িক গুরু, অন্য কেহ নহে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ স্বয়ং সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকস্তৎপার্ষদা এব সাম্প্রদায়িকা গুরবো নান্যে)।

শ্রীসুশীলকুমার দে

ভগবান্ পার্শ্বনাথ

বর্ত্তমান সময় হইতে ২৮০০ অষ্টাবিংশতি শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ভারতের স্বনামধন্যা পুরাতন নগরী বারাণসীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় অশ্বসেন নৃপতির ঔরসে ও রাজ্ঞী বামাদেবীর গর্ভে পৌষ মাসের কৃষ্ণা দশমী তিথির মধ্যরাত্রে জৈনগণের ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর ভগবান্ পার্শ্বনাথ জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কুশস্থলাধিপতি রাজা প্রসেনজিতের কন্যা প্রভাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ভগবান্ পার্শ্বনাথ ৩০ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে যাপন করিয়া সর্ব্বপরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করেন ও ঘোর তপশ্চরণে রত হন। ইঁহার তপশ্চর্য্যাকাল মাত্র ৮৩ দিবসব্যাপী ছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি দৈবিক, ভৌতিক, মানুষিক প্রভৃতি অনেক প্রকার উপসর্গের মধ্যেও আত্মধ্যান হইতে বিচলিত হন নাই। ৮৩ দিবসান্তে ইনি লোকালোক-প্রকাশক পূর্ণ কৈবল্য-জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। এই জীবন্মুক্ত কৈবল্য অবস্থায় ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তীর্থঙ্কররূপে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া একশত বৎসর বয়ঃক্রমে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৭৭৭ বর্ষে শ্রাবণ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে পরম নির্ব্বাণ লাভ করেন। ইহাই ভগবান্ পার্শ্বনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কিছু সময় পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ ভগবান্ পার্শ্বনাথকে পৌরাণিক বা কাল্পনিক ব্যক্তিরূপে মনে করিতেন। কিন্তু অধুনা প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ গবেষণার ফলে, এই মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও পার্শ্বনাথ ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন।[১] এক্ষণে Prof. Jacobi, Dr. V. A. Smith, Dr. Guerinot, Dr. Glasenapp প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের মতে অন্তিম তীর্থঙ্কর ভগবান্ মহাবীরের পূর্ব্বে ভগবান্ পার্শ্বনাথ-প্রচারিত চতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এই চতুর্যাম ধর্ম্মই বর্ত্তমান জৈনধর্ম্মের মূল ভিত্তি এবং ভগবান্ মহাবীরের মাতাপিতাও এই ধর্ম্মই পালন করিতেন, পরে ভগবান্ মহাবীর পঞ্চযাম ধর্ম্ম প্রচার করেন। প্রায় ৩০০০ হাজার বৎসর অতীত হইতে চলিল, তথাপি ভগবান্ পার্শ্বনাথের ব্যক্তিত্বের স্মৃতি জৈন-হৃদয়ে, জৈন-সাহিত্যে ও জৈন-ভাস্কর্য্যে অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। জৈনদিগের পবিত্র কল্পসূত্রের প্রথমাংশে যে তীর্থঙ্করদিগের জীবনীগুলি আছে, তাহাতে পার্শ্বনাথের মাত্র

---

১ Sacred Books of the East, Vol. XLV, Jain Sutra, Part II, page XXI, Introd.

সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁহার বিস্তৃত জীবনী আরও অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—

(১) বিক্রম সম্বৎ ১১৩৯ পদ্মসুন্দরগণি-কৃত পার্শ্বনাথচরিত্র (সংস্কৃত)

(২) " ১১৬৫ দেবভদ্রস্থরি-কৃত পার্শ্বনাথচরিত্র (প্রাকৃত)

(৩) " ১২২০ হেমচন্দ্র আচার্য্য-কৃত ত্রিষষ্ঠীশলাকা পুরুষ চরিত্রে পার্শ্বনাথচরিত্র ৯ম পর্ব্ব (সংস্কৃত)
[জৈনধর্ম্মপ্রসারক সভা, ভাবনগর হইতে প্রকাশিত]

(৪) " ১২৭৭ মাণিক্যচন্দ্র-কৃত পার্শ্বনাথচরিত্র (সংস্কৃত)

(৫) " ১৪১২ ভাবদেবস্থরি-কৃত পার্শ্বনাথচরিত্র (সংস্কৃত)
[ডাঃ ব্লুমফিল্ড সাহেব ইহার অনুবাদ করিয়াছেন।
মূল যশোবিজয় গ্রন্থমালায় বেণারস হইতে প্রকাশিত]

(৬) " ১৬৩২ হিমবিজয়গণি-কৃত পার্শ্বনাথচরিত (সংস্কৃত)
[শ্রীমোহনলাল জৈন গ্রন্থমালা, বোম্বাই হইতে প্রকাশিত]

(৭) " ১৬৫৪ উদয়বীরগণি-কৃত পার্শ্বনাথচরিত্র (সংস্কৃত)
[জৈনধর্ম্মপ্রসারক সভা, ভাবনগর হইতে প্রকাশিত]

(৮) বিজয়চন্দ্র-কৃত পার্শ্বনাথচরিত্র (সংস্কৃত)

(৯) সর্ব্বানন্দ-কৃত পার্শ্বনাথচরিত্র (সংস্কৃত)

দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের কয়েকজন লেখকও পার্শ্বনাথচরিত্র রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বাদিরাজ-কৃত পার্শ্বনাথচরিত্র মাণিক্যচন্দ্র গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে ও পার্শ্বনাথপুরাণ নামক গ্রন্থের ভূধরকবি-বিরচিত ভাষানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ন্যায় জৈনগণও তাঁহাদিগের উপাস্য তীর্থঙ্করগণের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার স্তুতি-স্তবনাদি রচনা করিয়া থাকেন। এই প্রথা প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু অন্যান্য তীর্থঙ্করগণের অপেক্ষা ভগবান্ পার্শ্বনাথের স্তুতি, স্তোত্র, কবিতা, ভজনাদি অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। পুরাকালের কি প্রাকৃত, কি সংস্কৃত স্তব-স্তোত্রাদি হউক, কিংবা বর্ত্তমান দেশী ভাষায় রচিত নানাবিধ ভক্তিরসপূর্ণ পদাবলি হউক, ভগবান্ পার্শ্বনাথের নামের প্রাধান্য সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়, অতএব ভগবান্ পার্শ্বনাথকে জৈনধর্ম্মের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কল্পসূত্রে তাঁহাকে পুরুষাদানী (পুরুষপ্রধান) বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যেও জৈনদিগের ভগবান্ পার্শ্বনাথের নাম যতদূর প্রসিদ্ধ, অন্যান্য জৈন তীর্থঙ্করগণের নাম

ততদূর খ্যাতি লাভ করে নাই। হাজারীবাগ জেলায় জৈনদিগের বিখ্যাত সম্মেতশিখর নামক যে তীর্থস্থান অবস্থিত আছে, ঐ পর্ব্বতে ২৪টি জৈন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২০ জন তীর্থঙ্কর নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ জৈনশাস্ত্রে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও মাত্র পার্শ্বনাথের নামেই অদ্যাবধি ঐ পাহাড় "পরেশনাথ পাহাড়" নামে পরিচিত। ভগবান্ পার্শ্বনাথই যে জৈনদিগের একমাত্র উপাস্য দেবতা, এই ধারণা জৈনেতরগণের মধ্যে এখনও এতদূর বদ্ধমূল যে, তাঁহারা যে কোন জৈন মন্দিরকে পরেশনাথের মন্দির বলিয়াই আখ্যা দিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ কলিকাতার মাণিকতলায় হালসীবাগান-স্থিত স্বর্গীয় রায় বদ্রিদাস বাহাদুর প্রভৃতির নির্ম্মিত জৈন মন্দিরগুলি পরেশনাথের মন্দির বলিয়া সুপরিচিত, অথচ তথায় একটি মন্দিরও ভগবান্ পার্শ্বনাথের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই মন্দিরগুলির মধ্যে একটি ৮ম তীর্থঙ্কর শ্রীচন্দ্রপ্রভ ও দ্বিতীয়টি ১০ম তীর্থঙ্কর শ্রীশীতলনাথ এবং তৃতীয়টি চতুর্ব্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর শ্রীমহাবীরের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই মহানগরীর মধ্যে বড়বাজার কটনষ্ট্রীটস্থিত জৈন মন্দির হইতে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী শুক্ল পূর্ণিমায় যে রথ-মহোৎসবের শোভাযাত্রা বহির্গত হয়, তাহা "পরেশনাথের রথ ও শোভাযাত্রা" নামেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, অথচ ঐ রথ-মহোৎসবে যে প্রতিমা পুজিত হয়, তাহা পঞ্চদশ তীর্থঙ্কর ভগবান্ ধর্ম্মনাথের। ভারতের উত্তর ও পশ্চিম এবং গুজরাট প্রান্তের প্রসিদ্ধ নগরাদি ও জৈন তীর্থস্থান, যেগুলি আমি স্বয়ং পরিদর্শন করিয়াছি, ঐ সকল স্থানে প্রায় সর্ব্বত্রই ভগবান্ পার্শ্বনাথের মন্দির দেখিয়াছি, যেরূপ ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী হিন্দুদিগের শিবলিঙ্গ বা শিবমূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণে অভিহিত, সেইরূপ শ্রীপার্শ্বনাথ-মূর্ত্তিও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণে আখ্যাত হইয়া জৈন ভক্তগণের দ্বারা পুজিত হইতেছেন। এইরূপ বিভিন্ন নামের পার্শ্বনাথের মূর্ত্তির সংখ্যাও শতাধিক দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে যেগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ, সেইগুলির তালিকা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করতঃ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি শেষ করিব।

জৈনদিগের উপাস্য তীর্থঙ্করগণের মধ্যে কি কারণে কেবল পার্শ্বনাথই এইরূপে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে অলঙ্কৃত হইয়া পুজিত হইতেছেন, তাহার কোন গূঢ় তত্ত্ব এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। ভগবান্ পার্শ্বনাথের শিষ্য-পরম্পরায় শ্রীরত্নপ্রভসূরি রাজপুতানাস্থিত ওশিয়া নগরে অনেকগুলি রাজপুতকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, ইহারাই ওশওয়াল নামে অভিহিত। এই ওশওয়াল বংশেই প্রসিদ্ধ জগৎ শেঠের উৎপত্তি এবং এই ওশওয়ালগণ অদ্যাবধি বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া ভারতের নানাস্থানে ও অন্যান্য সুদূর প্রান্তে বসবাস করিতেছেন। ইঁহারা অন্যান্য তীর্থঙ্কর অপেক্ষা পার্শ্বনাথকেই যে অধিক ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবেন—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমি যতদূর জ্ঞাত আছি, শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত জৈনগণই ভগবান্ পার্শ্বনাথকে নানা প্রকার নামভেদে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

যদিও দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত জৈনগণ বর্ত্তমানে এই সমস্ত শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত পার্শ্বনাথের মন্দিরগুলিতে পূজা-অর্চ্চনাদি করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের শ্বেতাম্বরগণের ন্যায় শ্রীপার্শ্বনাথের মূর্ত্তির পৃথক্ পৃথক্ নামভেদে পূজার্চ্চনার বিবরণ পাওয়া যায় না।

ভগবান্ বুদ্ধদেবের জীবনী সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগে নানা ভাষায় বহুসংখ্যক ছোট-বড় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত উপরোক্ত কয়েকটি পুস্তক ব্যতীত জৈন কি জৈনেতর কোন বিদ্বান্ কর্ত্তৃক আধুনিক প্রণালীতে রচিত ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ ভগবান্ পার্শ্বনাথের জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় নাই। আশা করা যায়, এরূপ অত্যাবশ্যক গ্রন্থ শীঘ্রই সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের অকারাদিক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নামের তালিকা

	নাম				স্থান
১।	অঞ্জারা পার্শ্বনাথ		...	...	অঞ্জার (কাঠিয়াওয়াড়)
২।	অন্তরীক্ষ	,,	...	...	অকোলার নিকট (বেরার)
৩।	অমিঝরা	,,	...	...	গিরনার (কাঠিয়াওয়াড়)
৪।	উমরবাড়ী	,,	...	...	সুরত
৫।	ওয়াতী	,,	...	...	পাটন
৬।	করেড়া	,,	...	...	করেড়া (উদয়পুরের সন্নিকট, রাজপুতানা)
৭।	কলিকুণ্ড	,,	...	...	খম্বাৎ (গুজরাট)
৮।	কল্যাণী	,,	...	...	পালনপুর (গুজরাট)
৯।	কংসারী	,,	...	...	খম্বাৎ (গুজরাট)
১০।	কাপড়া	,,	...	...	গুজরাট
১১।	কেশরীয়া	,,	...	...	টীমা (পালনপুর)
১২।	কোকা	,,	...	...	খম্বাৎ (গুজরাট)

	নাম				স্থান
১৩।	গম্ভারী	পার্শ্বনাথ	...	...	গুজরাট
১৪।	গাতলিয়া	„	...	...	মাণ্ডন (গুজরাট)
১৫।	গোড়ী	„	...	...	আজমীর, উদয়পুর, পালি (মারওয়াড়), বিঠুরা (মারওয়াড়), বোম্বাই, মুর্শিদাবাদ
১৬।	ঘৃতকল্লোল	„	...	...	কচ্ছদেশ
১৭।	চম্পা	„	...	...	খম্বাৎ (গুজরাট)
১৮।	চিন্তামণি	„	...	...	লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, মুর্শিদাবাদ, বিকানীর, মেড়তা (মারওয়াড়), পাটন, সাদরী, যশল্মীর
১৯।	জগবল্লভ	„	...	...	ঋষভদেব (মেবার), আহম্মদাবাদ
২০।	জীরাওলা	„	...	...	সিরোহী (রাজপুতানা), আহম্মদাবাদ
২১।	জোটবা	„	...	...	চানস্ (মহিষাণা গুজরাট)
২২।	টাঁকলা	„	...	...	খম্বাৎ (গুজরাট)
২৩।	দাদা	„	...	...	বরোদা
২৪।	নওলাক্ষা	„	...	...	পালি (মারওয়াড়)
২৫।	নবখণ্ডা	„	...	...	পাটন, ঘোঘাবন্দর (কাঠীয়াওয়াড়)
২৬।	নবপল্লব	„	...	...	খম্বাৎ (গুজরাট)
২৭।	নাকোড়া	„	...	...	বালোতরা (মারওয়াড়)
২৮।	নাডলাই	„	...	...	নাডলাই (মারওয়াড়)
২৯।	পঞ্চাসরা	„	...	...	পাটন (গুজরাট)
৩০।	পল্লবিয়া	„	...	...	পালনপুর
৩১।	ফলবর্দ্ধী	„	...	...	ফলোদী (মারওয়াড়)
৩২।	বরকাণা	„	...	...	বরকাণা (মারওয়াড়)
৩৩।	বিজয়-চিন্তামণি	„	...	...	আহম্মদাবাদ
৩৪।	ভদ্রাবতী	„	...	...	বেরার
৩৫।	ভাভা	„	...	...	পাটন (গুজরাট)
৩৬।	ভীড়ভঞ্জন	„	...	...	উনাভা (উত্তর-গুজরাট), খেড়া (গুজরাট)
৩৭।	মকসী	„	...	...	মকসী (গোয়ালিয়র, মধ্যভারত)

	নাম			স্থান
৩৮।	মনমোহন পার্শ্বনাথ	...	...	পাটন
৩৯।	মনরঙ্গা "	...	...	মহিষাণা (গুজরাট)
৪০।	মহোরী "	...	...	টীটোই (গুজরাট)
৪১।	মোরইয়া "	...	...	আহম্মদাবাদ (গুজরাট)
৪২।	লোঢ়ন "	...	...	ডভোই (গুজরাট)
৪৩।	লোদ্রপুর "	...	...	লোদ্রবা (যশল্মীর)
৪৪।	শামলা বা শামলীয়া "	...	...	পাটন, মুর্শিদাবাদ
৪৫।	শেষফণা "	...	...	আহম্মদাবাদ, জুনাগড়
৪৬।	সহস্রফণা "	...	...	পাটন, যোধপুর
৪৭।	শঙ্খেশ্বর "	...	...	পাটন, বিকানীর
৪৮।	সহস্রকুট "	...	...	পাটন
৪৯।	সোমচিন্তামণি "	...	...	খম্বাৎ (গুজরাট)
৫০।	স্তম্ভন "	...	...	পাটন (গুজরাট)

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার

প্রথম মহীপালদেব ও খ্রি-রল্

তারনাথ বহুদিন পূর্ব্বে (১৬০৮ খ্রীঃ অব্দে) বলিয়া গিয়াছেন, গৌড়েশ্বর মহীপালের মৃত্যু ও তিব্বতরাজ খ্রি-রলের মৃত্যু প্রায় একই সময়ে।[১] ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ খ্রি-রল কে তাহা নির্ণয় করিতেই পারেন নাই। তাঁহার "প্রাচীন ভারত-ইতিহাসে"র চতুর্থ সংস্করণের সম্পাদক এড্‌ওয়ার্ডস্ এ সম্বন্ধে কোনই আলোক দান করেন নাই।[২] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার জনৈক লেখক য়ে-শেস্-'ওদের নামান্তর খোর্-রেকে খ্রি-রলের রূপান্তর মনে করিয়াছেন।[৩]

এইরূপ অজ্ঞতায় আশ্চর্য্যান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। এমিল্ শ্লাগিণ্টরাইট দেখাইয়াছেন যে, তিব্বত-রাজ খ্রি-লদে স্রোঙ্-ব্‌চনের নামান্তর খ্রি-রল।[৪] এই রাজার উপাধি রল্-প-চন্ (=জটাধারী) ছিল। তাঁহার নামের ও উপাধির আদ্যাংশ লইয়া সংক্ষেপে তাঁহার নাম খ্রি-রল্। রক্‌হিল রল্-প-চনের নামান্তর খ্রি-রল্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৫] মহামহোপাধ্যায় ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণও এইরূপ বলিয়াছেন।[৬] এই স্থলে অপর সমস্ত গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

চীন ভাষায় খ্রি-লদে-স্রোঙ্-ব্‌চনের নাম কো'-লি-কো'-চু।[৭]

ইঁহার সময় লইয়া নানা মত-ভেদ আছে। ওয়াডেল তাঁহার মৃত্যুর তারীখ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের উল্লেখ করিয়াছেন।[৮]

---

১ Geschichte des Buddhismus in Indien, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, ১৮৬৯, পৃ ২২৫।

২ Early History of India, ৪র্থ সংস্করণ, লণ্ডন, ১৯২৪, পৃ ৪১৫ পাদটীকা ২।

৩ সা. প. প, ৩৩শ ভাগ, ২য় সংখ্যা, পৃ ৫২।

৪ Abhandlungen der Philosophisch-Philologischen Klasse der Königliche Bayerischen Akademie der Wissenschaften, X, III, পৃ ১৯৩; XXII, পৃ ৫২১।

৫ The Life of Buddha, লণ্ডন ১৮৮৪ পৃ, ২২৩।

৬ History of the Mediæval School of Indian Logic, কলিকাতা, ১৯০৯, পৃ ১৪৮।

৭ The Life of Buddha পূর্ব্বোক্ত। Sylvain Lévi রচিত Le Nepal II, প্যারিস, ১৯০৫, পৃ ১৭৭।

৮ Buddhism of Tibet or Lamaism, লণ্ডন, ১৮৯৫, পৃ ৩৪ পাদটীকা ২।

Csoma de Körös-এর মতে ৮৮৯ খ্রীঃ অঃ
Bushell-এর „ ৮৩৮ „ „
Köppen-এর „ ৯১৪ „ „
Sanang Setsen-এর „ ৯০২ „ „

সিল্‌ভ্যাঁ লেভি এবং রক্‌হিল রল্‌-প-চনের মৃত্যু চীন ঐতিহাসিক মতানুযায়ী ৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে স্বীকার করিয়াছেন।[৯] শ্ল্যাগিণ্টবাইট ৮৪২ খ্রীঃ অব্দে স্থির করিয়াছেন।[১০]

গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপালের মৃত্যুকাল কোন মতেই খ্রি-রলের মৃত্যুকালের সহিত এক হইতে পারে না। আমরা তিরুমলৈ শিলালিপি হইতে অবগত আছি যে, রাজেন্দ্র চোল মহীপালকে ১০২৪ খ্রীঃ অব্দে আক্রমণ করেন।[১১] সারনাথ-লিপি হইতে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, ১০২৬ খ্রীঃ অব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে মহীপাল বর্ত্তমান ছিলেন।[১২]

প্রথম মহীপালের পুত্র নয়পাল। এই নয়পাল চেদিরাজ কর্ণদেবের (রাজ্যারোহণ ১০৪১ খ্রীঃ অঃ) সমসাময়িক। নয়পালের জীবিতকালে তাঁহার পুত্র বিগ্রহপাল কর্ণদেবের কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করেন। এ সমস্ত বিষয় আমরা ইতিহাস হইতে অবগত আছি। তিব্বতীয় ইতিবৃত্ত হইতে আমরা আরও জানি যে, নয়পালের রাজত্বকালেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ তিব্বত-যাত্রা করেন। এই ঘটনার তারীখ সম্বন্ধে সামান্য মতান্তর আছে। শরৎচন্দ্র দাসের মতে ১০৪২ খ্রীঃ অব্দে অতীশ তিব্বত যাইবার জন্য বিক্রমশীলা ত্যাগ করেন।[১৩] শ্ল্যাগিণ্টবাইটের মতে অতীশ ১০৪১ অব্দে তিব্বত পৌছেন।[১৪] এই ঘটনা রক্‌হিলের[১৫] মতে ১০৪২ অব্দে, ওয়াডেলের[১৬] মতে ১০৩৮ অব্দে, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের[১৭] মতে ১০৪০ অব্দে সংঘটিত হয়। লেভি মনে করেন, ১০৪০ অব্দের কাছাকাছি ইহা ঘটিয়াছিল।[১৮] যে মতেই হউক, নয়পালের পিতা মহীপাল খ্রি-রলের মৃত্যুকালে জন্মিতেই পারেন না।

---

৯ Buddhism of Tibet or Lamaism, লণ্ডন ১৮৯৫, পৃ ৩৪ পাদটীকা ২।
১০ পূর্ব্বোক্ত।
১১ South Indian Inscriptions, I, পৃ ৯৯ Ep. Ind., IX, পৃ ২৩১।
১২ Ind. Ant., XIV, পৃ ১৩৯।
১৩ Indian Pandits in the Land of Snow, পৃ ৫৫।
১৪ Buddhism in Tibet, লণ্ডন, ১৮৬৩।
১৫ পূর্ব্বোক্ত, পৃ ২২৭।
১৬ পূর্ব্বোক্ত, পৃ ৩৫।
১৭ পূর্ব্বোক্ত, পৃ ১৪৮।
১৮ পূর্ব্বোক্ত, পৃ ১৮৯।

বস্তুতঃ এখানে তারনাথের কিংবা তাঁহার মূল ইতিবৃত্তলেখকের ভ্রম হইয়াছে। তারনাথের মতে মহীপাল ও নয়পালের সম্বন্ধ এইরূপ,[১৯]—
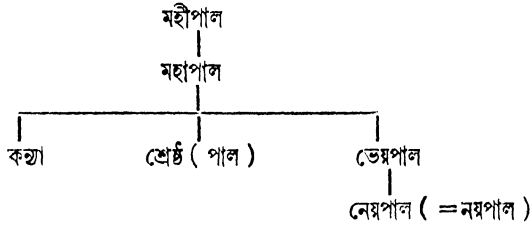
সম্ভবতঃ খ্রি-রলের মৃত্যুর তারীখ অন্য কোন পালবংশীয় রাজার মৃত্যুর তারীখের সহিত এক; লিপিকর-প্রমাদে বা অন্য কারণে তারনাথ মূল পুস্তকে "মহীপালদেব" পাঠ পড়িয়াছেন। সম্ভবতঃ প্রকৃত পাঠ "মহীপাল (=রাজা) দেবপাল"—এইরূপ ছিল। ৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে গৌড়েশ্বর দেবপালের মৃত্যু অসম্ভব নয়।

প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যুকাল অন্য তিব্বতীয় ইতিবৃত্তের সাহায্যে নির্ণীত হইতে পারে; তারনাথ বলেন, নেয়পালের (=নয়পালের) রাজত্বের নয় বৎসর পরে মৈত্রীনাথ মারা যান।[২০] Cordier-এর মতে মৈত্রেয়নাথের (=মৈত্রীনাথের) মৃত্যু ১০৪৮ অব্দে ঘটে।[২১] এই মতে নয়পালের রাজ্যাভিষেক-কাল ১০৩৮।৩৯ অব্দে গিয়া পড়ে। তারনাথের মতে অতীশের তিব্বতে পৌছান এবং নয়পালের সিংহাসন আরোহণ একই বৎসরে সম্পন্ন হয়।[২২] ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত তারীখ সমর্থিত হইতেছে। প্রথম মহীপালের মৃত্যু ঐ সময়েই সংঘটিত হইয়া থাকিবে। ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এই মত খাঁটি থাকিতে পারে কি না, তাহা ঐতিহাসিক বিচার করিবেন।

১৯। Ind. Ant. IV, পৃ ৩৬৬।

২০। Geschichte des Buddhismus in Indien, পৃ ২৪৪।

২১। Catalogue due Fonds Tibétain de la Bibliothèque Nationale, III, পৃ ২৭৩।

২২। Ind. Ant., IV, পৃ ৩৬৬।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

রাজা হাল ও পাটলিপুত্র

প্রাকৃত কাব্য-সাহিত্যে রাজা হালের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি প্রসিদ্ধ 'গাথাসপ্তশতী' নামক গাথাকোষ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। হাল ছিলেন—সাতবাহন বা শালিবাহন বংশের একজন রাজা। মৎস্যাদি পুরাণে রাজবংশকথন-প্রসঙ্গে আমরা হালের নাম পাই; তাঁহার রাজ্যকাল মাত্র পাঁচ বৎসর বলিয়া সেখানে নির্দ্দিষ্ট আছে। লিপিতত্ত্বের প্রমাণ অনুসারে হালের এক শত বর্ষ পূর্ব্বে সাতবাহন রাজা প্রথম পুলোমা (যাঁহাকে নাসিকাদি-স্থানের শিলালিপিতে 'বাসিঠীপুত পুলুমায়ি' বলা হইয়াছে) খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর মাঝখানে পড়েন।[১] সুতরাং আমরা হালকে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রাজা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কোন কোন প্রতীচ্য পণ্ডিত অনুমান করেন যে, সপ্তশতীকে অত প্রাচীন কালের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না; কেন না, ইহার ভাষায় পদের নাদিস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ প্রায়শই দৃষ্ট হয় এবং নাসিক প্রভৃতি স্থানের শিলালিপির প্রাকৃতে ও অশ্বঘোষের প্রাকৃতে তাদৃশ লোপ দেখা যায় না।[২] কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সপ্তশতীর ভাষা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত। সে প্রাকৃতের প্রধান লক্ষণই হইতেছে—ব্যঞ্জনবর্ণের প্রায়শ লোপ। তাহার কারণ, মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে যখন প্রথমে সংস্কৃত ভাষার প্রচার হয়, তখন তাহাদের জিহ্বার জড়তা এতটা ছিল যে, তাহারা সংস্কৃত কোন পদের মধ্যে কিংবা অন্তে স্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ না করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে স্বরবর্ণের প্রয়োগ করা অল্পায়াসসাধ্য মনে করিত। উত্তর-ভারতের প্রাকৃতে ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ দেখা যায় না; সে স্থানের অধিবাসীদিগের উচ্চারণের রীতি অন্যরূপ ছিল। সেই জন্য অশ্বঘোষের প্রাকৃত কিংবা উত্তর-ভারতের অপর কোন প্রাকৃতের সঙ্গে সপ্তশতীর ভাষার তুলনা করিয়া তাহার কালনির্ণয় করা উচিত হইবে না। নাসিক প্রভৃতি স্থানের শিলালিপির ভাষার সঙ্গে তুলনা করিয়া ফরাসী পণ্ডিত Senart সেনার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাসিঠীপুত পুলুমায়ি ও তাঁহার পিতা গোতমীপুত সাতকর্ণির এক শত বৎসর পরে সপ্তশতী রচিত। সেনার সাধারণ মতের অনুসরণ করিয়া এই দুই রাজাকে খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে ফেলিয়াছেন। কিন্তু আমি দেখাইয়াছি যে, তাঁহারা খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন।[৩]

---

১ Zeits. f. Ind. u Iran, ১৯২২।

২ Keith, *Sanskrit Literature*, ১৯২৮, পৃ ২২৪।

৩ Zeits. f. Ind. u. Iran, ১৯২২।

সুতরাং, শিলালিপির ভাষা পর্য্যালোচনা করিলেও হালের সপ্তশতীকে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত বলা যায়।

গাথাসপ্তশতীতে সাত শতটি গাথা আছে। গঙ্গাধরের টীকা সহিত গাথাসপ্তশতী বোম্বাইয়ে 'কাব্যমালা' নামক গ্রন্থমালায় নির্ণয়সাগর প্রেসে ছাপা হইয়াছে। জার্ম্মানিতে অধ্যাপক Weber বেবর এর একটি সুন্দর ভূমিকা-সংবলিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাণভট্ট তাঁহার হর্ষচরিতের স্চনায় বলিয়াছেন,—

অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥

গঙ্গাধর ভট্ট যে সপ্তশতীর টীকা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে এই উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন হয়। পুথিতে যে গাথানুক্রমণিকা সংযুক্ত আছে, তাহা হইতে বোঝা যায় যে, সপ্তশতী একটি কোষ বা সংগ্রহ, অর্থাৎ মাত্র কয়েকটি গাথা হালের স্বকীয় রচনা, বাকী সব অন্যান্য কবিদের লেখনী-প্রসূত। গাথানুক্রমণিকায় সকল গাথার রচয়িতার নাম নাই। গাথাগুলি যে এক একটি রত্ন, এবং গাথাসপ্তশতী যে একটি রত্নের হার, এ ধারণা যিনি এই অমূল্য গ্রন্থের সাক্ষাৎ পরিচয় লইবেন, তাঁহারই হইবে। প্রত্যেকটি গাথাই সুভাষিত অর্থাৎ সু-উক্ত। টীকাকারগণ প্রতি গাথারই শৃঙ্গাররসাত্মক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কামের তত্ত্বচিন্তাই যে সে কালের প্রাকৃত-কাব্যের প্রধান লক্ষণ ছিল, এ কথা সপ্তশতীর দ্বিতীয় গাথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

মুক্তার মালায় বা ফুলের মালায় যেমন রং হিসাবে বা ডৌল হিসাবে মুক্তা বা ফুল সাজানো হইয়া থাকে, তেমনি এই গাথাসপ্তশতীতে গাথা-রত্ন পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা রহিয়াছে। এইটি একটি সাত-নরী হার; এক একটি 'নরে' একশ'টি করিয়া গাথা গাঁথা। ইহাদের আকার সব সমান; সবগুলি দুই লাইনের আর্য্যাচ্ছন্দে রচিত কবিতা। তবে সাজানোর মধ্যে কায়দা আছে। প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, দুই বা ততোঽধিক গাথা কাছাকাছি দেওয়া হইয়াছে; কেন না, কোন একটি শব্দ তাহাদের সবগুলির মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ৭ম শতকে,—

গিজ্জন্তে **মঙ্গল**গাইআহিঁ বরগোত্তদিণ্ণঅণ্ণাএ।
সোউং ব ণিগ্গওউঅহ হোন্ত বহুআই রোমঞ্চো॥ ৪২॥

মণ্ণে আঅণ্ণন্তা আসণ্ণবিআহ**মঙ্গলু**গ্গাইম্।
তেহিঁ জুআণেহিঁ সমং হসন্তি মং বেঅসকুডঙ্গা॥ ৪৩॥

উঅগঅচউত্থিমঙ্গলহোন্তবিও অসবিসেসলগ্গেহিং।
তীঅ বরস্‌স অ সেঅংসুএহিঁ কলসং ব হত্থেহিং ॥ ৪৪ ॥

এই তিনটি গাথাতেই 'মঙ্গল' শব্দটি আছে; সেই জন্যই ইহাদের এই সান্নিধ্য। ইহার পরেই যে তিনটি গাথা আছে, তাহাতেও দেখি, 'ণববহূ' অর্থাৎ 'নববধূ' শব্দটি যোগচিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান।

কখন কখনও একার্থবাচক দুই বা ততোঽধিক শব্দ যোগচিহ্নরূপে কল্পিত হয়। যেমন ৪র্থ শতকে—

চুম্বেন্তি দেন্তি সোক্‌খং কুণন্তি অণুরাঅঅং রমাবেন্তি।
অরইরইবন্ধবাণং ণমো মঅণবাণাণম্ ॥ ২৫ ॥

কুসুমমআ বি অইখরা অলদ্ধফংসা দুসহপআবা।
ভিন্দন্তা বি রইঅরা কামস্‌স সরা বহুবিঅপ্পা ॥ ২৬ ॥

ঈসং জণেন্তি দাবেন্তি মম্মহং বিপ্পিঅং সহাবেন্তি।
বিরহেণ দেন্তি মরিউং অহো গুণা তস্‌স বহুমগ্গা ॥ ২৭ ॥

এ স্থলে 'মদন', 'কাম' আর 'মন্মথ' এই তিন নামে অভিহিত একই পুরুষ—রতিপতি। আবার, প্রথম গাথাটিতে যেমন 'বাণ' শব্দটি রহিয়াছে, দ্বিতীয়টিতে তেমনি 'শর' শব্দটি সংযুক্ত। এবং দ্বিতীয়টিতে যেমন 'বহু' শব্দের ব্যবহার, তৃতীয়টিতেও তেমনি 'বহু' কথাটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

অনেক স্থলে দেবতার উল্লেখযুক্ত দুই বা ততোঽধিক সন্নিধান সম্পর্কিত দেখা যায়। যেমন ৫ম শতকে—

জই ভমসি ভমসু এমেঅ কহ্ণ সোহগ্গবিরো গোট্‌ঠে।
মহিলাণং দোসগুণে বিচারইউং জই খমো সি ॥ ৪৭ ॥

সংঝাসমএ জলপূরিঅঞ্জলিং বিহডিএক্কবামঅরম্।
গোরীঅ কোসপাণুজ্জঅং ব পমহাহিবং ণমহ ॥ ৪৮ ॥

এখানে প্রথম গাথাটিতে শ্রীকৃষ্ণের ও দ্বিতীয় গাথাটিতে প্রমথাধিপের উল্লেখ পরে পরে পাওয়া যায়, তেমনি ৭ম শতকে—

পচ্চূসাগঅ রঞ্জিঅদেহ পিআলোঅ লোঅণাণন্দ।
অণ্ণত্তখবিঅসব্বরি ণহভূসণ দিণবই ণমো দে ॥ ৫৩ ॥

অণুহুত্তো করফংসো সঅলঅলাপুণ্ণ পুণ্ণদিঅহম্মি।
বীআসঙ্গকিসঙ্গঅ এহ্ণিং তুহ বন্দিমো চলণে॥ ৫৭॥

ইহার প্রথমটিতে সূর্য্যের, দ্বিতীয়টিতে চন্দ্রের নমস্কার আছে। এবং দুইটিতেই নায়কের সঙ্গে উদ্দিষ্ট দেবতার উপমেয়-উপমান সম্বন্ধ ব্যঙ্গ্যোক্তির দ্বারা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ব্যঙ্গ্যোক্তিটি টীকাকার গঙ্গাধর বেশ বুঝাইয়া দিয়াছেন,—

প্রত্যূষাগত রক্তদেহ প্রিয়ালোক লোচনানন্দ।
অন্যত্র ক্ষপিতশর্ব্বরীক নভোভূষণ দিনপতে নমস্তে॥

"**প্রত্যূষে** প্রভাতে, **আগতো** দ্বীপান্তরাৎ, পক্ষে মহিলান্তরগৃহাৎ। **রক্ত** আরক্তঃ, পক্ষে অনুরক্তঃ অন্যমহিলায়াম্ ইত্যর্থাৎ; **দেহো** যস্য সঃ। তথা, **প্রিয় আলোকো** যস্য সঃ; পক্ষে প্রিয়ালোকস্য মহিলাজনস্য। **লোচনানন্দো** যস্মাৎ সঃ। **অন্যত্র**; দ্বীপান্তরে। পক্ষে অন্যস্যার্থে। ক্ষপিতা শর্ব্বরী যেন সঃ। **নভসো ভূষণম্**; পক্ষে পরস্ত্রীদত্তনখভূষণম্ [প্রাকৃতে **ণহভূষণ** কথাটির সংস্কৃত আকার দুই প্রকার—**নভোভূষণ** ও **নখভূষণ**]। **দিনপতে নমস্তে**। ভাস্বানিব দূরাদেব অভিবন্দনীয়স্ত্বং, ন তু অভিগম্য ইত্যর্থঃ।"...[**দিনপতি** শব্দটিতেও ব্যঙ্গ্যোক্তি রহিয়াছে; দিনপতি সূর্য্যের আখ্যা এবং যে নায়ক প্রত্যূষে নায়িকার কাছে যায়, সে যথার্থই দিন-পতি।]

অনুভূতঃ করস্পর্শঃ সকলকলাপূর্ণ পূর্ণদিবসে।
দ্বিতীয়াসঙ্গকৃশাঙ্গ ইদানীং তব বন্দামহে চরণৌ॥

"**করাঃ** কিরণাঃ, পক্ষে করো হস্তঃ। **সকলকলাভিঃ** ষোড়শকলাভিঃ **পূর্ণঃ**, পক্ষে চতুঃষষ্টিকলাভিঃ পূর্ণঃ। **পুণ্ণদিবসে** পূর্ণিমাদিবসে, পক্ষে পুণ্যদিবসে [প্রাকৃতে **পুণ্ণ** শব্দটির সংস্কৃত আকার দুই প্রকার—**পূর্ণ** ও **পুণ্য**]। **দ্বিতীয়া** তিথিঃ, পক্ষে দ্বিতীয়া স্ত্রী। তস্যাঃ **সঙ্গেন কৃশাঙ্গঃ**।"

এই ধরণের ব্যঙ্গ্যোক্তি বা শ্লেষ গাথাসপ্তশতীর অনেক গাথাতেই পাওয়া যায়। আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

লঙ্কালআণঁ পুত্তঅ বসন্তমাসেক্কলদ্ধপসরাণম্।
আপীঅলোহিআণং বিহেই জণো পলাসাণম্॥ ৪।১১॥

অর্থাৎ, সংস্কৃত আকারে—

লঙ্কালয়ানাং পুত্রক বসন্তমাসৈকলব্ধপ্রসরাণাম্।
আপীতলোহিতানাং বিভেতি জনঃ পলাশানাম্॥

টীকাকার বলেন,—

"**পলাশানাম্** ইতি শেষবিবক্ষয়া পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী। পলাশেভ্যঃ কিংশুকপুষ্পেভ্যো বধূজনো **বিভেতি** ইত্যর্থঃ। অথ চ **পলং** মাংসম্ **অশ্নন্তি** ভক্ষয়ন্তি ইতি **পলাশাঃ** রাক্ষসাঃ। তেভ্যো জনো **বিভেতি** ইতি শ্লেষঃ। পুষ্পপক্ষে **লঙ্কা** শাখা, পক্ষে রাক্ষসনগরী।······তথা [রাক্ষসপক্ষে ছায়া] **বসান্ত্রমাংসৈক-লব্ধপ্রসরাণাম্** [প্রাকৃতের **বসন্তমাসেক্কলদ্ধং** সংস্কৃত দুই রকম হয়—**বসন্তমাসৈকলব্ধং** ও **বসান্ত্রমাংসৈকলব্ধং**]। পুষ্পপক্ষে **আ** ঈষৎ **পীত**বর্ণানি চ তানি **লোহিতানি** চ; [রাক্ষস পক্ষে] **আ** সমন্তাৎ **পীতং লোহিতং** রুধিরং যৈস্তেষাম্। বসন্তসূচকপলাশকুসুমভীতা তব গমনং নাঙ্গীকরোতীতি ভাবঃ।"

গাথাসপ্তশতীর গাথাগুলির রচনারীতি ও সমাবেশ-পদ্ধতি কিছু কিছু বোঝা গেল। এখন ৫ম শতকের তিনটি গাথার আলোচনা করা যাইতেছে।

আবণ্ণাই কুলাই দো বিবঅ জাণন্তি **উণ্ণইং ণেউং**।
গোরীঅ হিঅদইও অহবা সালাহণণরিন্দো॥ ৬৭॥

ণিক্কণিক্কন্ধ দুরারোহং পুত্তঅ মা **পাডলিং সমারুহসু**।
আরুঢ়ণিবডিআ কে ইমীঅ ণ কআ হআসাএ॥ ৬৮॥

গামণিঘরম্মি অত্তা এক্কবিবঅ **পাডলা** ইহগ্গামে।
বহুপাডলং চ সীসং দিঅরস্স ণ সুন্দরম্ এঅম্॥ ৬৯॥

এই তিনটি গাথাই পরস্পর সংবদ্ধ। ২য় ও ৩য় গাথার মধ্যে যোগশব্দ **পাডলা** বা **পাডলি** ১ম গাথার **উণ্ণইং ণেউং** (সং—উন্নতিং নেতুম্) এবং ২য় গাথার **সমারুহসু** একার্থ-দ্যোতক। গাথানুক্রমণিকায় ইহার কোনটিকেই হালের বিরচিত বলা হয় নাই। তবে তিনটিকে যে সপ্তশতীর সম্পাদক এইরূপ ভাবে পরে পরে সাজাইয়াছেন, এটা ধরিয়া লওয়া যায়। প্রথমটি টীকাকারের মতে হালের কোন চাটুকারের রচনা—শালিবাহনং নৃপং মহেশ্বরসদৃশং কৃত্বা কশ্চিৎ

সচাটু বর্ণয়তি। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য। গাথাটির অর্থ হইতেছে এই—"**আবণ্ণ** কুলের উন্নতি সাধন করিতে পারেন কেবল দুই জন; এক গৌরীর হৃদয়-দয়িত (শিব), আর এক শালিবাহন রাজা।"

এখানে **আবণ্ণই**ঁ শব্দে শ্লেষ আছে; সংস্কৃতে এইটির রূপ দুই রকম হইতে পারে, **আপন্নানি** ও **আপর্ণানি**। 'অপর্ণা' গৌরীর অপর নাম। অপর্ণার ভক্তদের এবং আপন্নকুলের উন্নতিসাধক মহেশ্বর ও শালিবাহন রাজা। এই কথা বলা শালিবাহনের অনুজীবীর পক্ষেই শোভা পায়। হাল ছিলেন শৈব। সপ্তশতীর প্রারম্ভেই মহাদেবের স্তুতি আছে। হালের সঙ্গে তাঁহার প্রিয় দেবতার সাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা যে সফল হইবে, এটা খুবই আশা করা যায়। কাজেই দেখা গেল যে, এই গাথাটি হালের সমসাময়িক রচনা। এবং যেহেতু তিনটি গাথাই হাল এইরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং তিনটিকেই হালের সমসাময়িক রচনা বলিয়া স্বীকার করা উচিত।

এখন দ্বিতীয় গাথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা যাইতেছে। আমার মনে হয়, এখানে পাটলি-পুত্রের উল্লেখ আছে। নতুবা **পুত্তঅ** আর **পাডলি** এই দুইটি শব্দ এত কাছাকাছি দেওয়া হইল কেন? শুধু তাহাই নয়; **পুত্তঅ** অর্থাৎ **পুত্রকের পাডলি** অর্থাৎ **পাটলির** উপর আরোহণ করার কথা রহিয়াছে। বেবরের একটি আদর্শে এই গাথার দ্বিতীয় পংক্তিতে **হআসাএ**-র স্থানে **ইহগ্‌গামে**; এই পাঠটি মূল পাঠ হইলে ত শ্লেষটা এই একটি গাথা হইতেই ধরা যায়। কিন্তু বেবর ঠিকই বলিয়াছেন যে, **ইহগ্‌গামে** পাঠটি পরের গাথার প্রথম পংক্তি হইতে লিপিকারপ্রমাদ-বশতঃ হইয়াছে। তবে পরের গাথাটি যখন ইহার সঙ্গে সংবদ্ধ, তখন তাহাতে **ইহগ্‌গামে** থাকায় বোঝা যায়, পাটলিপুত্রের পূর্ব্বনাম পাটলি-গ্রামের কথা এখানে অন্তত ধ্বনির সাহায্যে উল্লিখিত। গাথাটিকে সংস্কৃতরূপ দিলে হয়,—

নিঃস্কন্ধ * দুরারোহাং পুত্রক মা পাটলিং সমারোহ।
আরূঢ়নিপতিতাঃ কে অনয়া ন কৃতাঃ হতাশয়াঃ॥

ণিঃস্কন্ধদুরারোহামিতি। স্কন্ধং লঙ্ঘনম্ বিনা দুরারোহাম্। ব্যাকরণনিয়মস্য লঙ্ঘনং কল্পিতম্। **পুত্রক**পদমত্র সম্বোধিতম্, "মা পাটলিশব্দম্ সমারোহ" ইতি। পাটলিপুত্রক-

* গঙ্গাধর **ণিক্কণ্ড** পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কাণ্ডংস্কন্ধোঽবসরশ্চ। কাণ্ড ও স্কন্ধ যে কেবল একার্থবোধক, তাহা নহে; এই দুইটি শব্দ সম্ভবতঃ মূলত এক। লাটিনে Scendo = I ascend; এবং স্কন্ধ শব্দ স্কন্দ-ধাতু হইতে উৎপন্ন, এ কথা বৈয়াকরণেরা স্বীকার করেন।

পদস্য দ্বাবেবার্থৌ ব্যাকরণে পরিলক্ষ্যতে। পাটলিপুত্রস্য রাজা তত্র ভবো বা পাটলিপুত্রকঃ। পুত্র-শব্দাৎ পুত্রকশব্দম প্রাগেব লব্ধ্বা পশ্চাৎ পাটলিশব্দেন সমাসঃ ব্যাকরণনিয়মলঙ্ঘনং বিনা ন সিধ্যতীত্যাশয়ঃ। **আরূঢ়নিপতিতা** ইতি ইহ শব্দানাং প্রকারভেদ উচ্যতে। সন্তি শব্দানি রূঢ়ানি, নিপাতনে চ সিদ্ধানি। **আ সীমায়াম্**। কে ইতি; কঃ শব্দম্। কশব্দস্য সপ্তম্যা একবচনম্ **কে**। **অনয়া** নিষেধবাচা। **হতাশয়া** নিরর্থকাঃ।

বাংলায় গাথাটির অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়,—

"ওহে পুত্রক! তুমি 'পাটলি'-র উপর আরোহণ করিও না। (ব্যাকরণের নিয়ম) না লঙ্ঘন করিয়া ওরূপ আরোহণ দুঃসাধ্য। এই নিষেধের দ্বারা কোন শব্দই—এমন কি, রূঢ় ও নিপাতনে সিদ্ধ শব্দও নিরর্থক হয় না।"

গাথাটির শৃঙ্গাররসাত্মক ব্যাখ্যাও করা যায়। এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত আকার একটু বিভিন্ন হইবে,—

নিঃস্কন্ধদুরারোহাং পুত্রক মা পাটলিং সমারোহ।
আরূঢ়নিপতিতাঃ কে অনয়া ন্যক্কৃতা হতাশয়া॥

ব্যাখ্যা।— নিঃস্কন্ধদুরারোহামিতি। স্কন্ধেন বিনা দুরারোহাম্; স্কন্দয়তি রেত ইতি স্কন্ধঃ। রেতঃপাতেন বিনা ন সুখারোহাম্। **পাডলিং** পাটলীম্, পাটলা পার্ব্বত্যাঃ নামান্তরম্, স্ত্রিয়াম্ আপ্ ঈপ্ চ। **আরূঢ়নিপতিতা** ইতি। **আরূঢ়াৎ** মহেশ্বরাৎ **নিপতিতাঃ** স্খলিতাঃ; রেতাংসীত্যর্থঃ। অসন্তক্লীবলিঙ্গশব্দস্য প্রাকৃতে অকারান্তপুংলিঙ্গ-শব্দবদ্ভাবঃ। **কে** অগ্নৌ জলে বা। **অনয়া** পাটল্যা **ণ কয়া** ন্যক্কৃতা নিক্ষিপ্তা ইত্যর্থঃ। **হতাশয়া** ইতি; সুরতসুখনষ্টয়া।

মহাদেব বহুকাল পার্ব্বতী-রমণে ব্যাপৃত থাকায় দেবতারা অগ্নিকে সংবাদ লইতে পাঠাইলেন। অগ্নির উপস্থিতিতে হর-গৌরীর রতি-ক্রীড়ার ব্যাঘাত ঘটিল। মহাদেব রুষ্ট হইয়া পার্ব্বতীর প্ররোচনায় অগ্নির মুখে স্বীয় স্খলিত রেতঃ নিক্ষেপ করিলেন। তীব্র জ্বালা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য অগ্নি মহাদেবের কাছে মিনতি করায় মহাদেব অবশেষে বলিলেন, "যাও, ভাগীরথীতে আমার ত্যক্ত তেজ সন্নিধাপিত কর, শান্তি পাইবে।" গঙ্গার জলে সেই ন্যক্কৃত বীর্য্য স্নানশীলা ষট্‌কৃত্তিকায় সংক্রামিত হওয়ার ফলে কার্ত্তিকেয় জন্মলাভ করিলেন। কার্ত্তিকেয়ের অপর নাম স্কন্দ। স্কন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু আখ্যান আছে। স্কন্দ যুদ্ধের দেবতা। সাতবাহন রাজাদের মধ্যে স্কন্দের প্রভূত সম্মান ছিল। পুরাণে হালের পূর্ব্ববর্ত্তী সাতবাহন রাজাদের মধ্যে **স্কন্দস্তম্ভী, স্কন্দস্বাতী,** এই দুটি নাম পাওয়া যায়। প্রথম পুলোমা ও তাঁহার পিতার নাসিক ও তৎসন্নিহিত স্থানের শিলালিপিতে

শিবস্কন্দ গুপ্ত নামক একটি অমাত্যের কথা পাওয়া যায়। হালের সমসাময়িক কুষাণরাজ কণিষ্কের মুদ্রায় **স্কন্দ-কুমারের** নাম আছে। পরবর্ত্তী কালেও গুপ্তসম্রাট্‌দের মধ্যে **স্কন্দগুপ্ত, কুমারগুপ্ত** নাম দৃষ্ট হয়।

পাটলিপুত্রের উল্লেখের সঙ্গে স্কন্দের জন্মকথা সংশ্লিষ্ট থাকার একটি বিশেষ কারণ আছে। পাটলিপুত্র নগরটি শোণনদ ও গঙ্গানদীর সঙ্গমে অবস্থিত। নদ ও নদীর সংযোগ পুংস্ত্রীসংযোগের মত কল্পিত হওয়া স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া, শোণের অপর নাম হিরণ্যবাহ, এবং মহাদেবেরও একটি নাম হিরণ্যবাহু। সুতরাং হিরণ্যবাহ নদের জল গঙ্গায় পতিত হওয়া, আর হিরণ্যবাহু শিবের বীর্য্য গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হওয়া, এই দুইটি ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য উপলব্ধি করা শ্লেষভক্ত কবির পক্ষে স্বাভাবিক।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

শিল্পশাস্ত্র

প্রাচীন ভারতে যে সকল বিদ্যার আলোচনা হইত, তাহার মধ্যে শিল্পবিদ্যা বা শিল্পশাস্ত্র একটি। দুঃখের বিষয়, যে সকল শিল্পশাস্ত্রের উল্লেখ নানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই এখন বিদ্যমান নাই। নানা কারণে সেই সব শিল্পশাস্ত্রের লোপ হইয়াছে।

প্রাচীন কালে যে সকল শিল্পশাস্ত্রকার ছিলেন, মৎস্যপুরাণে তাঁহাদিগকে 'বাস্তুশাস্ত্রোপদেশক' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহাদের সংখ্যা ১৮ যথা,—(১) ভৃগু, (২) অত্রি, (৩) বশিষ্ঠ, (৪) বিশ্বকর্ম্মা, (৫) ময়, (৬) নারদ, (৭) নগ্নজিৎ, (৮) বিশালাক্ষ, (৯) পুরন্দর, (১০) ব্রহ্মা, (১১) কুমার, (১২) নন্দীশ, (১৩) শৌনক, (১৪) গর্গ, (১৫) বাসুদেব, (১৬) অনিরুদ্ধ, (১৭) শুক্র ও (১৮) বৃহস্পতি। মৎস্যপুরাণে আমরা পাই,—

ভৃগুরত্রির্বসিষ্ঠশ্চ বিশ্বকর্মা ময়স্তথা।
নারদো নগ্নজিচ্চৈব বিশালাক্ষঃ পুরন্দরঃ॥ ১॥
ব্রহ্মা কুমারো নন্দীশঃ শৌনকো গর্গ এব চ।
বাসুদেবোঽনিরুদ্ধশ্চ তথা শুক্রো বৃহস্পতিঃ॥ ২॥
অষ্টাদশৈতে বিখ্যাতা বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকাঃ।

এখানে যে ১৮ জন 'বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকে'র কথা বলা হইল, তাঁহাদের রচিত সকল শাস্ত্রের নামও পাওয়া যায় না, শাস্ত্রের অস্তিত্ব বর্ত্তমানে খুঁজিয়া পাওয়া ত দূরের কথা। তবে অগ্নি-পুরাণে আমরা ২৫খানি শিল্প বা বাস্তুশাস্ত্রের উল্লেখ পাই। অগ্নিপুরাণে আছে,—

প্রোক্তানি পঞ্চরাত্রাণি সপ্তরাত্রাণি বৈ ময়া॥ ১॥
ব্যক্তানি মুনিভির্লোকে পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া।
হয়শীর্ষং তন্ত্রমাদ্যং তন্ত্রং ত্রৈলোক্যমোহনম্॥ ২॥
বৈভবং পৌষ্করং তন্ত্রং প্রহ্লাদং গার্গ্যগালবম্।
নারদীয়ঞ্চ সংপ্রশ্নং শাণ্ডিল্যং বৈশ্বকং তথা॥ ৩॥
সত্যোক্তং শৌনকং তন্ত্রং বাসিষ্ঠং জ্ঞানসাগরম্।
স্বায়ম্ভুবং কাপিলং চ তার্ক্ষ্যং নারায়ণীয়কম্॥ ৪॥

আত্রেয়ং নারসিংহাখ্যমানন্দাখ্যং তথারুণম্।
বৌধায়নং তথার্ষন্ত বিশ্বোক্তং তস্য সারতঃ॥ ৫॥
অগ্নিপুরাণম্, ৩৯ অঃ।

অতএব অগ্নিপুরাণে আমরা ২৫খানি শিল্প বা বাস্তুশাস্ত্রের উল্লেখ পাইতেছি। যথা,—

(১) পঞ্চরাত্র
(২) সপ্তরাত্র
(৩) হয়শীর্ষতন্ত্র
(৪) ত্রৈলোক্যমোহনতন্ত্র
(৫) বৈভবতন্ত্র
(৬) পৌষ্করতন্ত্র
(৭) নারদীয়তন্ত্র
(৮) শাণ্ডিল্যতন্ত্র
(৯) বৈশ্বকতন্ত্র
(১০) শৌনকতন্ত্র
(১১) জ্ঞানসাগরবাশিষ্ঠতন্ত্র
(১২) প্রহ্লাদতন্ত্র
(১৩) গালবতন্ত্র
(১৪) গার্গ্যতন্ত্র
(১৫) স্বায়ম্ভুবতন্ত্র
(১৬) কপিলতন্ত্র
(১৭) তার্ক্ষ্যতন্ত্র
(১৮) নারায়ণীতন্ত্র
(১৯) আত্রেয়তন্ত্র
(২০) নারসিংহতন্ত্র
(২১) আনন্দতন্ত্র
(২২) আরুণতন্ত্র
(২৩) বৌধায়নতন্ত্র
(২৪) আর্যতন্ত্র
(২৫) বিশ্বোক্ততন্ত্র।

অগ্নিপুরাণের তালিকায় যে ২৫খানি শিল্প বা বাস্তুশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের অধিকাংশই এখন পাওয়া যায় না। কতকগুলি গ্রন্থের নাম হইতে মনে হয় যে, সেগুলি তাহাদের লেখকের নাম অনুসারে পরিচিত, যেমন—নারদীয়তন্ত্র। সুতরাং অগ্নি-পুরাণের তালিকার সহিত মৎস্যপুরাণের তালিকা তুলনা করিলে আমরা কতকগুলি নামের মিল পাই, যেমন,—

(১) আত্রেয়তন্ত্র ... রচয়িতা অত্রি
(২) জ্ঞানসাগর-বাশিষ্ঠতন্ত্র ... " বশিষ্ঠ
(৩) নারদীয়তন্ত্র ... " নারদ
(৪) শৌনকতন্ত্র ... " শৌনক
(৫) গার্গ্যতন্ত্র ... " গর্গ
(৬) বিশ্বোক্ততন্ত্র ... " বিশ্ব (কর্ম্মা)।

দুঃখের বিষয়, এই সকল শিল্প বা বাস্তুশাস্ত্র এখন আর পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে নানা কারণে পুথি অধিকদিন বর্ত্তমান থাকে না। অনেক সময় অগ্নি ও কীটে নষ্ট

হইয়াছে, আবার অনেক সময় মুসলমান আক্রমণেও নষ্ট হইয়াছে। যে সকল বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকের উল্লেখ পাওয়া গেল, তাঁহাদের যেসব গ্রন্থ ছিল, সেইগুলি হইতে অন্যান্য লেখকেরা সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন—'মনুষ্যালয়চন্দ্রিকা'তে বিশ্বকর্ম্মা ও কুমারের নামের উল্লেখ পাই। তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে উক্ত গ্রন্থের লেখক সাহায্য লইয়াছেন। বরাহমিহির তাঁহার 'বৃহৎসংহিতা'য় আচার্য্য গর্গের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বকর্ম্মা ও ময়েরও মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—

"সার্দ্ধং হস্তত্রয়ং চৈব কথিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥"

বৃহৎসংহিতা, ৫৬ অঃ, ২৯।

আর, "ময়কথিতো যোগোহয়ং বিজ্ঞেয়ো বজ্রসংঘাতঃ॥"

বৃহৎসংহিতা, ৫৭ অঃ, ৮।

বিশ্বভারতী লাইব্রেরীতে 'বাস্তুপ্রকরণম্' নামে যে পুথি আছে, তাহাতে গৌতম, গর্গ ও বিশ্বকর্ম্মাকে 'বাস্তুবিদ্যাবিশারদ' বলা হইয়াছে। যথা,—

বিশ্বকর্ম্মাদিভিশ্চৈব বাস্তুবিদ্যাবিশারদৈঃ।
সর্ব্বেষাং যৎকৃতং শাস্ত্রং সারমুদ্ধৃত্য যত্নতঃ॥ ২॥

অগ্নিপুরাণে 'আত্রেয়তন্ত্রে'র উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ইহাই কি 'প্রতিমালক্ষণম্'? এতদিন পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে, 'প্রতিমালক্ষণম্' পুস্তকের মূল নাই, ইহার কেবল তিব্বতী অনুবাদ আছে; কিন্তু সম্প্রতি ইহার সংস্কৃত মূল নেপাল হইতে পাওয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নেপাল দরবার হইতে ইহা আনাইয়াছেন। 'প্রতিমালক্ষণম্' আমি মূল সংস্কৃত ও তিব্বতী অনুবাদের সহিত সম্পাদন করিয়াছি। এই বইটি অত্রিমুনির লেখা বলিয়া উল্লেখ আছে; সুতরাং এই বই ও অগ্নিপুরাণে উক্ত 'আত্রেয়তন্ত্র' একই বই কি?

বর্ত্তমানে যে সকল শিল্প বা বাস্তুশাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বইগুলিই প্রধান,—

(১) বাস্তুবিদ্যা
(২) মনুষ্যালয়চন্দ্রিকা
(৩) ময়মতম্
(৪) শিল্পরত্নম্
(৫) সমরাঙ্গণসূত্রধার।

ইহা ছাড়া, নিম্নলিখিত বইগুলিতেও শিল্প বা বাস্তুশাস্ত্রের আলোচনা আছে,—

(১) বৃহৎসংহিতা
(২) যুক্তিকল্পতরু
(৩) বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশম্
(৪) মৎস্যপুরাণম্
(৫) অগ্নিপুরাণম্
(৬) গরুড়পুরাণম্
(৭) ভবিষ্যপুরাণম্।

ফণীন্দ্রনাথ বসু

তিব্বতী ভাষায় শিল্পশাস্ত্র

তিব্বতী ভাষায় ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র এখনও বর্ত্তমান আছে—ইহা শুনিলে অনেকে বোধ হয়, আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। কিন্তু সুখের বিষয়, তিব্বতী ভাষায় এমন অনেক সংস্কৃত বই আছে, যাহাদের মূল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যখন খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হয়, তখন হইতে অনেক ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রও তিব্বতী ভাষায় অনুবাদিত হয়। সেই অনুবাদের ফলে তিব্বতী ভাষায় (১) কাঞ্জুর ও (২) তাঞ্জুর নামে দুই বিরাট্ বিশ্বকোষ আছে। কাঞ্জুর বিশ্বকোষে পালি ভাষা হইতে প্রধানতঃ বৌদ্ধশাস্ত্রের তিব্বতী অনুবাদ আছে ও তাঞ্জুরে বৌদ্ধ তান্ত্রিক শাস্ত্র ছাড়া আরও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পুস্তকের অনুবাদ আছে, যেমন—ব্যাকরণ, রাজনীতি, শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতি।

তিব্বতী ভাষায় আমরা নিম্নলিখিত শিল্পশাস্ত্রগুলি পাই,—

(১) চিত্রলক্ষণম্।

(২) প্রতিমামানলক্ষণম্।

(৩) ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলবুদ্ধভাষিতপ্রতিমালক্ষণম্।

(৪) সম্যক্‌সম্বুদ্ধবুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম।

এই কয়খানি বইএর মধ্যে 'চিত্রলক্ষণম্' বইখানির একটি জার্ম্মান সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

তিব্বতী ভাষায় 'চিত্রলক্ষণম্'

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে Berthold Laufer তিব্বতী ভাষার মূল ও জার্ম্মান অনুবাদ সহ 'চিত্রলক্ষণম্' প্রকাশিত করিয়াছেন।[১] ইহার মূল সংস্কৃত এখনও পাওয়া যায় নাই।

বৌদ্ধ বিশ্বকোষ তাঞ্জুরে 'চিত্রলক্ষণম্' স্থান পাইয়াছে দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, ইহার লেখকও বোধ হয় বৌদ্ধ ছিলেন বা ইহা বৌদ্ধ প্রতিমার চিত্র সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা তাহা নহে। নগ্নজিৎ ইহার লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ। মৎস্যপুরাণে নগ্নজিৎকে 'বাস্তুশাস্ত্রোপদেশক' বলা হইয়াছে। বরাহমিহিরও তাঁহার 'বৃহৎসংহিতায়' (৫৮ অঃ) নগ্নজিতের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন ও তাঁহার মতকে 'দ্রাবিড়' মত বলিয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, নগ্নজিতের বাড়ী ছিল দক্ষিণ দেশে।

---

১ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকাগারে এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ আছে।

যদিও 'চিত্রলক্ষণম্' বৌদ্ধ বিশ্বকোষে স্থান পাইয়াছে, তথাপি ইহার প্রারম্ভে ভগবান্ বুদ্ধের নাম বা তাঁহার প্রতি প্রণামের কথা আমরা পাই না। বরং আমরা দেখি যে, 'চিত্রলক্ষণম্'-এর লেখক হিন্দু দেবদেবীদের প্রণাম করিতেছেন, যেমন (১) মহাদেব, (২) ব্রহ্মা, (৩) নারায়ণ, ও (৪) সরস্বতী। ইহা ছাড়া (৫) চন্দ্র, (৬) ইন্দ্র, (৭) সূর্য্য, (৮) বরুণ, (৯) অগ্নি ও (১০) বায়ুকে প্রণামের কথা পাই।

Laufer সাহেব অনুমান করেন যে, 'চিত্রলক্ষণে'র লেখক নগ্নজিৎ জৈন। কিন্তু গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি যে ভাবে হিন্দু দেবদেবীকে প্রণাম আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে জৈন বলিয়া মনে হয় না।

নগ্নজিৎ তাঁহার 'চিত্রলক্ষণম্' গ্রন্থে চিত্রবিদ্যার উৎপত্তির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, চিত্রের মান ও তালের কথাও বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থে আমরা বিশ্বকর্ম্মা ও প্রহ্লাদের উল্লেখ পাই। দেবতাদিগকে প্রণামের পর গ্রন্থকার বিশ্বকর্ম্মা ও নগ্নজিৎকে প্রণাম করিয়াছেন। ইহার পরই গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা, প্রহ্লাদ ও নগ্নজিৎ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারাংশ আমি সংগ্রহ করিয়াছি।"

আবার কিন্তু প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে বলা হইয়াছে,—"ইতি নগ্নজিৎকৃতে চিত্রলক্ষণে নগ্নব্রতো নাম প্রথমপরিচ্ছেদঃ।"

এখন প্রশ্ন হইতেছে,—নগ্নজিৎ কি এই চিত্রলক্ষণের লেখক? যদি তিনিই লেখক হন, তবে আবার গ্রন্থকার নগ্নজিৎ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারাংশ কেন সঙ্কলন করিতেছেন? যদি 'চিত্রলক্ষণে'র লেখক বলিয়া নগ্নজিৎকে ধরিতে হয়, তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্ব্বে আর একজন নগ্নজিৎ জন্মিয়াছিলেন, যাঁহার রচনা হইতে বর্ত্তমান গ্রন্থে সার সঙ্কলন করা হইয়াছে।[২]

প্রতিমামানলক্ষণম্

তিব্বতী ভাষায় দ্বিতীয় শিল্পগ্রন্থ—'প্রতিমামানলক্ষণম্'। ইহার সংস্কৃত মূল নেপাল দরবার লাইব্রেরীতে পাওয়া গিয়াছে। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নেপাল দরবার হইতে বিশ্বভারতী লাইব্রেরীর জন্য ইহার প্রতিলিপি আনয়ন করিয়াছিলেন। আমি সংস্কৃত মূল ও তিব্বতী অনুবাদ সহ এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছি। ইহা লাহোরে ছাপা হইয়াছে। ইহার প্রারম্ভে আছে,—"নমো বুদ্ধায়।" আর তিব্বতী অনুবাদে

২ এই গ্রন্থের আরম্ভে (১০-২৯) গ্রন্থকার, নগ্নজিৎ ও অন্যান্য চিত্রশাস্ত্ররচয়িতার চরণ-বন্দনা করিয়াছেন, সুতরাং নগ্নজিৎ এই গ্রন্থের প্রণেতা নহেন।

আছে,—"নমঃ সর্ব্বজ্ঞায়।" গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"যৎ উক্তং পূর্ব্বমুনিভিঃ" তাহার সারাংশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে প্রতিমার ভিন্ন ভিন্ন মাপ দেওয়া হইয়াছে, যেমন—সপ্ততাল, অষ্টতাল, নবতাল ও দশতালের মাপ।

কিন্তু পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের A Catalogue of Palm Leaf and Selected Paper Mss. belonging to the Durbar Library, Nep l, ২য় খণ্ডে আর একটি 'প্রতিমা-লক্ষণ'-এর উল্লেখ পাই। তাহার আরম্ভ এইরূপ,—

"লক্ষণঞ্চ প্রবক্ষ্যামি নরাণাং হিতকাম্যয়া।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ সংক্ষেপেণ তু বিস্তরাৎ॥" (পৃ ১৯০)

ইহা কিন্তু উক্ত 'প্রতিমামানলক্ষণম্' গ্রন্থের সহিত মেলে না। ইহা 'লক্ষণসমুচ্চয়ে'র অংশবিশেষ ও উক্ত গ্রন্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়।

ইহা ব্যতীত শাস্ত্রী মহাশয়ের Catalogue-এ একই নামের আরও দুইখানি পুথির উল্লেখ পাই, তাহাদের নাম—'দেবপ্রতিমালক্ষণম্'। তাঁহার Catalogue-এর দ্বিতীয় ভাগের ৪১শ পৃষ্ঠায় একটির বর্ণনা ও প্রারম্ভ এইরূপ আছে,—

'দেবপ্রতিমালক্ষণম্' পুথি

"নমো বুদ্ধায়।

বুদ্ধো ভগবান্ জেতবনে বিচরতি স্ম। তুষিতবরভবনাৎ সাস্তর্ধানাদেশসমবগত—কালসময়ে শারিপুত্রো ভগবন্তমেতদবোচৎ। ভগবন্ ভগবতা গতে পরিনির্বৃতে বা শ্রাদ্ধৈঃ কুলপুত্রৈঃ কথং প্রতিপত্তব্যম্।

ভগবানাহ শারিপুত্র ময়ি গতে পরিনির্বৃতে বা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলং কায়ং কর্ত্তব্যম্। * * *"

তাঁহার Catalogue এ (১৩৭ পৃষ্ঠায়) 'দেবপ্রতিমালক্ষণম্' নামের অপর পুথিখানির আরম্ভ এইরূপ,—

"ওঁ নমো বুদ্ধায়।

বুদ্ধো ভগবান্ জেতবনে বিহরতি স্ম। তুষিতবরভবনাৎ মাতুর্ধানাদশনাবগতকালসময়ে * * শারিপুত্রো ভগবন্তমেতদেবাহেতি * * *

ভগবানাহ।

শারিপুত্র ময়ি গতে পরিনির্বৃতে বা।

ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলং কায়ং কর্ত্তব্যং যাবৎ কায়ং তাবৎ ব্যামং যাবৎ ব্যামং তাবৎ কায়ং পূজা-সৎকারার্থং প্রতিমা কর্ত্তব্যা। ইত্যাদি। সংবৎ ৭৬৩।"

ইহা ছাড়া, বেণ্ডেলের Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts-এ (পৃ ২০০) আমরা 'বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম্' পুথির পরিচয় পাই। তাহাতে প্রারম্ভ এইরূপ,—

"বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম্। A short treatise in two parts on images of Buddha, probably more or less in imitation of Varahamihira's work.

'বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম্' পুথি

The work is in regular sutra-form, beginning

নমঃ সর্ব্বকায় ॥ এবং ময়া শ্রুতং * * *

Sariputra enquires thus of Bhagavan :—

ভগবন্ ভগবতা বিনা শ্রাদ্ধৈঃ কুলপুত্রৈঃ কথং প্রতিপত্তব্যং।

To which the reply is :—ময়ি গতে পরিনির্বৃতে বা। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলং যাবৎ কায়ং তাবৎ ব্যোমং যাবৎ ব্যোমং তাবৎ কায়ং। পূজা-সৎকারার্থাং প্রতিমা কারয়িতব্যা।"

ইহার সমাপ্তি এইরূপ,—

"এতানি চ সমস্তানি লক্ষণানি বিচক্ষণঃ।
অত্যন্তশান্তকায়ার্থং যথাশোভং প্রকল্পয়েৎ॥

ইদমবোচৎ······অভ্যনন্দন্নিতি॥ সম্যক্‌সম্বুদ্ধভাষিতং বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণং সমাপ্তং॥"

ইহার পরে বেণ্ডেল সাহেব যে পুথির বিবরণ দিয়াছেন, তাহার নাম—'প্রতিমালক্ষণবিবরণম্।' ইহাকে পূর্ব্বলিখিত পুথির টীকা বলা হইয়াছে। ইহার শেষে লিখিত আছে,—"ইতি সংবুদ্ধভাষিত-প্রতিমালক্ষণবিবরণং সমাপ্তং।"

তাহা হইলে আমরা অনেকগুলি পুথি পাইতেছি, যাহাদের নাম ও বিষয়বস্তু লইয়া কিছু আলোচনা করা দরকার। প্রথম আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের Catalogue-এ নামগুলি পাইতেছি,—

(১) প্রতিমালক্ষণ—'লক্ষণসমুচ্চয়' হইতে।
(২) দেবপ্রতিমালক্ষণম্ } এ দুইটি একই বই মনে হয়।
(৩) দেবপ্রতিমালক্ষণ }

বেণ্ডেল সাহেবের তালিকায় পাইতেছি,—

(১) বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম্—ইহার শেষে কিন্তু "সম্যক্‌সম্বুদ্ধভাষিতং-বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণং" নাম আছে।
(২) প্রতিমালক্ষণবিবরণম্—ইহারও শেষে আছে, "সংবুদ্ধভাষিত-প্রতিমালক্ষণবিবরণং।"

এখন দেখা যাইতেছে যে, ইহার মধ্যে প্রথম তালিকার 'দেবপ্রতিমালক্ষণ' ও দ্বিতীয় তালিকার 'বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম্' একই বই।

কিন্তু ইহার তিব্বতী অনুবাদ—'প্রতিমামানলক্ষণম্'-এর সহিত মিলে না। যদিও উক্ত গ্রন্থ দুইটির নামে 'প্রতিমালক্ষণ'যুক্ত আছে, তাহা হইলেও ইহা তিব্বতী 'প্রতিমামানলক্ষণম্' হইতে ভিন্ন। বরং এই দুইটির মিল আছে, অন্য একটি বইয়ের সহিত, যাহাকে তিব্বতী অনুবাদে 'দশতলন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম্' বলা হইয়াছে। আমরা যে সংস্কৃত পুথি পাইয়াছি, তাহা উক্ত তিব্বতী অনুবাদের সহিত মিলে। ঐ সংস্কৃত পুথির আরম্ভ এইরূপ,—

'দশতলন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম্'

"নমো বুদ্ধায়।

বুদ্ধো ভগবান্ জেতবনে বিহরতি স্ম।

তুষিতবরভবনাৎ মাতুর্ধর্মদেশনাবগতকালসময় শারিপুত্রো ভগবন্তমেতদবোচৎ। ভগবন্ ভগবতাগতে পরিনির্বৃতে বা শ্রাদ্ধৈঃ কুলপুত্রৈঃ কথং প্রতিপত্তব্যম্।

ভগবানাহ॥ শারিপুত্র ময়ি গতে পরিনির্বৃতে বা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলকায়ং কর্ত্তব্যম্।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইহা পূর্বোক্ত প্রথম তালিকার 'দেবপ্রতিমালক্ষণম্' ও দ্বিতীয় তালিকার 'বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম্'। কিন্তু ইহাকেই তিব্বতী অনুবাদে বলা হইয়াছে,—"ভারতীয় ভাষায় (ইহাকে) দশতলন্যগ্রোধপরিমণ্ডলবুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম্ (বলে)।"

এই তিব্বতী অনুবাদের সহিত যে নেপালী সংস্কৃত পুথিটি মিলে ও যাহা হইতে উপরে উদ্ধৃত অংশ দেওয়া হইল, তাহা এখন বিশ্বভারতী লাইব্রেরীতে আছে। সেই সংস্কৃত পুথির শেষে কিন্তু বইটিকে বলা হইয়াছে,—"ইতি সম্যক্‌সংবুদ্ধভাষিতং প্রতিমালক্ষণং সমাপ্তম্।"

অতএব বিশ্বভারতী লাইব্রেরীর পুথিটির সহিত বেণ্ডেল সাহেবের তালিকার 'বুদ্ধপ্রতিমা-লক্ষণম্'-এর মিল পাওয়া যাইতেছে। ইহাকেও গ্রন্থ-শেষে 'সম্যক্‌সংবুদ্ধভাষিতং বুদ্ধপ্রতিমা-লক্ষণং' বলা হইয়াছে। ইহাতে কেবল 'বুদ্ধ' শব্দটি বেশী আছে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, তিব্বতী অনুবাদক সংস্কৃত গ্রন্থের নামটি 'সম্যক্‌সংবুদ্ধভাষিতং বুদ্ধপ্রতিমা-লক্ষণং' ব্যবহার না করিয়া তিব্বতী অনুবাদে 'দশতলন্যগ্রোধপরিমণ্ডলবুদ্ধভাষিতপ্রতিমালক্ষণম্' নামটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং 'সম্যক্‌সম্বুদ্ধভাষিত-বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম্' নামটি অপর তিব্বতী অনুবাদে দিয়াছেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে,

(১) বেণ্ডেল সাহেবের তালিকার

'বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম্'—(যাহাকে সমাপ্তিতে 'সম্যক্‌সম্বুদ্ধভাষিতং বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণং' বলা হইয়াছে)

(২) শাস্ত্রী মহাশয়ের তালিকার

'দেবপ্রতিমালক্ষণম্'

(৩) বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের

'সম্যক্‌সম্বুদ্ধভাষিতং প্রতিমালক্ষণম্'

(৪) তিব্বতী তাঞ্জুরের

'দশতলন্যগ্রোধপরিমণ্ডলবুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম্'

—এই সকলের নাম বিভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ একই শিল্পগ্রন্থ। একই শিল্পগ্রন্থের নাম কিরূপে বিভিন্ন হইল, তাহা বলা শক্ত। বোধ হয়, ইহার নাম প্রথমে ছিল—'সম্যক্‌-সম্বুদ্ধভাষিতং প্রতিমালক্ষণম্', পরে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ইহার নাম বিভিন্ন হইয়াছে।

এই বইতে আমরা প্রথমেই পাইতেছি—"নমো বুদ্ধায়।" আর তিব্বতী অনুবাদে আছে—"ভগবতে বীতরাগায় নমঃ।" ইহাতে মনে হয় যে, লেখক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। আর পুস্তকের বিষয়ও বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণ।

এই গ্রন্থে আমরা শারিপুত্রের উল্লেখ পাই। তিনিই ভগবান্ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"ভগবন্, ভগবতা গতে পরিনির্বৃতে বা শ্রাদ্ধৈঃ কুলপুত্রৈঃ কথং প্রতিপত্তব্যম্।"

ইহার উত্তরে ভগবান্ বুদ্ধ বলিতেছেন,—"শারিপুত্র, ময়ি গতে পরিনির্বৃতে বা **ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলকায়ং** কর্ত্তব্যম্।"

এইখানে আমরা সর্ব্বপ্রথম "**ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলকায়**" কথাটি পাইতেছি। বোধ হয়, তিব্বতী অনুবাদকের এই কথাটি ভাল লাগিয়াছিল, তাই তিনি গ্রন্থের নামকরণে **ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল** কথাটি **বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণের** সহিত লাগাইয়া দিয়াছেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে শারিপুত্র খুব প্রসিদ্ধ। অনেক বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। সিংহল দ্বীপে একখানি শিল্পগ্রন্থ আছে, তাহার নাম—'সারিপুত্রশ্রমণ-বিম্বপ্রমাণম্'। এই গ্রন্থখানির উল্লেখ ডাক্তার কুমারস্বামীর গ্রন্থ Mediaeval Sinhalese Art-এ আছে। সিংহলী শিল্পীমহলে এই বইখানির খুব প্রচলন আছে। ইহার প্রথম খণ্ড সিংহলী অক্ষরে ছাপা হইয়াছে।

সিংহলী শিল্পগ্রন্থ—'সারিপুত্র-শ্রমণ-বিম্বপ্রমাণম্'

এই সিংহলী শিল্পশাস্ত্রের আরম্ভ এইরূপ,—

"নমস্তস্মৈ ভগবতে অর্হতে সম্যক্‌সম্বুদ্ধায়।
অথেদানীং সংপ্রবক্ষ্যামি বিম্বমানবিধিং শৃণু।"

ইহার সমাপ্তিতে এইরূপ আছে,—

"ইতি গৌতমবংশে শারিপুত্রশ্রমণো বিম্বপ্রমাণম্ প্রথমো খণ্ডং সমাপ্তম্।"

প্রাচীন কালে ভারতে বহু শিল্পগ্রন্থের প্রচার ছিল। ভারতীয় শিল্পীদের কাছে সেই সব শিল্পগ্রন্থের আদর ছিল। তখনকার কালে শিল্পীরা শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত ছিলেন না। তাঁহারা নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী হওয়া যেমন তাঁহাদের পক্ষে দরকার ছিল, নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হওয়াও তেমনি দরকার ছিল। নানা কারণে প্রাচীন ভারতীয় শিল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে এখনও যাঁহারা শিল্পী আছেন, তাঁহারা যত্ন করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের শিল্প-পুথি রাখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখন তাঁহারা সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী নন বলিয়া, তাঁহারা সেই সব শিল্প-পুথির সদ্ব্যবহার করিতে পারেন না। উড়িষ্যায়, দক্ষিণ-ভারতে ও গুজরাট অঞ্চলে এখনও এইরূপ অনেক শিল্পী আছেন। তাঁহারা এখনও পুরাণ পুথি লইয়া নাড়াচাড়া করেন।

কতক শিল্প-পুথি নেপালে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। প্রাচীন ভারতের নানা বিদ্যাবিষয়ক পুথি এতদিন যাবৎ নেপালে বহু পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। এ বিষয়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পূজনীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সম্পাদিত গ্রন্থ-তালিকা হইতে আমরা নেপাল দরবার লাইব্রেরীর ঐশ্বর্য্য বুঝিতে পারি। যে সকল শিল্প-পুথি এতদিন লুপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাও এখন নেপালে আবিষ্কার হইতেছে। এই প্রসঙ্গে 'প্রতিমামানলক্ষণ' ও অন্যান্য শিল্প-পুথির কথা উল্লেখযোগ্য। সেই পুথিগুলি আবার অনুবাদ আকারে তিব্বতী তাঙ্গুর বিশ্বকোষে স্থান পাইয়াছে। চীনা ভাষায়ও নাকি বুদ্ধপ্রতিমা সম্বন্ধে শিল্পগ্রন্থ আছে। সিংহল দ্বীপেও আমরা "সারিপুত্রশ্রমণো বিম্বপ্রমাণম্" গ্রন্থ পাইতেছি। এইরূপে ভারতীয় (culture) সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রও ভারতের বাহিরে নানাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে শিল্পবিদ্যার আলোচনা আবার সুরু হইয়াছে। ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি এখন এদিকে পড়িয়াছে। দক্ষিণ-ভারত হইতে অনেকগুলি শিল্পগ্রন্থ আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব গ্রন্থের অনেকগুলি স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী প্রকাশিত করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এ বিষয়ে সর্ব্ব প্রথম (Ram Raz) রাম রাজ তাঁহার Essay on the Architecture of the Hindus গ্রন্থে পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার উক্ত গ্রন্থ লণ্ডন হইতে ১৮৩৪ অব্দে প্রকাশিত হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থেও এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। জার্মান পণ্ডিত Laufer-এর 'চিত্রলক্ষণের' কথা আগেই বলা হইয়াছে। ডাক্তার কুমারস্বামীর Mediaeval Sinhalese

Art-এর কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের গোপীনাথ রাও তাঁহার Element of Hindu Iconography-তে অনেকগুলি দক্ষিণী শিল্পশাস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী তাঁহার 'রূপম্' পত্রিকার দ্বারা ভারতীয় শিল্প-কথার প্রচার করিতেছেন। তাঁহার South Indian Bronzes-ও এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রূপদক্ষ আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ না করিলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার চিত্র, বক্তৃতা ও পুস্তকের দ্বারা ভারতীয় শিল্পের কথা আমাদের কাছে বার বার ব্যাখ্যা করিতেছেন। সে জন্য তিনি সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন। পরিশেষে ডক্টর প্রসন্নকুমার আচার্য্যের কথা উল্লেখ করিব। তিনি শিল্পশাস্ত্রের বিরাট্ অভিধান সঙ্কলন করিয়া ও 'মানসার' সম্পাদন করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

ফণীন্দ্রনাথ বসু

নবাবিষ্কৃত সচিত্র বঙ্গীয় তালপত্র-লিখিত বৌদ্ধপুথির বিবরণ

পর্ব্বত-গুহা ও মন্দির-ভিত্তিতে চিত্রিত আলেখ্যসমূহ ব্যতীত সচিত্র তালপত্রে অঙ্কিত বৌদ্ধ হস্তলিপিগুলি ভারতীয় চিত্র-বিদ্যার ইতিহাসের প্রাচীন উপকরণ বা দলীল। তিন শতাব্দী ধরিয়া চিত্র-বিদ্যার কিরূপ চর্চ্চা হইতেছিল, ঐগুলি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চিত্র-বিদ্যার ঐ উপকরণগুলিই কেবল বর্ত্তমান আছে। কুমারস্বামী[১] লিখিয়াছেন,— "জলন্ত বর্ণ ও অতি পরিপাটি অঙ্কনে এই চিত্রিকাগুলিকে সৌন্দর্য্য-বিদ্যার অতি চিত্তাকর্ষক বস্তু ও দুষ্প্রাপ্য হিসাবে এই পুথিগুলিকে বহু মূল্যবান্ করিয়াছে।"

সুতরাং চিত্র-বিদ্যার ইতিহাস অবগত হইতে গেলে, এই সচিত্র হস্তলিপিগুলির ধারাবাহিক আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আলোচ্য উপকরণগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,— (ক) সচিত্র বঙ্গীয় হস্তলিপি, (খ) সচিত্র নেপাল হস্তলিপি।

সৌন্দর্য্য-বিদ্যার উৎকর্ষ হিসাবে যে সমস্ত পুথি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে দুইটি হস্তলিপি তত আলোচ্য নহে। এতদ্ব্যতীত তালপত্রে সচিত্র সকল হস্তলিপিগুলিই অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বঙ্গীয় হস্তলিপিগুলি নবম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিত এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত নেপালে লিখিত আরও কতকগুলি হস্তলিপি আছে। নেপালে রচিত অত্যুৎকৃষ্ট দুইটি সচিত্র হস্তলিপি (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৪৩ নং ও এশিয়াটিক সোইটির এ১৫ নং) যথাক্রমে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ও শেষে লিখিত হইয়াছিল। তালপত্রে লিখিত সচিত্র প্রধান হস্তলিপিগুলির ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে, যখন বৌদ্ধধর্ম্ম নেপালে বিস্তৃত হইতেছিল, তখন ভারতভূমিতে লিখিত ঐ লিপিগুলি তথায় নীত হয়; আবার সেগুলিকে গত শত বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষে পুনরায় আনয়ন করা হয়। এই প্রবন্ধ-লেখকের আবিষ্কৃত যতগুলি মূল্যবান্ পুথি আছে, তন্মধ্যে ঐরূপ একটি সচিত্র হস্তলিপি ১৩৩৪

---

১ Coomaraswamy A. K., Introduction to Indian Art, পৃ ১১০।

বঙ্গাদের প্রারম্ভেই নেপাল হইতে আনয়ন করা হয় এবং উহার মধ্যবর্ত্তী চিত্রিকাগুলি অত্যাশ্চর্য্যরূপে সুরক্ষিত রহিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে ধরিতে গেলে, এগুলি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা শ্রেণীভুক্ত। ঐ হস্তলিপি দশম অথবা একাদশ শতাব্দীতে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করেন যে, উহা বঙ্গের বিক্রমশীলায় লিখিত। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ৬৯০২ নং হস্তলিপি উহারই অনুরূপ। ভারতবর্ষীয় চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধীয় লেখকগণ এই মূল্যবান্ হস্তলিপিগুলির আদৌ উল্লেখ করেন নাই এবং উহাদের যথোপযুক্ত সমালোচনা করিতে অক্ষম হইয়াছেন। M. Foucher শ্রীযুক্ত ফুশেই প্রথমে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে চিত্র-বিদ্যা পর্য্যালোচনার প্রস্তাবে এই হস্তলিপিসমূহের আলেখ্যগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ চিত্রসমূহের আলোচনায় তাঁহার তাদৃশ সহৃদয়তা ও মর্য্যাদা রক্ষণেচ্ছা প্রকাশ পায় নাই—যাহাতে চিত্র-বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণ আনন্দে উদ্দীপিত হইতে পারে। ঐ চিত্রিকাগুলির রচয়িতাগণ কি ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, উহা বুঝিবার প্রয়াস তাঁহার পক্ষে বিষম কঠিন হইয়াছিল। সুতরাং ঐ সকলের বিচারে তাঁহার সমালোচনা কঠোর ও অনুপযুক্ত হইয়াছে। সৌন্দর্য্য হিসাবে ঐ চিত্রগুলির কিরূপ মূল্য, তিনি তাহা সংক্ষেপে এইরূপে সারিয়া দিয়াছেন,—

'En résumé, nos miniatures, sans être des chefs d'oeuvre, ne sont pas non plus de vulgaires barbouillages et ont été désinées et peintes par des enlumineurs très suffisamment maêtres de leurs moyens. Dans toutes nous retrouvons les mêmes matériaux employés, les mêmes conventions acceptées, les mêmes procédés d'execution mis au service des mêmes sujets. Ni la difference d'age ni la diversité d'origine n'arrivent à modifier sensiblement leur apparence générale. C'est assez dire que nous devons reconnaître en elles les productions d'un art des longtemps stéréotypé.'[২]

হ্যাভেল[৩] মহোদয় প্রাথমিক নেপাল চিত্র-বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তালপত্রে লিখিত

---

২ Foucher, A, Etude sur l' Iconographie Bouddhique de l' Inde, ১৯০০, পৃ ৩৬-৩৭।

৩ Havell, E., B., Indian Sculpture & Painting, ১৯০৮, পৃ ৭৯; 2nd Edition, ১৯২৮ পৃ ৭৭।

নেপাল বা বঙ্গীয় হস্তলিপির বিষয় কিছুই বলেন নাই। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ মহোদয়[৪] নেপালের দুইটি হস্তলিপির ক্ষুদ্র চিত্রের উল্লেখ করিয়া বলেন,—"নেপালের চিত্র-বিদ্যার অতি প্রাচীন শাখা-ভুক্ত ঐ চিত্রগুলি মাত্র বিদ্যমান আছে—"। সৌন্দর্য্য-বিদ্যা হিসাবে তিনি ঐ চিত্রগুলি তাদৃশ উল্লেখযোগ্য বা আবশ্যক বিবেচনা করেন না। কিন্তু সামান্য সংজ্ঞায় অভিহিত করিলে, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের দিক্ দিয়া উহারা মূল্যবান্ এবং ফুশে মহোদয়ের সমালোচনায় সম্পূর্ণ নির্ভর করতঃ তিনি ঐগুলির রচনা-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তিনি যে একটিও এই শ্রেণীর চিত্র পরীক্ষা করিতে মনোনিবেশ করেন নাই, তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তালপত্র-লিখিত হস্তলিপিসমূহের প্রয়োজনীয়তা ভ্রেডেনবুর্গ মহোদয়ই সর্ব্বপ্রথমে দর্শাইয়াছেন; কিন্তু তিনি ঐগুলি অসঙ্গতরূপে ভারতবর্ষীয় চিত্র-বিদ্যার ধারাবাহিক উন্নতির অন্তর্গত করিয়াছেন।[৫]

সম্প্রতি কুমারস্বামী[৬] ও সোয়ামুরা[৭] সচিত্র কতকগুলি হস্তলিপির উল্লেখ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের তালিকা সম্পূর্ণ নহে।

সৌন্দর্য্য-বিদ্যা হিসাবে নিম্নলিখিত হস্তলিপিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(১) বস্‌টন্ মিউজিয়ামস্থিত হস্তলিপি, (২) লেখকের আবিষ্কৃত হস্তলিপি, (৩) ভ্রেডেনবুর্গের পূর্ব্বাধিকৃত হস্তলিপি, (৪) বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির অধিকৃত Ms. A15 নং হস্তলিপি। ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র শেষোক্ত হস্তলিপিই নেপালে লিখিত। অন্যান্য ক্ষুদ্র চিত্র-সংবলিত তালপত্রে লিখিত হস্তলিপি সৌন্দর্য্যের তুলনায় উহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ফুশে মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, সত্য বটে যে, এই সকল হস্তলিপির রচনা-প্রণালী ও বিষয়গুলির বিশেষত্ব সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান আছে; তথাপি চিত্রিকাগুলির সজীবতা ও বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাব—ইহা বলা অত্যুক্তি মাত্র। হস্তলিপির বিষয়সমূহ আলেখ্য সাহায্যে দর্শাইতে গেলে বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাব অপরিহার্য্য; কিন্তু হস্তলিপিসমূহের সাধারণ আকৃতির সমতা এই চিত্রিকা-বিদ্যার প্রাচীনত্বেরই পরিচায়ক। ফুশে মহোদয়ের মতের বিবেচনা প্রসঙ্গে তালপত্রে লিখিত হস্তলিপিসমূহের সমসাময়িক একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বাইজানটাইন চিত্র-বিদ্যার

---

৪ Smith, V. A., History of Fine Art in India & Ceylon, ১৯১১, পৃ ৩২৪।

৫ Vredenburg, E., Continuity of Pictorial Tradition in Indian Art, Rupam, Nos. 1-2, ১৯২০ পৃ ৭-১১।

৬ Coomaraswamy, A. K., Introduction to Indian Art, ১৯২৩, পৃ ১১০।

৭ Sawamura, S., The miniatures of a recently discovered Buddhistic Sanskrit Manuscript, Ostasiatische Zeitschrift, ১৯২৬, পৃ ১১-২৩।

প্রধান মনীষীর সমালোচনা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এই বিদেশীয় ক্ষুদ্র চিত্রগুলি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "Toutes les matrones ressemblant á Sainte Anne, les hommes à Saint Joseph"[৮]

সমসাময়িক ইতালীয় ক্ষুদ্র চিত্রগুলির নিকৃষ্ট পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না।[৯]

আমার আবিষ্কৃত হস্তলিপির উপর নির্ভর করিয়া এক্ষণে আমি এই ক্ষুদ্র চিত্র-বিদ্যার সাধারণ প্রকৃতি কিরূপ, তাহা বর্ণন করিব। কুমারস্বামী[১০] তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষায় যেরূপ বলিয়াছেন, "এই ক্ষুদ্র চিত্রগুলি হস্তলিপির একাঙ্গীভূত বা ভূষণস্বরূপ নহে। লিপিকর হস্তলিপির কোন অংশে যে স্থান শূন্য রাখিয়া গিয়াছেন, চিত্রকর উহা চিত্রে ভূষিত করিয়াছেন"। তালপত্রে লিখিত হস্তলিপিগুলির আয়তন ২৩×২$\frac{৩}{৪}$ এবং ক্ষুদ্র চিত্রের পরিমাণ ২$\frac{৩}{৪}$×২$\frac{১}{২}$। এরূপ ক্ষুদ্র চিত্রের সংখ্যা বিংশতি। চিত্রকর সম্পূর্ণ দুই বিভিন্ন আদর্শে চিত্র রচনা করিয়াছেন। এক দিকে তিনি বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী চিত্রিত করিয়াছেন এবং অপর দিকে সে সময়ে পরবর্ত্তী তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মে যে সজীব শক্তি ছিল, উহার বহুসংখ্যক দেবদেবী চিত্রিত করিয়াছেন। এই সকল চিত্রিকার রচনা-পদ্ধতি সুন্দর হস্তাক্ষরের ন্যায় বর্ণের সাহায্যে। অঙ্কনগুলি অতি সুস্পষ্ট এবং ভঙ্গুর ও কোমল তালপত্রে বিন্যস্ত রেখা ও বর্ণের সৌন্দর্য্য সামান্য স্তুতিবাদের বিষয় নহে। চিত্রকর অগ্রে মূর্ত্তিগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন এবং তৎপরে তদুপরি নানা বর্ণ বিন্যস্ত করিয়াছেন। এইরূপে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত চিত্রগুলি লোহিতবর্ণে রেখা টানিয়া অঙ্কিত, পীত ও শ্বেতবর্ণেও তদ্রূপ; কিন্তু কৃষ্ণবর্ণে রেখা টানিয়া হরিদ্বর্ণের চিত্রগুলি রঞ্জিত করিয়াছেন। মূর্ত্তিগুলির অঙ্কনে আয়তনের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে। এই চিত্রসমূহের উল্লেখযোগ্য ও সাধারণ প্রকৃতি ভ্রেডেনবুর্গ মহোদয় যেরূপ দেখাইয়াছেন, তাহা বিবৃত করা যাইতেছে,—"মূর্ত্তিগুলির অধোদৃষ্টি যাহাতে পরিস্ফুট দেখাইতে পারে, তদুদ্দেশে মুখের উপরিস্থ চক্ষুঃ আবরণের মধ্যভাগে কয়েকটি নিম্নগামী সূক্ষ্ম কোণের রচনা করা হইয়াছে"[১১] ইহাকে 'পদ্মপলাশ' নয়ন বলিয়া অভিহিত করা যায়। স্থপতি-বিদ্যায় ত্রিপত্রের ভূষণ যেরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, মূর্ত্তি অঙ্কনে ঐ রূপ ঐ বিদ্যা হইতেই গৃহীত। এই চিত্রসমূহে পদ্মপত্রাকার উল্লেখযোগ্য। জ্যামিতির বা পশ্বাদির প্রতিরূপ (যেমন হরিণাদির) লিপিসমূহের পার্শ্বের এবং অধ্যায়ের

৮ Diehl, C., L'art byzantin., T. I, পৃ ৩৮৪-৮৫।

৯ D'Aancona, P., La miniature Italienne, ১৯২৬, পৃ ৪।

১০ Coomaraswamy, A. K., Introduction to Indian Art, পৃ ১১০-১১।

১১ Vredenburg, E., *op. cit.*, পৃ ১০।

শেষের ভূষণস্বরূপ হইয়াছে। পরিচ্ছদাদির ও দৃশ্যাবলীর চিত্র হইতে সমসাময়িক জীবন ও আচার-ব্যবহারের প্রকৃত ও চিত্তাকর্ষক আভাস পাওয়া যায়। রচনাগুলি সাধারণতঃ বড়ই উৎকৃষ্ট ; লেখক ও চিত্রকর উভয়েরই নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। হস্তলিপিসমূহে অগ্রে জমি করিয়া লইয়া বর্ণ-বিন্যাস হইয়াছে কি না, ইহা এখন পর্য্যন্তও কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু সম্ভবতঃ তাহাই হইয়া থাকিবে। বর্ণগুলির গভীরতা, নির্ম্মলতা ও ঔজ্জ্বল্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, পরবর্ত্তী কাগজের উপর চিত্রিকায় যেরূপ সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ মিশ্রিত করা হইত, তাহা এ স্থলে হয় নাই।

ধাতুজাত বর্ণই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত। মদীয় আবিষ্কৃত লিপিগুলিতে লোহিত, পীত, কৃষ্ণ, শ্বেত এবং হরিদ্বর্ণ দেখা যায়। ঐ লিপিতে চিত্রকর বেগুণী নীলবর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, বরং তৎপরিবর্ত্তে কোবাল্ট-ধাতুজাত একপ্রকার বিশুদ্ধ নীলবর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। ভ্রেডেনবুর্গ মহোদয়ের লিপিতে একপ্রকার নীল বড়ির রং ব্যবহৃত হইয়াছে। চিত্রিকা-রচয়িতাগণ হরিতালের সাহায্যে পীতবর্ণ, পারদ-রসসিন্দূর সাহায্যে লোহিতবর্ণ ও কোবাল্ট-ধাতুর বা নীল বড়ির সাহায্যে প্রস্তুত নীলবর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। Ms. A15 নং লিপিতে lapis lazuli নামক গাঢ় নীলবর্ণের প্রস্তর-বিশেষ হইতে প্রস্তুত বর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভ্রেডেনবুর্গের মতে সফেদা হইতে প্রস্তুত রং শ্বেতবর্ণের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু জলের সাহায্যে প্রস্তুত সফেদা লিপিতে ব্যবহারের সফলতা সন্দেহজনক।

সম্ভবতঃ চীনামাটি বা খড়ির সাহায্যে শ্বেতবর্ণ প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষীয় মসীর সাহায্যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তুত হইত। রক্তগৈরিক মৃত্তিকা, স্বর্ণমৃত্তিকা বা লাজবর্দ্দীনোল কদাপি ব্যবহৃত হইত না। মানুষের মুখ রঞ্জিত করিবার জন্য পীতবর্ণই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত ; কিন্তু হরিৎ ও শ্বেতবর্ণের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। চিত্রকরগণ বর্ণ-প্রস্তুতকরণে অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ক্ষণস্থায়ী পীত ও সিন্দূররাগের স্থায়িত্বের গূঢ় রহস্য তাঁহারাই জানিতেন। প্রতীচ্য চিত্রকরগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াছিলেন। চিত্রিকাগুলির বর্ণের সজীবতা বহু শতাব্দী পরেও লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে।

মদধিকৃত তালপত্রের হস্তলিপির চিত্রিকাগুলির অঙ্কন ও বর্ণবিন্যাস উভয়ই অতি সুন্দর। মুখাকৃতিসমূহের ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট, দৃষ্টির ভাব ও উপবেশনাদিব্যঞ্জক ভাব অতীব সুন্দর। চিত্রিকাগুলির সূক্ষ্ম-সরল ও মর্য্যাদা-সংবলিত সংযত ভাব অতিপ্রশংসনীয়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর দৃশ্য অঙ্কনে অজ্ঞাত বৌদ্ধসন্ন্যাসী চিত্রকর নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ভিত্তি-চিত্রের ন্যায় চিত্রগুলি অতিমর্য্যাদা-সম্পন্ন করিতে হইবে, এরূপ ভাবে প্রণোদিত হইলে, চিত্রকরের ভবিষ্যতের আশা বিফল হইত। Ms. A15 নং হস্তলিপির দৃশ্যাবলী ঘনসম্বদ্ধ। সশিষ্য বুদ্ধদেবের চিত্রখানির জগন্ত ভাব ও সুন্দর হস্তাক্ষর-রেখার অঙ্কন কেবল বঙ্গীয় লিপিসমূহের প্রকৃতি এবং

উহা নেপালে অঙ্কিত হইলেও নেপালের অন্যান্য হস্তলিপি অপেক্ষা বঙ্গীয় লিপির সহিত ইহার অধিক সৌসাদৃশ্য আছে দেখা যায়।

উপসংহারে বলা বাহুল্য, এই চিত্রিকাগুলি ঐ যুগের চিত্র-বিদ্যার রুচির পরিচায়ক। তারনাথ মহাশয়ের মতে এই সকল চিত্রিকা হইতেই আমরা সে সময়ে বর্ত্তমান অধিকতর শ্রেষ্ঠ ভিত্তি-চিত্রের আভাস পাই। কিন্তু সমসাময়িক ভিত্তি-চিত্রগুলি যেরূপ লোপ পাইয়াছে, অতি মূল্যবান্ হস্তলিপিসমূহের চিত্রিকাগুলি চিত্রবিদ্যানুরাগী মাত্রেই অবিনশ্বর সুন্দর বস্তু বলিয়া সুরক্ষিত করিবেন।

শ্রীঅজিত ঘোষ

হিন্দুজ্যোতিষের আদিকাল নির্ণয়

জ্যোতিঃ বলিতে আলোক বুঝায়। চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া যে শাস্ত্রে ইহাদের বিষয় অবগত হওয়া যায়, সেই শাস্ত্রকে জ্যোতিষ বলে।

জ্যোতিষ্কগণের আকাশে স্থানবিশেষে অবস্থান হইতে মানবগণের শুভাশুভ নির্ণায়ক শাস্ত্রকেও জ্যোতিষ বলে। এই দ্বিতীয় সংজ্ঞাত্মক শাস্ত্রকে বর্ত্তমানে Astrology বা ফলিত-জ্যোতিষ নাম দেওয়া হইয়াছে। আর প্রথম সংজ্ঞাত্মক বিষয়কে Astronomy বা শুধু জ্যোতিষ বলা হয়। এই নাম প্রথমে ছিল না, অল্পকাল হইল হইয়াছে। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জ্যোতিষকে গণিত-জ্যোতিষ ও ফলিত-জ্যোতিষ এই দুই ভাগে প্রকৃত পক্ষে ভাগ করা হইয়াছে বলা চলে; অবশ্য ইহা পাশ্চাত্যে। আমাদের ভারতবর্ষে জ্যোতিষের এইরূপ ভাগ নাই, ছিলও না। তবে জ্যোতিষকে তিন স্কন্ধে ভাগ করা হইয়াছিল, "সিদ্ধান্তসংহিতাহোরারূপস্কন্ধত্রয়াত্মকম্" (নারদ); অর্থাৎ সিদ্ধান্ত, সংহিতা এবং হোরা এই তিন অংশে জ্যোতিষ বিভক্ত ছিল; কিন্তু পৃথক্ নাম ছিল না। জ্যোতিষ বলিতে ঐ তিনটি একত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে বুঝাইত। বরাহমিহির তাঁহার 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থে (১৷৯) এই ত্রিস্কন্ধ কি এবং কোন্ স্কন্ধে কি কি বিষয় আছে, তাহা পরিস্ফুটরূপে বলিয়া গিয়াছেন,—

> "জ্যোতিঃশাস্ত্রমনেকভেদবিষয়ং স্কন্ধত্রয়াধিষ্ঠিতং
> তৎকার্ৎস্ন্যোপনয়স্য নাম মুনিভিঃ সংকীর্ত্ত্যতে সংহিতা।
> স্কন্ধেঽস্মিন্ গণিতেন যা গ্রহগতিস্তন্ত্রাভিধানস্ত্বসৌ
> হোরান্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়শ্চ কথিতঃ স্কন্ধস্তৃতীয়োঽপরঃ॥"

বরাহমিহির সিদ্ধান্তকে তন্ত্র নাম দিয়াছেন। আধুনিকেরা "পঞ্চস্কন্ধমিদং শাস্ত্রং হোরাগণিত-সংহিতাঃ। কেরলিঃ শকুনশ্চৈব" (ইতি প্রশ্নরত্নটীকা) বলিয়া ত্রিস্কন্ধ স্থানে পাঁচ স্কন্ধ করিয়াছেন। অবশ্য কেরলি ও শকুনকে একরূপ হোরার অন্তর্গতই ধরিতে হইবে। এখানে গণিত পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত বা তন্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই জ্যোতিষ-শাস্ত্র আমাদের বেদাঙ্গের অন্তর্ভূত—

"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাংগণঃ।
ছন্দোবিচিতিরিত্যেতৈঃ ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে॥"

আবার বেদের এই ছয়টি অঙ্গের মধ্যে জ্যোতিষ শ্রেষ্ঠ।—

"যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গশাস্ত্রানাং গণিতং মূর্দ্ধি সংস্থিতম্॥"

বেদাঙ্গ জ্যোতিষম্, ৪র্থ শ্লোক।

এই জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে নারদ বলিয়াছেন,—

"বেদস্য নির্ম্মলং চক্ষুর্জ্যোতিঃশাস্ত্রমকল্মষম্।"

আবার সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ে এই কথাই বলিতেছে,—

"বেদচক্ষুঃ কিলেদং স্মৃতং জ্যোতিষম্।"

সুতরাং জ্যোতিষ যে হিন্দুদের প্রধান শাস্ত্র এবং তাহার সম্মান যে কত, তাহা আর বেশী বলা আবশ্যক করে না।

পাশ্চাত্য দেশে Astronomer এবং Astrologer এই দুই নাম আছে। আমাদের দেশে এখন ঐ অনুকরণে ঐরূপ নাম-করণ হইয়াছে। কিন্তু সেকালে এক জ্যোতিষী বা জ্যোতির্বিদ্ ছাড়া অন্য নাম ছিল না। আর আজকালকার মত যে-সে জ্যোতিষী হইতেও পারিত না। তখন জ্যোতিষীর সংজ্ঞা ছিল,—

"হোরাশাস্ত্রসমুদ্রপারগমনে নূনং সমর্থো মহান্
পাটাখ্যে গণিতে চ বীজগণিতে যো দর্ভগর্ভাগ্রধীঃ।
সিদ্ধান্তে স্ফুটবাসনাপ্রকথনে ভেদৈরনেকৈর্যুতে
গোলে স্যাৎ কুশলঃ স এব গণকো যোগ্যঃ ফলাদেশকে॥"

শম্ভুহোরাপ্রকাশ।

জ্যোতিষীকেই গণক বলা হয়। সমগ্র অঙ্ক-শাস্ত্র জ্যোতিষের অন্তর্গত। যাঁহার গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ সম্যক্ আয়ত্ত হইত, তিনিই গণক বা জ্যোতিষী হইতেন। এই জন্য দেখা যায় যে, বরাহমিহির আধুনিকদিগের মধ্যে যিনি একজন অন্যতম প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন, তাঁহারও গণিত-জ্যোতিষের ও ফলিত-জ্যোতিষের গ্রন্থ আছে। ইহা ব্যতীত আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক

ঋষিদিগের লুপ্ত গ্রন্থের যে অবশিষ্টাংশ বর্ত্তমান, তাহাতে জ্যোতিষের তিন স্কন্ধেরই বিষয় পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জ্যোতিষ বলিতে সেকালে গণিত ও ফলিত একত্র বুঝাইত। মিসর ও বাবিলন এই দুই প্রাচীন দেশে ফলিত-জ্যোতিষের সন্ধান আছে। (Petosiris) পেটোসিরিস মিসরীয় জ্যোতিষী বলিয়া লোকের ধারণা ছিল; কিন্তু (Hogarth) হগার্থ সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ইনি প্রকৃতপক্ষে বাবিলনীয়। আর ফলিত-জ্যোতিষ সম্বন্ধে Tablets of Sargon I of Agade (আগাদের রাজা প্রথম সারগণের ফলকাবলী) নামক যে লেখা পাওয়া যায়, তাহা খ্রীঃ পূঃ ৩৮০০ বৎসরের। এই লেখই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। শনি গ্রহের gloominess বা বিমর্ষ স্বভাব, তাহাও নাকি ঐ সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ৩৮০০-তে) কাল্‌দিয়েরা অনুধাবন করিয়াছিল। গ্রীকেরা জ্যোতিষের সহিত দর্শন মিলাইয়াছিল। রোমানরা ধর্ম্ম ও ঔষধের সহিত জ্যোতিষের সম্বন্ধ ঘটাইয়াছিল। কিন্তু মিসরীয়েরা বাবিলনের প্রবীণ সিদ্ধান্তকে বাদ দিয়া জ্যোতিষের সহিত Magic বা ইন্দ্রজালবিদ্যার যোগ করিয়াছিল। মিসর হইতেই বাবিলনের গণিত ও ফলিত-জ্যোতিষ পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রচার হইয়াছিল, কাল্‌দিয়ার জ্যোতিষচর্চ্চার অনেক প্রমাণ আছে। জ্যোতিবিদ্যায় কাল্‌দিয়া মিসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। গ্রীকেরা মিসরীয়দিগের নিকট হইতে এই বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা স্বীকার করে। রোমানরা বাবিলন হইতে গণিত ও ফলিত-জ্যোতিষ পাইয়াছে বলিয়া জানা যায়। বাবিলনীয়গণ আমাদের ন্যায় সূর্য্যোদয় হইতে দিন ধরিত। মিসরীয়েরাও তাহাই ধরিত। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, বাবিলনের নিকট হইতে মিসরীয়েরা সূর্য্যোদয় হইতে দিন গণনা করা জানিয়াছে। কিন্তু রোমানরা বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্যের ন্যায় মধ্যরাত্র হইতেই দিন গণনা করিত।

খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর হইতে হিন্দুদিগের পঞ্জিকার প্রচলন, ইহাই সাধারণ্যে প্রকাশ[১]। বর্ত্তমানে আমাদের বাঙ্গালা দেশে যে পঞ্জিকা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার মতে বর্ত্তমান বর্ষে (১৩৩৯ বঙ্গাব্দে বা ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে) কলেগতাব্দা ৫০৩৩। তাহা হইলে খ্রীঃ পূঃ ৩১০১ বৎসর পূর্ব্ব হইতে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার সহিত দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্যযুগের স্থিতিকাল যোগ করিলে আমাদের সভ্যতার ইতিহাস অনাদি কালের বলিয়া ধরিতে হয়। এক্ষণে আমাদের পুরাণাদির নির্দ্দিষ্ট যুগের হিসাব না ধরিয়া অন্য নিয়মে আমাদের জ্যোতিষকে কতদূর পুরাতন বলিতে পারি, তাহা দেখা যাউক। বর্ত্তমান কালে বর্ত্তমান শিক্ষায় আমরা পুরাণের ভাবে

---

১ বিশ্বকোষ, ৭ম খণ্ড, 'জ্যোতিষ' নামক প্রবন্ধ, পৃ ২৭৩, ; হিন্দী বিশ্বকোষ, ৮ম ভাগ পৃ ৬২৬।

ভাবিতে শক্তিমান্ নই, আর বিশ্বাস করিতেও চাহিনা। আমরা সকল বিষয়েরই বর্ত্তমানের উপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রমাণ চাই। এখন প্রমাণ-পথে কি পাই, তাহাই দেখি।

পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় বর্ত্তমান কালোপযোগী ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, খ্রীঃ পূঃ ১৪৭৫ বৎসরে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল। আর মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ১৫১২ খ্রীঃ পূঃ বৎসরে (এখন হইতে ৩৪৪৪ বৎসর পূর্ব্বে) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর হইতেই হিন্দুদিগের অবনতির যুগ। মহাভারতের মধ্যে রামায়ণের উপাখ্যান পাওয়া যায়। ঐ উপাখ্যান যে বেশ পুরাতন, তাহাও বুঝা যায়।

ফলিত-জ্যোতিষ গণিত জ্যোতিষের মুখাপেক্ষী। বরাহমিহির বলিয়াছেন যে, পৌলিশ-রোমক-বাসিষ্ঠ-সৌর-পৈতামহ এই পঞ্চসিদ্ধান্ত এবং জ্যামিতিক ক্ষেত্রবিভাগে ব্যুৎপত্তি না হইলে ফলিত-জ্যোতিষের সম্যক্ জ্ঞানলাভ হয় না। এই ফলিত-জ্যোতিষের কথা রামায়ণেও আছে। রাম প্রভৃতি চারি ভ্রাতার জন্মবৃত্তান্ত ও জাতচক্র সম্বন্ধে এইরূপ পাওয়া যায়,—

[রাম বিষয়ে]

ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ঋতূনাং ষট্ সমত্যয়ুঃ।
ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ॥
নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু।
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্‌পতাবিন্দুনা সহ॥
প্রোদ্যমানে জগন্নাথং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।
কৌশল্যাজনয়দ্রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম্॥
বিষ্ণোরর্দ্ধং মহাভাগং পুত্রমৈক্ষ্বাকুনন্দনম্।
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং রক্তোষ্ঠং দুন্দুভিস্বনম্॥
কৌশল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা।
যথা বরেণ দেবানামদিতির্বজ্রপাণিনা॥

আদিকাণ্ডে অষ্টাদশসর্গ, ১৮-১২।

[ভরত বিষয়ে]

ভরতো নাম কৈকেয্যাং জজ্ঞে সত্যপরাক্রমঃ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগঃ সর্ব্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ॥১৩॥
পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ॥১৫॥

[লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন বিষয়ে]

অথ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রাঽজনয়ৎ সুতৌ।
বীরৌ সর্ব্বাস্ত্র-কুশলৌবিষ্ণোরর্দ্ধসমন্বিতৌ ॥১৪॥
সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ ॥১৫॥

দিবাভাগে দ্বিপ্রহরে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হয়। আর ঐ দিন ১৫।১৬ ঘণ্টা পরে ভোর রাত্রে ভরত ভূমিষ্ঠ হন। পর দিন প্রায় ঐরূপ দ্বিপ্রহর কালে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। রাম ভূমিষ্ঠ হইলেন পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে, ভরত পুষ্যাতে এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন অশ্লেষাতে। এই রামায়ণ লেখার সময়ে সৌরমাসের ব্যবহার হইত, তাহা "দ্বাদশমাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ" হইতে জানা যায়। রামচন্দ্র শুক্লপক্ষে চৈত্র মাসের ২৭ অংশ মধ্যে রবি থাকার সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; নতুবা নবমী তিথি পাওয়া যায় না। আর "স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু" হইতে পাওয়া যায় যে, পাঁচটি গ্রহ স্বক্ষেত্রগত ও উচ্চস্থ হইবে। 'স্বোচ্চ' শব্দ স্ব ও উচ্চ অর্থাৎ স্বক্ষেত্র ও উচ্চ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইলে রামচন্দ্রের জন্মকালে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি উচ্চস্থ এবং চন্দ্র স্বক্ষেত্রস্থ ছিল, আর রবি মীন রাশিতে ছিল, তাহা 'দ্বাদশমাসে' হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে। কিন্তু লক্ষ্মণের জন্মের সময় রবি তুঙ্গী ছিল। তখন রবি মেষে ০ অংশে বা ১ অংশে ছিল। সুতরাং লক্ষ্মণের জন্ম বৈশাখ মাসে।

রামায়ণে রামের বিবাহের কাল নির্ণয়ের আলোচনায় জ্যোতিষের কথা পাওয়া যায়,—

উত্তরদিবসে ব্রহ্মন্ ফল্গুনীভ্যাং মনীষিণঃ।
বৈবাহিকং প্রশংসন্তি ভগো যত্র প্রজাপতিঃ ॥১৪॥

আদিকাণ্ড, দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

তারপর রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়া মহারাজা দশরথ রামের সহিত বাক্যালাপ কালেও জ্যোতিষের কথা তুলিয়াছিলেন,—

অপি চাদ্যাশুভান্ পুত্র স্বপ্নান্ পশ্যামি রাঘব।
সনির্ঘাতা দিবোল্কাশ্চ পতন্তি হি মহাস্বনাঃ ॥১৭॥
অবষ্টব্ধঞ্চ মে রাম নক্ষত্রং দারুণ-গ্রহৈঃ।
আবেদয়ন্তি দৈবজ্ঞাঃ সূর্য্যাঙ্গারকরাহুভিঃ ॥১৮॥
প্রায়েণৈব নিমিত্তানামীদৃশানাং সমুদ্ভবে।
রাজা হি মৃত্যুমাপ্নোতি ঘোরাঞ্চাপদমৃচ্ছতি ॥১৯॥

তদ্ যাবদেব মে চেতো ন বিমুহ্যতি রাঘব।
তাবদেবাভিষিঞ্চস্ব চলা হি প্রাণিনাং মতিঃ॥ ২০॥
অদ্য চন্দ্রোঽভ্যুপগমৎ পুষ্যাৎ পূর্ব্বং পুনর্ব্বসুম্।
শ্বঃ পুষ্যযোগং নিয়তং বক্ষ্যন্তে দৈবচিন্তকাঃ॥২১॥
তত্র পুষ্যেঽভিষিঞ্চস্ব মনস্ত্বরয়তীব মাম্।
শ্বস্ত্বাহমভিষেক্ষ্যামি যৌবরাজ্যে পরন্তপ॥২২॥
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ।

রামায়ণে ফলিত-জ্যোতিষের কথা এইরূপ পাওয়া যায়। মহাভারতেও জ্যোতিষের কথা আছে।

ফলিত-জ্যোতিষ যে ঠিক কোন্ সময় হইতে আমাদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলা সুকঠিন। এই ফলিত-জ্যোতিষে 'ভৃগু-সংহিতা' বলিয়া এক গ্রন্থ আছে। বর্ত্তমানেও তাহার কিয়দংশ পাওয়া যায়। তাহাতে পূর্ব্বজন্ম, বর্ত্তমান জন্ম এবং পরজন্মের কথা লিখিত আছে। জাতক ছাড়া, প্রশ্ন-খণ্ডও আছে। 'ভৃগু-সংহিতা' অতি অদ্ভুত গ্রন্থ।

'শুক্রনাড়ী' বলিয়া এইরূপ আর একখানি গ্রন্থও দেখিতে পাওয়া যায়। মান্দ্রাজ সরকারের পুথি-শালায় তাহার কিয়দংশ রক্ষিত হইয়া আছে।

আমরা আঠার জন জ্যোতির্ব্বেত্তার নাম পাই,—

সূর্য্যঃ পিতামহো ব্যাসো বশিষ্ঠোঽত্রিঃ পরাশরঃ।
কশ্যপো নারদো গর্গো মরীচির্মনুরঙ্গিরাঃ॥
রোমকঃ পৌলিশশ্চৈব চ্যবনো যবনো ভৃগুঃ।
শৌনকোঽষ্টাদশশ্চৈতে জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ॥
[লোমশঃ পৌলিশশ্চৈব ভার্গবো যবনো গুরুঃ—পাঠান্তর]।
কশ্যপ।

ঐ আঠার জন জ্যোতিষের প্রণেতা ছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থে ফলিতের কথাও আছে। এদিক্ দিয়া বিচার করিলে আমাদের গণিত ও ফলিত যেমন ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত, তেমনি কত যে প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

জ্যোতিষ তো বেদাঙ্গ শাস্ত্র। বেদেও জ্যোতিষের কথা আছে। ঋগ্বেদে ৭ম মণ্ডলে ১০৩ সূক্তের ৩য় মন্ত্রে বর্ষা ঋতু, ১০ম মণ্ডলে ১৬১ সূক্তের ৪র্থ মন্ত্রে হেমন্ত ঋতু, ১০ম মণ্ডলে

৯০ সূক্তের ৬ষ্ঠ মন্ত্রে গ্রীষ্ম, শরৎ ও বসন্ত ঋতুর উল্লেখ আছে। শীতকে সম্ভবতঃ হেমন্তের মধ্যেই গণ্য করা হইয়াছে। অন্য বেদ ধরিলে শীত ঋতুও পাওয়া যায়। মোট কথা, ঋগ্বেদে ঋতু-বিভাগ পাওয়া যায়। গ্রহগণের ও নক্ষত্রগণের নাম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে সাতটি গ্রহ ও একুশটি নক্ষত্রের উল্লেখ আছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদে ও অথর্ব্ববেদে ২৭ এবং ২৮ সংখ্যক নক্ষত্রের কথা আছে। বেদে পৃথিবীর গতি প্রভৃতি আরও অনেক জ্যোতিষের বিষয় দেখা যায়। সুতরাং বেদের কালে জ্যোতিষের আলোচনা ছিল, তবে ঠিক কিরূপ আলোচনা ছিল, তাহা বর্ত্তমানে নির্ণয় করা যায় না।

যজ্ঞের ব্যাপার বেদ-ঘটিত। শুভ মুহূর্ত্ত নির্ণয় করিয়া যজ্ঞ করিতে হয়। ঐ সময়-নির্ণয় জ্যোতিষের বিষয়। তাই মনে হয়, আমাদের গোড়া হইতেই জ্যোতিষ ছিল। এ বিষয়ে শ্লোকও আছে,—

"বেদা হি যজ্ঞার্থমভিপ্রবৃত্তাঃ
কালানুপূর্ব্যা বিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ।
তস্মাদিদং কালবিধানশাস্ত্রং
যো জ্যোতিষং বেদ স বেদ যজ্ঞম্॥"

এখন যেমন নৌচালনার জন্য পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের প্রয়োজন, তখন যজ্ঞের জন্য আমাদের জ্যোতিষের দরকার হইত। যাহা হউক, বেদেও জ্যোতিষের অস্তিত্ব আছে। তবে কেবল গণিত, কি কেবল ফলিত, কি দুইই, তাহা বলা যায় না। হয় তো শুধু গণিতই হইবে।

মোক্ষমুলর ঋগ্বেদের মুখবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদের জন্ম। আবার কেহ খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ বৎসরের অনধিককাল পূর্ব্বে বেদ রচিত বলিয়াছেন। স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় বেদের জ্যোতিষ আলোচনা করিয়া ছয় হাজার বৎসরের পূর্ব্বে বেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন; বিশেষ যখন আমরা অতি সাধারণ ভাবে পাইতেছি যে, খ্রীষ্ট-জন্মের ১৫ শত বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত। আর মহাভারতের রচয়িতা যখন বেদকে বিভাগ করিয়াছেন, তখন বেদকে অতি প্রাচীন বলিয়া মনে করিতেই হইবে—কোন মতেই আধুনিক বলা যাইতে পারে না।

এই সকল দিক্ দিয়া দেখা যাইতেছে যে, জ্যোতিষ বেদের সময়েও ছিল। মহাভারতের যুগ হইতে ৫৫০০ কি ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এখন বেদের বয়স যত বেশী হইবে, জ্যোতিষও তত পুরাতন হইবে।

একালকার জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মধ্যে আর্যভট, লল্ল, বরাহমিহির ও ভাস্করাচার্য্যই শ্রেষ্ঠ। সুধাকর

দ্বিবেদী মহাশয় তাঁহার রচিত 'গণকতরঙ্গিণী'তে আর্য্যভটের সময় ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ, লল্লের ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, বরাহমিহিরের ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ এবং ভাস্করাচার্য্যের ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। আর্য্যভট, লল্ল ও বরাহমিহিরের পর হইতেই ভারতের জ্যোতিষ-বিদ্যার ঘোর অবনতি ঘটিয়াছে। ভাস্করাচার্য্য একবার জ্যোতিষকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পর হইতেই ভারতীয় জ্যোতিষের জ্যোতিঃ আর প্রকাশ পায় নাই। এখন পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের উন্নত অবস্থা, ক্রমশঃ আরও উন্নতি হইতেছে। যে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খ্রীঃ অঃ) আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্ত্য জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব নিউটনের প্রায় ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য (১১১৪ খ্রীষ্টাব্দ) আবিষ্কার করিয়াছেন (গোলাধ্যায়)। ইহাকেই ভারতের জ্যোতিষের শেষ জ্যোতিঃ বলিতে হইবে।

শ্রীগণপতি সরকার

মৈত্রেয়নাথ-কৃত

অভিসময়ালঙ্কারকারিকা

পরিচয়

যোগাচারপন্থী বৌদ্ধদিগের আজ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে মৈত্রেয়নাথ-কৃত অ ভি স ম য়া ল ঙ্কা র কা রি কা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বসুবন্ধুর বি জ্ঞ প্তি মা ত্র তা সি দ্ধি তে যোগাচারদর্শনের সারমর্ম্ম নিহিত আছে বটে, কিন্তু উহাতে নৈতিক অনুষ্ঠানাদির কোন কথাই নাই। অ ভি স ম য়া ল ঙ্কা র কা রি কায়[১] দর্শন, নৈতিক অনুষ্ঠানাদি, মুক্তির পথে বোধিসত্ত্বের ক্রমোন্নতির অবস্থানসমূহ এবং অন্যান্য নানাবিষয় একত্র করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, ঐ ক্ষুদ্র গ্রন্থে যোগাচারপন্থীদের দর্শন ও রীতি নীতি নিহিত রহিয়াছে এবং সেই জন্যই উহা তিব্বতীদের মধ্যে আমাদের গীতার মত স্থান পাইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এমন একখানি গ্রন্থ বহুকাল ধরিয়া এশিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে অজ্ঞাতভাবে পড়িয়া ছিল। উহার অজ্ঞাতবাস হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই প্রথম উহাকে উদ্ধার করেন, তাই শাস্ত্রী মহাশয়ের বর্দ্ধাপনীতে ইহার একটু বিবরণ উপযুক্ত হইবে মনে করিয়া কিছু লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

এশিয়াটিক সোসাইটীতে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে এবং অন্যান্য স্থানে প ঞ্চ বিং শ তি সা হ স্রি কা প্র জ্ঞা পার মি তার[২] যে সকল পুথি আছে, তাহার প্রথম ছয় পাতায় এই কারিকাখানি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এবং বেণ্ডেল সাহেব উহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা যে প ঞ্চ বিং শ তি সা হ স্রি কার প্রথম অধ্যায় নহে এবং একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ—ইহা স্থির করিতে পারেন নাই। পুথির লেখকগণ এমন ভাবে দুইখানি গ্রন্থ একসঙ্গে লিখিয়া গিয়াছেন যে, উহাদের স্বতন্ত্রতার বিষয় না জানাই বেশী সম্ভাবনা। শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে যে সমস্ত পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই কারিকার একখানি পুথি পৃথগ্‌ভাবেই পাইয়াছিলেন; সেই জন্য তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন

---

১ এখন হইতে ইহাকে আমরা 'কারিকা' বলিয়া উল্লেখ করিব।

২ এখন হইতে ইহাকে 'পঞ্চবিংশতি' বলিয়া উল্লেখ করিব।

যে, বাস্তবিক উহা একখানি পৃথগ্ গ্রন্থ,—প ঞ্চ বিং শ তির প্রথম অধ্যায় নহে; তবে উহা যে কেন প ঞ্চ বিং শ তির পুথির মধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কোন উক্তি করেন নাই।

প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে আমি এই পুথির অনুসন্ধান করি; তাহার ফলে দেখিতে পাই যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত পুথি ব্যতীত এই কারিকার আরও চারিখানি পুথি আছে। সবগুলিই প ঞ্চ বিং শ তির পুথির প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। ঐ চারিখানির মধ্যে দুইখানি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে, একখানি প্যারিসের বিব্লিওথেক ন্যাশিওন্যালে এবং একখানি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। রুষীয় পণ্ডিত চার্বাৎস্কি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার কল্পনা করেন। এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনগ্রাড হইতে তাঁহার শিষ্য ওবারমিলার এই কারিকার সংস্কৃত মূল ও তিব্বতী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

কারিকার অনুবাদ ও ভাষা

অনুসন্ধানে আমরা জানিতে পারি যে, চীনা ভাষায় এই কারিকার কোনও অনুবাদ হয় নাই। চীনা ভাষায় প ঞ্চ বিং শ তির যে চারিখানি অনুবাদ হইয়াছে, তাহার কোনটির মধ্যে উহার উল্লেখ নাই। চীনা ত্রি পি ট কের সম্প্রতি যে টোকিও সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জাপানী সম্পাদক মহাশয় পাদটীকায় লিখিয়াছেন,—অ ভি স ম য়া ল ঙ্কা র অনুসারে সংশোধিত প ঞ্চ বিং শ তি সা হ স্রি কা। তিনি এই উক্তি সংস্কৃত পুথি হইতে উদ্ধৃত করিয়া চীনা অনুবাদে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই যে, চীনা ভাষার প ঞ্চ বিং শ তির সহিত সংস্কৃত প ঞ্চ বিং শ তির ভাষার এবং অধ্যায়ের সংখ্যায় অনেক পার্থক্য আছে। কারণ, আট-অধ্যায়ভুক্ত আমরা যে সংস্কৃত প ঞ্চ বিং শ তি পাইয়াছি, উহা মূল নয়, উহার একখানি পূর্ব্বতম সংস্করণ ছিল। সেই সংস্করণ হইতে চীনা পণ্ডিতগণ অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনুবাদে কারিকার কোনও উল্লেখ না থাকার কারণ এই যে, ঐ সংস্করণের সহিত কারিকার কোনও সম্বন্ধ ছিল না।

তিব্বতী বক’-’গ্যুর ও বস্তন’-’গ্যুর ধর্ম্মশাস্ত্রে প ঞ্চ বিং শ তির দুইখানি অনুবাদ পাওয়া যায়। বক’-’গ্যুরের অন্তর্ভুক্ত তিব্বতী প ঞ্চ বিং শ তি পূর্ব্বতম সংস্কৃত সংস্করণ হইতে অনুদিত হইয়াছে। সেই জন্য উহাতে কারিকার অনুবাদ দেখা যায় না। বস্তন’-’গ্যুরের অন্তর্ভুক্ত তিব্বতী প ঞ্চ বিং শ তি বর্ত্তমান সংস্কৃত সংস্করণ হইতে অনুদিত। এই প ঞ্চ বিং শ তিতে কারিকার অনুবাদ নাই; কিন্তু ইহাতে অ ভি স ম য়া ল ঙ্কারানুসারে সংশোধিত বা পরিবর্ত্তিত প ঞ্চ বিং শ তি বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতী ভাষায় এই মূল কারিকার বহু অনুবাদ আছে। তাহা ছাড়া,

প্রায় একুশখানি মূল সংস্কৃত ভাষ্যের তিব্বতী অনুবাদ এখনও পাওয়া যায়। এই ভাষ্যকারদিগের মধ্যে বসুবন্ধুর শিষ্য আর্য্য বিমুক্তসেন (৬ষ্ঠ শতাব্দী), তাঁহার শিষ্য ভদন্ত বিমুক্তসেন (৭ম শতাব্দী), সিংহভদ্র, স্মৃতিজ্ঞানকীর্ত্তি এবং টীকাকারদিগের মধ্যে ধর্ম্মকীর্ত্তিশ্রী, প্রজ্ঞাকরমতি, ধর্ম্মমিত্র, রত্নকীর্ত্তি এবং বুদ্ধশ্রীজ্ঞান, এই কয় জন উল্লেখযোগ্য।

সিংহভদ্র-কৃত আর্য্যাষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা ব্যাখ্যা ভিসময়ালঙ্কার আলোক নামক ভাষ্যের সংস্কৃত মূল পাওয়া যায়। উহা হইতে 'ত্রিকায়' সম্বন্ধে যে অংশটুকু লেখা হইয়াছে, তাহা ফরাসী দার্শনিক মার্স-উর্সেল অধ্যাপক ভ্যালিপুসেঁর সাহায্যে ফরাসী অনুবাদ সহ সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন (জুর্নাল আসিয়াতিক, ১৯১৩, পৃ ৫৮১)। ওবারমিলার সাহেব আলোকের সংস্কৃত মূল প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শুনিতেছি যে, ইতালীর অধ্যাপক টুচ্চি এই গ্রন্থ যন্ত্রস্থ করিয়াছেন।

কারিকার সহিত প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধ

অভিসময়ালঙ্কার কারিকার অপর নাম প্রজ্ঞাপারমিতোপদেশশাস্ত্র অর্থাৎ বিশাল প্রজ্ঞাপারমিতার সারাংশ বা বক্তব্য বিষয় এই কারিকায় নিহিত আছে। কারিকাখানি পঞ্চবিংশতির সহিত একত্র পাওয়াতে এবং পঞ্চবিংশতির প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে "আর্য্যপঞ্চবিংশতিসাহস্রিকায়াং ভগবত্যাং প্রজ্ঞাপারমিতায়ামভিসময়ালঙ্কারানুসারেণ সংশোধিতায়াং" ইত্যাদি লিখিত আছে বলিয়া আমাদের এই অনুমান সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। স্মৃতিজ্ঞানকীর্ত্তি এই কারিকার যে ভাষ্য লিখিয়াছেন, তাহার নামকরণ করিয়াছেন,—প্রজ্ঞাপারমিতামাতৃকা-শতসাহস্রিকা-বৃহচ্ছাসন-পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকামধ্যশাসন—অষ্টাদশসাহস্রিকা-লঘুশাসনাষ্টসমানার্থশাসনাদ্যভিসময়ালঙ্কারাম্বিতাষ্টসময়বৃত্তি। এই নামকরণ হইতে ভাষ্যকারের যে কি উদ্দেশ্য, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ইনি প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করেন যে, কারিকাখানি পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকার সারাংশ নহে—ইহা শতসাহস্রিকা এবং অষ্টাদশসাহস্রিকারও সারাংশ। সিংহভদ্র-কৃত ভাষ্যের নাম,—আর্য্যাষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতাব্যাখ্যানাভিসময়ালঙ্কার-বৃহট্টীকা ভিসময়ালঙ্কারালোকনাম এবং রত্নাকরশান্তি-কৃত ভাষ্যের নাম—অষ্টসাহস্রিকাম্বিতাভিসময়ালঙ্কারচিত্তমাত্রনির্দ্দেশাষ্টসাহস্রিকাবৃত্তি সারোত্তমানামপঞ্জিকা। এই সমস্ত নামকরণ

৩ উপরি উল্লিখিত সংস্কৃত নামসমূহ কর্ডিয়ে সাহেবের ক্যাটলগ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, অভিসময়ালঙ্কারকারিকা কেবলমাত্র পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকার সারাংশ নহে, সমস্ত প্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্রের সারাংশ। এখন একটা প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, শতসাহস্রিকা এবং অষ্টসাহস্রিকার যে সংস্কৃত পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কারিকার নাম উল্লিখিত নাই কেন, অথচ পঞ্চবিংশতি-সাহস্রিকাতেই বা কেন উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার মীমাংসা এই ভাবে করা যাইতে পারে,—আমরা যে পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকার সংস্কৃত মূল পাইয়াছি, উহা আদি সংস্কৃত মূল নহে। পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকার যে আদি সংস্কৃত মূল ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উহার চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যায়। ঐ অনুবাদ তিব্বতীরা বস্তন'-'গ্যুর গ্রন্থাবলীভুক্ত না করিয়া বক'-'গ্যুর গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়াছেন এবং আমরা যে পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকার সংস্কৃত মূল পাইয়াছি, তাহার তিব্বতী অনুবাদ বস্তন'-'গ্যুরের সূত্রবৃত্তি বিভাগে নিহিত হইয়াছে। বক'-'গ্যুর গ্রন্থাবলীভুক্ত যে পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা, তাহাতে ৭৬ অধ্যায় আছে। এই ৭৬টি অধ্যায় বস্তন'-'গ্যুর বা সংস্কৃত পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকার আটটি অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভ্রমক্রমে সংস্কৃত পুথিলেখকগণ আদি সংস্কৃত সংস্করণের প্রথম ২।৩টি অধ্যায়ের নাম এই সংস্কৃত পুথিতে লিখিয়া ফেলিয়াছেন; যথা,—তৃতীয় অধ্যায়ের মাঝখানে লিখিয়াছেন, "ইতি শ্রীপঞ্চবিংশতিকায়াং স্তূপসৎকারপরিবর্ত্তো নাম তৃতীয়। ইতি শ্রীপঞ্চ-বিংশতিকায়াং প্রজ্ঞাপারমিতায়াং গুণপরিকীর্ত্তনপরিবর্ত্তো নাম চতুর্থ (এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথি পৃ ১৬৪ ক এবং পৃ ১৬৮ খ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আদি সংস্কৃত পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা, শ্রীপঞ্চবিংশতি বলিয়া উল্লিখিত হইত। ইহাও বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই আদি শ্রীপঞ্চবিংশতিকা পরে অভিসময়ালঙ্কার অনুসারে পরিবর্ত্তিত (পুথিতে আছে সংশোধিত) হইয়া বর্ত্তমান অষ্ট-অধ্যায়-সমন্বিত পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায় পরিণত হইয়াছে (প্রজ্ঞাপারমিতাষ্টাভিঃ পদার্থৈঃ সমুদীরিতা)। আমরা শতসাহস্রিকা এবং অষ্টসাহস্রিকার আদি সংস্কৃত মূল পাইয়াছি এবং ঐগুলি অভিসময়ালঙ্কার অনুসারে আদৌ সংস্কৃত ভাষায় পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

কারিকার লেখক

প্রত্যেক পুথিতেই কারিকার সমাপ্তি-বাক্যে দেখা যায়,—ইহা মৈত্রেয়নাথ-কৃত। এখন এই মৈত্রেয়নাথ যে অসঙ্গ অথবা অন্ত কোন শাস্ত্রকার, ইহা লইয়া বহু মতভেদ আছে। আমরা

এখানে অসঙ্গ ও মৈত্রেয়নাথ অভিন্ন বা পৃথক্ ব্যক্তি, ইহা লইয়া যে মতভেদ, তাহার কিছু বিবরণ দিব।

তারনাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে (পৃ ১১১, ১১২) লিখিয়াছেন,—অসঙ্গ যে সব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেগুলির মধ্যে অভিসময়ালঙ্কার কারিকা অন্যতম। অসঙ্গ ও বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের মধ্যে যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহাও তাঁহার ইতিহাসে জানাইয়াছেন। বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের অপর নাম অজিতনাথ। অসঙ্গ এই অজিতনাথের পরমভক্ত শিষ্য ছিলেন এবং এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি তুষিতভবনে অজিতনাথের নিকট হইতে সমস্ত মহাযান ধর্ম্ম শ্রবণ করেন এবং তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করেন। তারনাথ আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, অসঙ্গ বাল্যকালে প্রজ্ঞাপারমিতা বিশেষ ভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

বু-স্তোন[৩] তাঁহার তিব্বতী ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে ২০ খানি যোগাচার গ্রন্থের বিবরণ দিয়াছেন (চার্বাৎস্কির প্রবন্ধ ল্য মিউজিয়ঁ, ১৯০৫)। এতন্মধ্যে পাঁচখানি মৈত্রেয়নাথের, তিনখানি অসঙ্গের এবং বাকী বসুবন্ধুর রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মৈত্রেয়নাথ-কৃত পাঁচখানি গ্রন্থের নাম দিয়াছেন এইরূপ,—(১) সূত্রালঙ্কার, (২) মধ্যান্তবিভাগ,[৪] (৩) ধর্ম-ধর্মতাবিভঙ্গ, (৪) উত্তরতন্ত্র এবং (৫) অভিসময়ালঙ্কার এবং অসঙ্গ-কৃত গ্রন্থের নাম দিয়াছেন,—(১) পঞ্চভূমি, (২) অভিধর্মসমুচ্চয় এবং (৩) মহাযানসংগ্রহ। পঞ্চভূমি মৈত্রেয়নাথ-কৃত পাঁচখানি গ্রন্থের বিশদ ব্যাখ্যা এবং অন্য দুইখানি অভিধর্ম্মের এবং মহাযানগ্রন্থাদির সারাংশ।

তারনাথের বিবরণ হইতে মনে হয় যে, অসঙ্গ ও মৈত্রেয়নাথ অভিন্ন; কিন্তু বু-স্তোনের ইতিহাস হইতে মনে হয় যে, অসঙ্গ ও মৈত্রেয়নাথ ভিন্ন ব্যক্তি; কিন্তু তারনাথের বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, মৈত্রেয়নাথ যে সকল গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন, ঐ গ্রন্থগুলি বাস্তবিক অসঙ্গের লেখা, তবে প্রবাদ যে, অসঙ্গ ঐ গ্রন্থগুলি মৈত্রেয়নাথের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। বু-স্তোনের

৩ গত বৎসর অধ্যাপক ওবারমিলার বু-স্তোন-লিখিত বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ (১ম খণ্ড) প্রকাশ করিয়াছেন। উহার ৫৩, ৫৪ পৃষ্ঠায় উক্ত পাঁচখানি পুস্তকে লিখিত বিষয়গুলির বিবরণ দিয়াছেন।

৪ অধ্যাপক তুচ্চি মধ্যান্ত বিভাগখানি তিব্বতী হইতে সংস্কৃতে পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। উহা ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় তাঁহার কলিকাতা ওরিয়েন্টাল সিরিজে প্রকাশ করিতেছেন।

পৃথক্ করার এক কারণ হইতে পারে যে, কতকগুলি গ্রন্থ অসঙ্গ, মৈত্রেয়নাথের নিকট পাইয়াছিলেন এবং কতকগুলি স্বীয় প্রতিভাবলে রচনা করিয়াছিলেন। এই দুইটি প্রভেদ দেখাইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন,—পাঁচখানি মৈত্রেয়নাথ-কৃত এবং তিনখানি অসঙ্গ-কৃত। আমরা অসঙ্গের যে সমস্ত গ্রন্থ দেখিতে পাই, (অভিধর্ম্মসমুচ্চয়, মহাযানসংগ্রহ) তাহা হইতে মনে হয় যে, অসঙ্গ বৃহৎ গ্রন্থগুলি অল্পের মধ্যে কারিকা আকারে লিখিতে বেশ পটু ছিলেন। ইহা ব্যতীত তারনাথের বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, তিনি বাল্যকালে প্রজ্ঞাপারমিতা বিশেষ ভাবে চর্চ্চা করিয়াছিলেন, সে জন্য তিনি যে বৃহৎ প্রজ্ঞাপারমিতাকে কারিকা আকারে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই কারিকা যে কেন মৈত্রেয়নাথ-কৃত লেখা হইয়াছে, তাহা এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের লেখকেরা অনেক সময় সৌজন্য দেখাইবার জন্যই হউক বা অন্য কোন বিশ্বাসেই হউক, স্বীয় ইষ্টদেবতার উপরে নিজের লেখা আরোপ করিতেন; ইহার কারণ,—তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ইষ্টদেবতার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া পুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং ইষ্টদেবতার সাহায্য ছাড়া, ঐ পুস্তক রচনা করা তাঁহার সাধ্যাতীত ছিল। সেই জন্য ইহা সম্ভব যে, অসঙ্গ কিংবা অসঙ্গের শিষ্যগণ কারিকাখানি অসঙ্গের ইষ্টদেবতার নামে আরোপ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, কারিকাখানি যে বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়নাথ-কৃত নয়, ইহার পক্ষে এইরূপও বলা যাইতে পারে যে, কারিকার প্রারম্ভে "ওঁ নমো মৈত্রেয়নাথায়" বলা হইয়াছে। গ্রন্থকার কখন নিজের উদ্দেশে এইরূপ নমস্কার-সূচক বাক্য লিখিতে পারেন না। সে জন্যও অসঙ্গ ও মৈত্রেয়নাথ একই লোক হইবার সম্ভাবনা। ইহার বিপক্ষে একটি বিশেষ কারণ দেখান যাইতে পারে যে, অসঙ্গ-কৃত পুস্তক হইলে, ইহার কোন চীনা অনুবাদ থাকা উচিত ছিল। চীনা অনুবাদ না থাকাতেই, এই মৈত্রেয়নাথ, অসঙ্গের পরবর্ত্তী কোন একজন যোগাচার শাস্ত্রবিৎ হইতে পারেন। তবে চার্বাৎস্কির মতে যদি অসঙ্গের সময় ৫ম শতাব্দী ধরা যায়, তাহা হইলে চীনা অনুবাদ না থাকার উপর তত আস্থা স্থাপন করা যায় না। সাধারণতঃ অসঙ্গের সময় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে স্থির করা হয় এবং অসঙ্গের সূত্রালঙ্কার প্রভৃতি গ্রন্থের চীনা অনুবাদও পাওয়া যায়। সেই জন্য আরও কিছু নূতন প্রমাণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত এই 'মৈত্রেয়নাথ' যে কে, সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হইতে পারিতেছি না।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে Z. I. I. পত্রিকাতে (পৃ ২১৫) জাপানী অধ্যাপক উই অনেক প্রমাণ-পঞ্জী দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, মৈত্রেয় নামে একজন সুপণ্ডিত চতুর্থ শতাব্দীতে অযোধ্যায় বাস করিতেন। তিনি অসঙ্গকে মহাযান ধর্ম্মে শিক্ষা দিতেন। অধ্যাপক উই-এর মতে, নাগার্জ্জুন যেমন মাধ্যমিক পন্থার প্রবর্ত্তক, এই মৈত্রেয় সেইরূপ যোগাচার পন্থার প্রবর্ত্তক ছিলেন।

কারিকার প্রতিপাদ্য বিষয়

যোগাচার ধর্ম্মের সারতত্ত্ব প্রকাশ করা কা রি কার মূল উদ্দেশ্য এবং প্র জ্ঞা পা র মি তা ও কা রি কা যে এক, তাহা দেখাইবার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, যোগাচার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বয়ং বুদ্ধদেব এবং এই ধর্ম্ম তাঁহার শিষ্যগণ-প্রবর্ত্তিত নহে; কারণ প্র জ্ঞা পা র মি তা বুদ্ধদেবেরই মুখনিঃসৃত।

যোগাচারপন্থীদের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, বুদ্ধদেব প্রথমে হীনযান ধর্ম্ম প্রচার করেন। কিন্তু মাধ্যমিকপন্থীদের মতানুসারে তিনি প্রথমে মহাযান ধর্ম্ম প্রচার করেন; তাহার ফলে, আমরা প্র জ্ঞা পা র মি তা সূ ত্রা দি পাই; এবং সর্বশেষে যোগাচারপন্থীদের বিজ্ঞানবাদ প্রচার করেন। ইহা প্র জ্ঞা পা র মি তার মধ্যে নিহিত থাকিলেও যোগাচারপন্থীরাই কেবল উহার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে পারিয়াছেন। সে জন্য প্র জ্ঞা পা র মি তাতে যে কি কি বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহা যে সম্পূর্ণ যোগাচার মতানুযায়ী, তাহাই এই কা রি কায় প্রদর্শিত হইয়াছে। কা রি কা অনুসারে, প্র জ্ঞা পা র মি তার প্রতিপাদ্য বিষয় আটটি; যথা,—(১) সর্বাকারজ্ঞতা, (২) মার্গজ্ঞতা, (৩) সর্বজ্ঞতা, (৪) সর্বাকারাভিসংবোধ, (৫) মূর্দ্ধাভিসময়, (৬) অনুপূর্বাভিসময়, (৭) একক্ষণাভিসংবোধ এবং (৮) ধর্মকায়। এই কা রি কাতে এইরূপ আটটি নামকরণ করার পরই ১৩টি শ্লোকে এই বিষয় কয়টি অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। তাহার পর কা রি কার প্রারম্ভ। ইহাতে যোগাচার ধর্ম্মের প্রায় সমস্ত বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ অসঙ্গের সূ ত্রা ল ঙ্কা রে বা বসুবন্ধুর বি জ্ঞ প্তি মা ত্র তায় যত কিছু বিষয় আমরা জানিতে পারি, সেই সমস্তেরই আভাস ইহাতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যাখ্যা করিতে গেলে, সমস্ত যোগাচারশাস্ত্র আসিয়া পড়ে এবং সেই জন্যই এতগুলি বিশাল টীকা এই ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছে। এখানে সেই জন্য কা রি কার অধ্যায়গুলি যাহাতে বুঝা যায়, এইরূপ বিবরণ দিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

প্রথম অধ্যায় সর্বাকারজ্ঞতা-বিষয়ক,— ইহাতে দ্বাবিংশতি প্রকারের বোধিচিত্ত; দশবিধ বোধিসত্ত্বাববাদ অর্থাৎ আসক্তিবিহীন হইয়া বোধিসত্ত্বকে কি প্রকারে বোধিসত্ত্বপ্রতিপত্তি, আর্য্যসত্যে প্রবেশলাভ, ত্রিরত্ন সেবা, ষড়ভিজ্ঞালাভ ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ; দর্শনমার্গে ও ভাবনামার্গে বোধিসত্ত্বের ক্রমোন্নতি এবং চতুর্বিধ নির্বেধ-ভাগীয় ধর্মপ্রাপ্তি; ধর্মধাতুর একত্ব, আধার ও প্রতিপত্তি-ভেদে, লৌকিক ও লোকোত্তর ধর্মাবলম্বন-ভেদে ধর্মধাতুর বহুত্ব; বোধিসত্ত্বচর্য্যার অসাধারণত্ব; বোধিসত্ত্বের অতুলনীয় পুণ্যসম্ভারাদি; দশভূমির প্রত্যেক ভূমিলাভের জন্য কি প্রকার গুণ ও জ্ঞানসম্ভারের প্রয়োজন, এবং সেই সমস্ত গুণের ও জ্ঞানের কি কি প্রতিপক্ষ হইতে পারে, এ সমস্ত বিচার; এবং সর্বশেষে দশম ভূমিতে সম্বোধিলাভ ইত্যাদি উল্লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় মার্গজ্ঞতা-বিষয়ক,— চতুরার্য্যসত্যের আকার অবলম্বন করিয়া শ্রাবকদিগের মার্গ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্থাৎ স্কন্ধাদির শূন্যতা বা পুদ্গলশূন্যতা হৃদয়ঙ্গম করা; পুদ্গলশূন্যতা ও ধর্ম্মশূন্যতা মূলতঃ একই; শ্রাবকযানের মধ্য দিয়া কিরূপে অগ্রযান-প্রাপ্তি হইতে পারে এবং কেনই বা তিন প্রকার যান জগতে প্রচারিত হইয়াছে—এই সকল বিষয়ের বিচার; শ্রাবকদিগের (শ্রাবক) নির্ব্বাণ লাভের অভিলাষ কি প্রকারে বোধিলাভের অভিলাষে পরিণত করা যাইতে পারে ইত্যাদি বিষয় এই অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায় সর্ব্বজ্ঞতা-বিষয়ক,— এই অধ্যায়ে সর্ব্বজ্ঞতা লাভের একমাত্র উপায় যে সমতাজ্ঞান—ইহাই উক্ত হইয়াছে। রূপ, বেদনা প্রভৃতি স্কন্ধাদি; বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ সময়-বিভাগ; ছয় বা দশ পারমিতা; বোধিপক্ষিকধর্ম ইত্যাদি সমস্তই সংবৃতি সত্য। ইহাদের পরমার্থতঃ পৃথক্ পৃথক্ কোনও অস্তিত্ব নাই। কিন্তু অচিন্ত্য পরমার্থ সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য রূপ, বেদনা প্রভৃতি স্কন্ধাদির নিত্যতা, অনিত্যতা, বোধিসত্ত্বচর্য্যাসমূহ, দুঃখাদি চতুরার্য্যসত্য প্রভৃতি এইরূপ নানা বিষয় উদ্ভাবনের প্রয়োজন হইয়াছে। পরমার্থ সত্য বা শূন্যতা বা তথতা হইতেছে অনুৎপন্ন, অনিরুদ্ধ, নিষ্প্রপঞ্চ নির্নিমিত্ত। জগতের যাহা কিছু বিষয় আমরা জানিতে পারি বা দেখিতে পাই, তাহাদের পরমার্থতঃ অনস্তিত্ব বা সমতাজ্ঞানলাভের দ্বারাই এই পরমার্থ সত্যের উপলব্ধি সম্ভব। ইহাই এ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়।

চতুর্থ অধ্যায় সর্বাকারাভিসংবোধ-বিষয়ক,— 'সর্ব্বজ্ঞতা' অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, পরমার্থ সত্য অনুৎপন্ন, অনিরুদ্ধ ইত্যাদি; এবং জাগতিক যাহা কিছু এমন কি, বোধিসত্ত্বচর্য্যা, বুদ্ধত্বলাভ সমস্তই সংবৃতি সত্য। পরমার্থতঃ জাগতিক বস্তুসমূহের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। তাহা হইলেও সংসারাবদ্ধ অবিদ্যান্ধ জীব জাগতিক সত্য ব্যতীত আর কিছুই জানে না। সেই জন্য তাহাদিগকে পরমার্থ সত্যে উপনীত করিতে হইলে, বোধিসত্ত্বের কেবলমাত্র সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিলে চলিবে না। সর্বাকারাজ্ঞত্ব বা সর্বাকারাভিসংবোধ লাভ করিতে হইবে অর্থাৎ জাগতিক বিষয়াদিও শিক্ষা করিতে হইবে। এই সর্বাকারাভিসংবোধ কত প্রকার হইতে পারে, তাহারই তালিকা দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে:—

ষোড়শ মার্গ, স্মৃত্যুপস্থান প্রভৃতি ৩৭টি বোধিপক্ষিক ধর্ম্ম, কল্যাণমিত্র গ্রহণ, বুদ্ধোপাসনা, রূপ-বেদনাদিতে অনবস্থান, তথতার দুরবগাহত্ব, মারশক্তিক্ষয় করার উপায়, সর্বজ্ঞতাধিকারে এবং মার্গজ্ঞতাধিকারে বর্ণিত জ্ঞানলক্ষণাদি, প্রমাণ ও নিদর্শনবিহীন তথতাজ্ঞান, লোকানুবর্ত্তনের জন্য বোধিসত্ত্বের লৌকিক ক্রিয়াসমূহ, বোধিসত্ত্বের ত্রিযান অবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞানলাভ, বুদ্ধত্বলাভ, ক্লেশসমূহ ও

তাহাদের ক্ষয়ের উপায়, বুদ্ধাদির প্রতি শ্রদ্ধা, বীর্য্য, জ্ঞান দানাদি ক্রিয়াসমূহ, স্মৃতি, সমাধি, সমচিন্তাদির আকার ইত্যাদি।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় মূর্দ্ধাভিসময় ও অনুপূর্ব্বাভিসময় বিষয়ক,—এই দুইটি অধ্যায় একই বিষয় লইয়া লিখিত হইয়াছে, নামে দুইটি। অনুপূর্ব্বাভিসময় অধ্যায়ে একটি মাত্র শ্লোক আছে। এই অধ্যায় দুইটির বক্তব্য বিষয় হইতেছে,—বোধিসত্ত্বের চতুরার্য্যসত্যজ্ঞানে ক্রমোন্নতি এবং চরম অবস্থাপ্রাপ্তি। চরম অবস্থাপ্রাপ্তিকে মূর্দ্ধাভিসময় এবং তাহার ক্রমোন্নতিকে অনুপূর্ব্বাভিসময় বলে। দর্শনমার্গ ও ভাবনামার্গের দ্বারা এই চরমাবস্থাপ্রাপ্তি লাভ হয়। তবে এই দুই মার্গে অগ্রসর হইবার সময় বহু বিকল্পের উৎপত্তি হয়। সেই সমস্ত বিকল্প কি প্রকারের হইতে পারে এবং সেইগুলি নিরাকরণ করিবার কি কি প্রতিপক্ষ হইতে পারে, এ সমস্ত কথিত হইয়াছে। তাহা ব্যতীত বোধিসত্ত্ব কি কি উপায়ে পুণ্যার্জ্জন করিতে পারে, সমাধিসমূহ পূরণ করিতে পারে, জীবের হিতচিন্তা কি ভাবে করে, ক্রমোন্নতির সময়ে তাহাদের নৈসর্গিক অবস্থা কি কি হয় এবং চিত্তস্থিতি কখন হয় ইত্যাদি বিষয়ও কথিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায় একক্ষণাভিসময় বিষয়ক,— অনাস্রবধর্মসমূহ লাভ করার পর বোধিসত্ত্বের যখন আর কোনরূপ ক্লেশাদি মলিনতা থাকে না, তখন প্রজ্ঞাপারমিতা-প্রসূত জ্ঞান দ্বারা সমস্ত ধর্ম যে স্বপ্নোপম, অদ্বয়, ইহা একমুহূর্ত্তে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। ইহা যোগাচারপন্থীদের একটি বিশেষ মত; ইহাদের মতে পূর্ণজ্ঞানলাভ একক্ষণে হয়, ক্রমে ক্রমে হয় না।

অষ্টম অধ্যায় ধর্ম্মকায় বিষয়ক,— সাধারণতঃ বুদ্ধের ত্রিকায়মাত্র আমরা জানি। কিন্তু এ কারিকায় চারিটি কায়ের কথা উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধের প্রকৃত কায়কে ইহাতে স্বাভাবিক কায় এবং বোধিপক্ষিক প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা যে কায় গঠিত, তাহাকে ধর্ম্মকায় বলা হইয়াছে। বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্মকায়কে সাম্ভোগিক কায় বলে। ইহা শ্রাবকের বা সাধারণের দৃষ্টিগোচর নহে, উচ্চাবস্থাপ্রাপ্ত বোধিসত্ত্বরাই কেবল ঐ কায় দেখিতে পান। মহাপুরুষ-লক্ষণান্বিত স্থূলকায়কে নির্মাণকায় বলে। ইহাই কেবল সাধারণের এবং শ্রাবকদিগের দৃষ্টিগোচর হয়।

হাইডেলবার্গ (জার্ম্মানি)

২৯।৩।২৮

শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত

বৌদ্ধন্যায়

[১]

সূচনা

ন্যায় বলিতে আমরা সাধারণতঃ মহর্ষি গৌতমের ন্যায়দর্শন অথবা গঙ্গেশ, রঘুনাথ প্রভৃতি মিথিলা ও নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের আলোচিত প্রমাণবাদ বুঝিয়া থাকি ; কিন্তু ভারতীয় দর্শনগুলির আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক দর্শনেই আপন আপন তত্ত্বপ্রতিপাদনের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রমাণবাদ অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রমাণের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, এ কথা সকলের অভিমত হইলেও, প্রমাণ বলিতে কি বুঝা যাইবে, প্রমাণ কয়টী ইত্যাদি বিষয় লইয়া অনেক মতভেদ রহিয়াছে। প্রমাণবিষয়ক এইরূপ বিভিন্ন আলোচনার ফলে মীমাংসা, বেদান্ত ইত্যাদি প্রত্যেক দর্শনেই অল্পবিস্তর এক একটী স্বতন্ত্র প্রমাণবাদ বা 'ন্যায়'-এর উদ্ভব হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, প্রমাণতত্ত্বের অবতারণা ব্যতিরেকে দর্শন অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যে বৌদ্ধন্যায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই বৌদ্ধন্যায়ের কিছু আলোচনা করিব।

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তদীয় 'ভারতীয় ন্যায়দর্শনের ইতিহাস' (A History of Indian Logic, 1921) নামক গ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্রকে প্রাচীন, মধ্য ও নব্য—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্যভাগে জৈন ও বৌদ্ধ ন্যায়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। এইরূপ বিভাগ কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা এ ক্ষেত্রে বিচার্য নহে। তা যাহাই হউক, বৌদ্ধাচার্যদিগের দ্বারা যে বিশাল ন্যায়শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিচয় লাভ করিতে পারিলে, ভারতীয় ন্যায়দর্শনের ইতিহাসে বৌদ্ধন্যায়ের স্থান ও উপযোগিতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বৌদ্ধন্যায়বিষয়ক অল্প কয়েকটী মাত্র গ্রন্থ আমরা মূল সংস্কৃতে পাইতেছি। তিব্বতী, চীনা ইত্যাদি বিদেশী ভাষায় যে ভারতীয় সাহিত্য অনুবাদরূপে স্থান পাইয়াছে, তাহার মধ্যে ন্যায়গ্রন্থের সংখ্যা অল্প নহে। এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণের জন্য জাপানী পণ্ডিত সাদাজিরো স্গুইরার 'চীনা ও জাপানী ভাষায় হিন্দুন্যায়' (Hindu Logic as preserved in China and Japan, 1900) এবং মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পূর্বোক্ত

'ভারতীয় ন্যায়দর্শনের ইতিহাসে'র দ্বিতীয়ভাগ দ্রষ্টব্য। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক পিটারসন (Peterson) 'ন্যায়বিন্দুটীকা' ও 'ন্যায়বিন্দু' এশিয়াটিক সোসাইটীর বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা (Bibliotheca Indica) নামক সংস্থায় প্রকাশিত করেন। ইহাই বৌদ্ধন্যায়ের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। তাহার পর অধ্যাপক শ্চেরবাৎস্কি (Stcherbatsky)-সম্পাদিত 'ন্যায়বিন্দুটীকাসহিত ন্যায়বিন্দুর তিব্বতী অনুবাদ' (১৯০৪) এবং তাহাদের সংস্কৃত মূল (১৯১৮) বাহির হইয়াছে। তিনি 'ন্যায়বিন্দুটীকাটিপ্পণী'ও (১৯০৯) প্রকাশিত করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত 'ছয়টী বৌদ্ধন্যায়প্রকরণ' (Six Buddhist Nyāya Tracts, 1910) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বরোদা হইতে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত 'ন্যায়প্রবেশের তিব্বতী অনুবাদ' (Gaekwad Oriental Series, No. 39, 1927) এবং অধ্যক্ষ ধ্রুব সম্পাদিত সংস্কৃত মূল (Gaekwad Oriental Series, No. 38, 1930) বাহির হইয়াছে। ইহার পূর্বে বরোদা হইতে প্রকাশিত কমলশীলের পঞ্জিকাসহ শান্তরক্ষিতের 'তত্ত্বসংগ্রহ' (Gaekwad's Oriental Series, No. 30-31, 1926) নামক গ্রন্থে বৌদ্ধন্যায়ের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক তুচ্চির (Tucci) 'ন্যায়মুখ' (চীনা হইতে ইংরাজী অনুবাদ; Jahrbuch des Instituts für Buddhismus-Kunde, vol. I. ed. by Prof. Walleser, 1930, এবং 'প্রাগ্-দিঙ্‌নাগ বৌদ্ধন্যায়' (Pre-Diṅnāga Buddhist Texts on Logic from Chinese Sources, Gaekwad Oriental Series, No. 49, 1929) এই দুইটী গ্রন্থ বৌদ্ধন্যায়ের আলোচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে। বরোদা হইতে বৌদ্ধন্যায়ের আরও কয়েকটী গ্রন্থ বাহির হইবার কথা। তথাপি বৌদ্ধন্যায়ের যাহা হারাইয়া গিয়াছে, তাহার তুলনায় যাহা পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ অনেক কম।

বর্ত্তমান নৈয়ায়িকেরা বৌদ্ধন্যায়ের প্রতি হতাদর হইয়াছেন, কিন্তু নৈয়ায়িকপ্রবর উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র, জয়ন্ত ভট্ট, শ্রীধর ও উদয়ন বৌদ্ধমত খণ্ডনাবসরে বৌদ্ধন্যায়ে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। 'প্রমাণসমুচ্চয়' (সম্প্রতি মহীশূর হইতে আয়েঙ্গার মহাশয় প্রমাণ সমুচ্চয়ের প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ তিব্বতী অনুবাদ হইতে সংস্কৃতে উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন) প্রভৃতি অধুনাবিলুপ্ত বৌদ্ধন্যায়গ্রন্থ হইতে বহুস্থলে উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি বৌদ্ধমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ধর্মকীর্ত্তির মত উল্লেখ করিবার সময় বাচস্পতি কেবল 'কীর্ত্তি'নামে তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে সাধারণ্যে বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের প্রসিদ্ধির এবং বৌদ্ধমতের বহুলপ্রচারের পরিচয় পাওয়া যায়। আর জৈন দার্শনিকেরাও বৌদ্ধন্যায়ের চর্চা করিতেন। ন্যায়বিন্দু ইত্যাদি যে কয়েকটী বৌদ্ধন্যায়গ্রন্থ মূল সংস্কৃতে পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রায় সবগুলি জৈন ভাণ্ডারেই রক্ষিত হইয়াছিল। জৈনাচার্য হরিভদ্র সূরি 'ন্যায় প্রবেশপঞ্জিকা' এবং মল্লবাদী 'ন্যায়বিন্দুটীকা'র উপর টিপ্পণী রচনা করেন।

যে নব্যন্যায়ের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া আমরা বৌদ্ধন্যায়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছি, সেই নব্য-ন্যায়ের উপর গৌতমোক্ত ন্যায়দর্শন অপেক্ষা বৌদ্ধন্যায়ের প্রভাব কিছু কম নহে। গৌতম তাঁহার ন্যায়দর্শনে প্রমাণ-প্রমেয় আদি ষোড়শ পদার্থের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু কেবল মাত্র প্রমাণ-পদার্থকেই বৌদ্ধদার্শনিকগণ তাঁহাদের ন্যায়শাস্ত্রে স্থান দিয়াছেন, এবং এই প্রমাণপদার্থই নব্য-নৈয়ায়িকগণের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। যে ব্যাপ্তিবাদ অবলম্বন করিয়া নব্য-নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা হইয়াছে, তাহার কোন উল্লেখই গৌতমের ন্যায়দর্শনে পাওয়া যায় না। সাধর্ম্য এবং বৈধর্ম্য হেতু ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সাধ্যনির্ণয়ের কথা আছে মাত্র। অথচ বৌদ্ধনৈয়ায়িকগণ অনুপলব্ধি, স্বভাব ও কার্য—এই ত্রিবিধ হেতুর দ্বারা হেতু-সাধ্যের মধ্যে অবিনাভাব-সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি-নির্ণয়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন। আর ব্যাপ্তি প্রদর্শনের অভাব বা বৈপরীত্য থাকিলে, তাঁহাদিগের মতে অনুমান অনন্বয়, বিপরীতান্বয়াদি দৃষ্টান্তাভাসমূলক হইবে (ন্যায়বিন্দু, ২·১২ ও ৩·১২৭-১২৮, ১৩৪-১৩৬)।

ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তা একটু ঘনীভূত হইবার পর, ন্যায় বা প্রমাণশাস্ত্রের আলোচনার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। বেদে দার্শনিক আলোচনা কম। উপনিষদের দার্শনিক কথাগুলি অধিকাংশই ভাবাত্মক। বিরোধী লোকায়ত সম্প্রদায় যখন বেদ মিথ্যা, ধর্ম ভিত্তিহীন, আত্মা দেহাতিরিক্ত কিছুই নহে ইত্যাদি কথা বলিতে লাগিলেন, তখন বেদপন্থী আত্মবাদী ব্রাহ্মণেরা আপনাদের মত তর্কযুক্তির অবতারণাদ্বারা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে মীমাংসা-ন্যায়াদি শাস্ত্রের প্রবর্তন হইল। যজ্ঞসম্বন্ধীয় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনার জন্য সমিতি ও পরিষদের উল্লেখ রহিয়াছে। উপনিষদে যুক্তির কিছু কিছু স্থান থাকিলেও বিচার দ্বারা সকল তত্ত্ব গৃহীত হইতে পারে—এ কথা উপনিষৎ বলিতে চান না। কঠোপনিষৎ বলিতেছেন, "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"—বাদ বা তর্কের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে যে গার্গ্য-অজাতশত্রু-সংবাদ রহিয়াছে, শঙ্করের মতে, তর্কবুদ্ধি নিষেধ করা তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ('কেবলতর্কবুদ্ধিনিষেধার্থা চাখ্যায়িকা—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া", "ন তর্কশাস্ত্রদগ্ধায়" ইতিশ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্।' বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, শাঙ্করভাষ্য, ২য় অধ্যায়, ১ম ব্রাহ্মণ ।) ।

আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রুতিস্মৃতি না মানিয়া নিরপেক্ষভাবে তর্কের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে আদৃত হয় নাই। তর্ক বেদমূলক না হইলে, সে তর্কের সহায়তায় ধর্ম নির্ণয় হইতে পারে না। মহাভারতে এক তার্কিকের শৃগালযোনি লাভের কথা দেখিতে পাই (মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৮০ অধ্যায়)। মনুর মতে, হেতুশাস্ত্র

আশ্রয় করিয়া যে ব্রাহ্মণ শ্রুতিস্মৃতির অবমাননা করিবেন, তাঁহাকে সাধুরা আপন দল হইতে বাহির করিয়া দিবেন।

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥

মনু, ২।১১।

বেদকে প্রমাণরূপে ব্রাহ্মণেরা বরাবরই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অপর পক্ষে কিন্তু বৌদ্ধেরা তাঁহাদিগের ধর্ম্মকে কোন আগম বা শ্রুতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদিগের চিন্তা কাজে কাজেই কিছু বন্ধনমুক্ত হইয়াছিল। পালি ত্রিপিটকে বহুস্থলেই প্রশ্ন উঠিয়াছে,—'তং কিস্‌স হেতু'—"তাহার হেতু কি?"

বুদ্ধদেব এক জায়গায় ভিক্ষুদিগকে বলিতেছেন,—

তাপাচ্ছেদাচ্চ নিকষাৎ সুবর্ণমিব পণ্ডিতৈঃ।
পরীক্ষ্য ভিক্ষবো গ্রাহ্যং মদ্‌বচো ন তু গৌরবাৎ॥

তত্ত্বসংগ্রহ, ৩৫৮৮।

"বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা যেরূপ সুবর্ণকে অগ্নিতপ্ত করিয়া, ছেদন করিয়া এবং নিকষপ্রস্তরে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, হে ভিক্ষুগণ, আমার বাক্যকেও সেইরূপ পরীক্ষা দ্বারা গ্রহণ করিও, আমার প্রতি গৌরববশতঃ গ্রহণ করিও না।" ব্রাহ্মণ্য মত খণ্ডন করিবার জন্য বৌদ্ধদিগকে অনেক তর্কযুক্তির আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এইরূপ নানাকারণে প্রমাণশাস্ত্রের উপর বৌদ্ধাচার্যদিগের দৃষ্টি পড়ে এবং তাঁহাদিগের দ্বারা প্রমাণশাস্ত্রের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হয়।

[২]

বৌদ্ধন্যায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস *

বৌদ্ধসাহিত্যকে মোটামুটী দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; প্রথম, পালি বৌদ্ধসাহিত্য এবং দ্বিতীয়, সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্য। পালি বৌদ্ধসাহিত্যে ন্যায়বিষয়ক কোন গ্রন্থ এতাবৎ পাওয়া যায় নাই; কিন্তু ভিক্ষুদিগের বিচারপদ্ধতির যে উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাতে অনুমানাদির ব্যবহার দেখিতে

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২১শ ও ২২শ ভাগ, 'বৌদ্ধন্যায়' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পাওয়া যায়। স্পষ্টতঃ ন্যায়ের আলোচনা না থাকিলেও ন্যায়সিদ্ধান্তগুলি পালি বৌদ্ধসাহিত্যের যুগে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল না। কনিষ্কের (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক) সময় হইতে সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্ম লিখিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে মহাযান মাধ্যমিক ও যোগাচার এই দুই সম্প্রদায়ে, এবং প্রাচীনপন্থী হীনযানের বিভিন্নশাখা সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক—এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়ায় চারিটী নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল। স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠার জন্য ইঁহারা সকলেই তর্কযুক্তির আশ্রয় লইতে লাগিলেন এবং এই কারণে তাঁহারা বিশেষ করিয়া ন্যায়ানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দিঙ্‌নাগের পূর্ব্বে নাগার্জুনাদি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ গৌতমোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তর্ককৌশল, হেত্বাভাস, জাতি, নিগ্রহস্থান ইত্যাদির আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। নাগার্জুনের 'উপায়-কৌশল-হৃদয়-শাস্ত্র' (অধ্যাপক তুচ্চির মতে উপায়হৃদয়; Pre-Dinnāga Buddhist Texts on Logic p. xi) বাদবিধি ব্যাখ্যানের জন্য রচিত হইয়াছিল। মৈত্রেয়, অসঙ্গ ও বসুবন্ধু ন্যায়চর্চার কিছু উৎকর্ষ সাধন করিলেও প্রধানতঃ নাগার্জুনের পথে চলিতে লাগিলেন। তাহার পর দিঙ্‌নাগ ন্যায়-আলোচনার এক নূতন যুগ আনয়ন করেন। তিনি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের স্বরূপ, তাহাদের বিষয়, ইত্যাদি দুরূহ দার্শনিক আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। এ দিকে তিনি আবার গৌতম, বাৎস্যায়নাদি ব্রাহ্মণ্য দার্শনিকগণের মত খণ্ডন করিলেন। তাহার ফলে উদ্দ্যোতকর, কুমারিল ইত্যাদি পণ্ডিতেরা নূতন করিয়া ব্রাহ্মণ্য দর্শন ও ন্যায়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

দিঙ্‌নাগের পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণের মধ্যে ধর্মকীর্ত্তির নাম সমধিকভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রধানতঃ দিঙ্‌নাগের অনুসরণ করিলেও কয়েকটী বিষয়ে দিঙ্‌নাগের মতের বিরোধী কথাও বলিয়াছেন। দিঙ্‌নাগের স্বীকৃত বিরুদ্ধাব্যভিচারী হেত্বাভাস ধর্মকীর্ত্তির অভিমত নহে (ন্যায়বিন্দু, ৩.১১২—১২১)। বাৎস্যায়নের উপর দিঙ্‌নাগাদির দূষণ দেখিয়া উদ্দ্যোতকর যেরূপ ন্যায়বার্ত্তিক লিখিয়াছিলেন, দিঙ্‌নাগের উপর উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির দূষণ দেখিয়া ধর্মকীর্ত্তি সেইরূপ প্রমাণসমুচ্চয়ের অবলম্বনে প্রমাণবার্ত্তিককারিকা রচনা করেন। দিঙ্‌নাগ ও ধর্মকীর্ত্তির পর যে সকল বৌদ্ধ নৈয়ায়িক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই দিঙ্‌নাগের বা ধর্মকীর্ত্তির কোন গ্রন্থের টীকা বা অনুটীকা লিখিয়াছেন, না হয় তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে 'ন্যায়প্রকরণ' রচনা করিয়াছেন। তবে নূতন কথা একেবারে যে না আসিয়াছে এমন নহে। অন্তর্ব্যাপ্তি (দৃষ্টান্তের অপেক্ষা না রাখিয়া পক্ষেই হেতুও সাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয়) এবং পঞ্চকারণীর (পাঁচবার উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির দ্বারা কার্য-কারণ-নির্ণয়) কোন উল্লেখ প্রমাণসমুচ্চয়ে বা ন্যায়বিন্দুতে নাই। দিঙ্‌নাগ ও ধর্মকীর্ত্তির পরবর্ত্তী বৌদ্ধ নৈয়ায়িকেরা ইহা লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন (অন্তর্ব্যাপ্তি সমর্থন—রত্নাকরপাদ, Six Buddhist Nyāya

Tracts-এর শেষ গ্রন্থ; কার্যকারণভাবসিদ্ধি—জ্ঞানশ্রীমিত্র, মূল সংস্কৃত পাওয়া যায় নাই, তিব্বতী অনুবাদ রহিয়াছে)। বসুবন্ধু দ্বি-অবয়ব (প্রতিজ্ঞা ও হেতু) অনুমানের কথা বলিয়াছেন, ইহাতে অন্তর্ব্যাপ্তির কিছু ইঙ্গিত থাকিলেও (History of Indian Logic : পৃ ২৬৮, পাদটীকা, ২) বিষয়টী তাঁহার সময় ভাল করিয়া আলোচিত হয় নাই, নতুবা ন্যায়বিন্দু প্রভৃতিতে উক্ত মতের উল্লেখ নিশ্চয় দেখিতে পাওয়া যাইত। ধর্মকীর্ত্তির পর শান্তরক্ষিত, ধর্মোত্তর, অর্চট, জিতারি ইত্যাদি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের আবির্ভাব হয়। এইরূপে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক অবধি বৌদ্ধন্যায়ের চর্চা ও বৌদ্ধন্যায়বিষয়ক গ্রন্থরচনা হইতে লাগিল। তাহার পর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধন্যায়ের আলোচনাও বাধাপ্রাপ্ত হয়। এদিকে আবার ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুদয়ে ব্রাহ্মণ্যন্যায়ের আলোচনা পুনরায় আরম্ভ হইল। সেই সময় হইতে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যন্যায় বৌদ্ধন্যায়ের সহিত মিলিত ও তাহার প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়, এবং নব্যন্যায়ের সূত্রপাত হয়।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বৌদ্ধন্যায়ের সহিত বঙ্গদেশের কিছু সংস্রব রহিয়াছে। বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত প্রভৃতি কেহ কেহ বঙ্গদেশীয় ছিলেন। বৌদ্ধন্যায়ের কয়েকটী গ্রন্থ (মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদিত ছয়টী বৌদ্ধন্যায় প্রকরণ—১. অপোহসিদ্ধি, ২.-৩. ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি, ৪. অবয়বিনিরাকরণ, ৫. সামান্যদূষণদিক্‌প্রসারিতা, ও ৬. অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থন এবং এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত গভর্ণমেণ্ট সংগ্রহভুক্ত সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে ১০৭৪৬ সংখ্যক অসম্পূর্ণ হস্তলিখিত গ্রন্থ) খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রাচীন বঙ্গীয় অক্ষরে লিখিত পাওয়া গিয়াছে।

[৩]

বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধন্যায়

এখন বৌদ্ধন্যায়ের প্রমাণাদি তত্ত্বগুলি বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। প্রমাণের আলোচনা করিতে গেলে, প্রমাতা ও প্রমেয়ের কথা আসিয়া পড়ে। প্রমাতা ব্যতিরেকে কে জ্ঞান লাভ করিবে? আর প্রমেয় ব্যতিরেকে কোন্ বিষয়েরই বা জ্ঞান হইবে? কাজেই বৌদ্ধদিগের প্রমাণ আলোচনার পূর্বে তাঁহারা প্রমাতা ও প্রমেয় সম্বন্ধে কি বলিতে চান, তাহা জানা দরকার। ব্রাহ্মণ্যদার্শনিকগণ আত্মাকে প্রমাতা বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধদিগের মতে জ্ঞান-সুখাদির আধারভূত আত্মা বলিয়া কোন স্থির পৃথক্ পদার্থ নাই; জ্ঞান মাত্রেই স্বপ্রকাশ ও স্বসংবেদ্য—অতিরিক্ত জ্ঞাতার অপেক্ষা করে না। প্রমেয় সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিশেষ বৈমত্য রহিয়াছে। কেহ বলেন,—প্রমাণ নাই, প্রমেয় নাই, প্রমিতি নাই, কিছুই নাই; তাঁহারা শূন্যবাদী মাধ্যমিক। কেহ বলেন,—প্রমেয় বস্তুতঃ কিছুই নাই;

জ্ঞানই একমাত্র সৎ। 'অনাদি বাসনা' বশতঃ জ্ঞান নানা আকারের হইয়া থাকে এবং তাহাতে মনে হয় প্রমেয় বস্তু—বহিরর্থ রহিয়াছে। ইঁহারা হইলেন যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী। কাহারও মতে, বাহ্যার্থ রহিয়াছে—জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয়ের অনুমান হয়। প্রমেয় সৎ, কিন্তু অনুমানের দ্বারা জ্ঞেয়। ইঁহারা হইলেন সৌত্রান্তিক। আবার এক দল বলেন, বাহ্যার্থ অনুমানগম্য—এ কথা বলিলে, প্রত্যক্ষ-গম্য-ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাব বশতঃ অনুমান অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাই তাঁহাদের মতে বহিরর্থ রহিয়াছে এবং তাহার প্রত্যক্ষ হয়, অনুমানও হয়। ইঁহারা হইলেন বৈভাষিক।

সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মতের দিক্ হইতে প্রমাণাদি আলোচনার পক্ষে ততটা বাধা নাই। কিন্তু মাধ্যমিক ও যোগাচারমতে বহিরর্থ অস্বীকার করিলে, প্রমাণাদির কোন স্থান থাকে না। অথচ কেহই দৈনন্দিন জীবনে বহিরর্থ ও প্রমাণাদির ব্যবহার না করিয়া পারে না। আর পরমতদূষণ এবং স্বমত-স্থাপনের জন্য মাধ্যমিক ও যোগাচার উভয়কেই প্রমাণাদির শরণ লইতে হইয়াছে। এই কারণে তাঁহারা দ্বিবিধ সত্য স্বীকার করিয়াছেন—প্রথম পরমার্থ-সত্য, দ্বিতীয় সংবৃতি-সত্য। পরমার্থ-সত্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে প্রমাণ-প্রমেয় কিছুই থাকে না। তবে সংবৃতি-সত্যের দিক্ দিয়া আমরা প্রমাণপ্রমেয়াদি ব্যবহার করিয়া থাকি।

"দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্মদেশনা।
লোকসংবৃতিসত্যং চ সত্যং চ পরমার্থতঃ॥"

মাধ্যমিককারিকা, ২৪।৮।

"বুদ্ধগণ দ্বিবিধ সত্যকে লক্ষ্য করিয়া ধর্মোপদেশ দিয়াছেন। একটী লোকসংবৃতি সত্য, অপরটী পরমার্থ সত্য।"

চন্দ্রকীর্ত্তি টীকায় 'সংবৃতির' এক অর্থ করিয়াছেন—অভিধান (নাম) ও অভিধেয় (নামী), জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইত্যাকার লোক-ব্যবহার যাহার দ্বারা সম্ভব হয়।—

"অথ বা সংবৃতিঃ সংকেতো লোকব্যবহার ইত্যর্থঃ। স চাভিধানাভিধেয়জ্ঞানজ্ঞেয়াদিলক্ষণঃ॥"

শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপক্রমণিকায় ইহারই অনুরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন,—

"তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্বে প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারা লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ।"

মাধ্যমিকেরা বলেন, আমাদের নিজেদের কোন পক্ষ নাই। বিপক্ষের স্বীকৃত প্রমাণাদি দ্বারা তাহাদের পক্ষে দোষ প্রদর্শন করাই আমাদের অভিপ্রেত।

যোগাচারী দিঙ্‌নাগের মতে,

"সর্ব এবানুমানানুমেয়ব্যবহারো বুদ্ধ্যারূঢ়েন ধর্মধর্মিনির্ণয়েন ন বহিঃ সত্তাম্ অপেক্ষতে।"

(পার্থসারথি মিশ্র—ন্যায়রত্নাকর, শ্লোকবার্ত্তিক—নিরালম্বনবাদ, ১৬৭-১৬৮)

অনুমান-অনুমেয়-ব্যবহার ধর্মধর্মি-সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। এই ধর্মধর্মি-সম্বন্ধ কল্পিত; ইহার বস্তুতঃ থাকার কোন আবশ্যকতা নাই।

যাহাই হউক, সকল সম্প্রদায়ের বৌদ্ধই ন্যায় আলোচনার ক্ষেত্রে নামিয়াছেন। এখন সাধারণভাবে দিঙ্‌নাগ ও তাঁহার পরবর্ত্তী বৌদ্ধনৈয়ায়িকগণের অভিমত প্রমাণবাদ এবং প্রমাণের দুই ভেদ—প্রত্যক্ষ ও অনুমান সম্বন্ধে কিছু আলোচনার চেষ্টা করিব (ন্যায়বিন্দুটীকাসহ ন্যায়বিন্দু ও ন্যায়-বিন্দুটীকাটিপ্পনী (Bib. Buddhica), পঞ্জিকাসহ তত্ত্বসংগ্রহ (Gackwad Oriental Series), গুণরত্নের টীকা সহিত ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয় (Bib. Indica)—বৌদ্ধদর্শন, সর্বদর্শনসংগ্রহ—বৌদ্ধদর্শন; প্রধানতঃ এই কয়েকটী অবলম্বনে পরবর্ত্তী বিবরণ প্রদত্ত হইল)।

[৪]

প্রমাণবাদ

গৌতম প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সলাভের হেতু বলিয়াছেন। নিঃশ্রেয়সলাভের উপযোগী বলিয়া তাঁহার দর্শনে প্রমাণ আলোচনার স্থান হইয়াছে। বৌদ্ধাচার্য ধর্ম-কীর্ত্তির মতে প্রমাণ সমুদয় পুরুষার্থসিদ্ধির হেতুভূত। মানুষ যাহা কিছু গ্রহণ করে, বা ত্যাগ করে, তাহা ভাল রকমে না জানিয়া করিতে পারে না। এই ভাল করিয়া জানা বা সম্যগ্ জ্ঞানকে প্রমাণ বলে। ত্যাজ্য বস্তুর ত্যাগ আর গ্রাহ্য বস্তুর গ্রহণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিতেছে বলিয়া বৌদ্ধাচার্যেরা প্রমাণ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কেবলমাত্র নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিলাভের জন্য নহে।

"সম্যগজ্ঞানপূর্বিকা সর্বপুরুষার্থসিদ্ধিরিতি তদ্‌ব্যাখ্যায়তে।"

ন্যায়বিন্দু, ১।১।

প্রমাণ বলিতে কি বুঝায়—ইহা লইয়া অনেক মতভেদ রহিয়াছে। বৌদ্ধদিগের মতে প্রমাণ জ্ঞান-স্বরূপ; অচেতন ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণ হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন, প্রমাণ অবিসংবাদক জ্ঞান—কোন বস্তুর সম্বন্ধে যেরূপ জ্ঞান হয়, যদি সেইরূপে বস্তুটীকে পাওয়া যায়, তবেই তাহা প্রমাণ। বস্তুর জ্ঞান ও বস্তুর প্রাপ্তি—এই দু'এর মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য বা বিসংবাদ না থাকিলে ঐ বস্তুর জ্ঞান অবিসংবাদক বা প্রমাণ।

আমরা প্রথমে কোন বস্তু সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুমানের দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করি (উপদর্শন), তাহার পর ঐ বস্তুটী পাইবার জন্য আমাদের প্রেরণা প্রবর্তনা হয় (প্রবর্তন), এবং পরে ঐ বস্তুটী প্রাপ্ত হই (প্রাপণ)। একটী বস্তুর প্রথম জ্ঞান লাভের সময় হইতে উহার প্রাপ্তি পর্য্যন্ত জ্ঞানের তিনটী রূপ পাইলাম। প্রথম হইল উপদর্শক, দ্বিতীয় প্রবর্তক এবং তৃতীয় প্রাপক। এই তিনটী বিভিন্ন জ্ঞান নহে, পরন্তু একই জ্ঞানের তিনটী অবস্থা। কোন বস্তুর যথার্থ উপদর্শন হইলেই প্রবর্তন হয় এবং প্রবর্তন হইতে প্রাপ্তি হয়। উপদর্শন, প্রবর্তন ও প্রাপণ এই তিনটীরই বিষয় এক। কাজেই উপদর্শক বলিতে প্রবর্তক, আর প্রবর্তক বলিতে প্রাপক জ্ঞানকে বুঝাইবে। যে পুরুষের জ্ঞান হয়, সেই পুরুষকে হস্তে ধারণ করিয়া জ্ঞান অর্থপ্রাপ্তির জন্য প্রবর্তিত করে না। পরন্তু জ্ঞানের বিষয়ীভূত অর্থকে প্রদর্শন করাইয়া প্রবর্ত্তন ও প্রাপণের যোগ্য করে বলিয়া জ্ঞান প্রবর্তক ও প্রাপক হয়। উপদর্শক জ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাপক হয় না, প্রাপকের যোগ্যতা বা শক্তি তাহার থাকে। প্রাপণশক্তিই প্রাপকত্ব এবং তাহাই প্রামাণ্য।

মরীচিকায় জল-জ্ঞান প্রমাণ নহে, কারণ জলের উপদর্শনের পর তাহার প্রাপ্তি হয় না; উপদর্শন ও প্রাপণের মধ্যে বিসংবাদ হইল। কাজেই এই জল-জ্ঞান বিসংবাদক—অপ্রমাণ। শুক্ল-শঙ্খে পীত-জ্ঞানও অপ্রমাণ; শঙ্খের উপদর্শন ও প্রাপণ উভয়ই সম্ভব হইলেও, শুক্লরূপে যাহার উপদর্শন হওয়া উচিত ছিল, পীতরূপে তাহার উপদর্শন হইয়াছে; উহা ভ্রান্ত জ্ঞান—অপ্রমাণ। এইরূপ এক বিশিষ্ট দেশ বা কালসম্বন্ধী জ্ঞান, অন্য দেশ বা কালসম্বন্ধী জ্ঞানের প্রতি প্রমাণ হয় না।

প্রমাণের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রমাণ অগৃহীতগ্রাহী হইবে। যাহা পূর্বে জানা যায় নাই, তাহার জ্ঞান হইলে প্রমাণ হইবে, নতুবা নহে। তাই স্মৃতির প্রামাণ্য নাই। জিতারি তদীয় 'বালাবতার-তর্ক' (ব্যিস্ প'জুগ্ প'ই র্তোগ্ গে; মূল সংস্কৃত পাওয়া যায় নাই। তিব্বতী অনুবাদ রহিয়াছে।) নামক গ্রন্থে প্রমাণের লক্ষণ করিয়াছেন,—

হিতাহিতপ্রাপ্তিপ্রহাণহেতুঃ প্রমাণম্ ইতি।...

প্রমাণম্ অবিসংবাদকং জ্ঞানম্ অগৃহীতগ্রাহি চ।...

অবিসংবাদকবচনেন বিসংবাদকং মরীচিকায়াং জলগ্রহণম্ ইত্যাদি নিরস্তম্। জ্ঞানবচনেন অচেতনম্ ইন্দ্রিয়াদি নিরস্তম্। অগৃহীতগ্রাহিবচনেন গৃহীতগ্রাহিণী স্মৃতির্নিরস্তা।

=ফন্ প দঙ্ মি ফন্ প থোব্ প দঙ্ স্পোঙ্ ব'ই র্গ্যু ছ্দ্ ম শেস্, ব্য ব'ও।...

ছ্দ্ ম নি ব্স্লু ব মেদ্ প চন্ গ্যি শেস্ প ম ব্সুঙ্ অঙ্ 'জিন্ প ওদ্ দো।...

ব্স্লু ব্ মেদ্ প চন্ স্মোস্ পস্ নি স্লু বর ব্যেদ্ প'ই স্মিগ্ র্গ্যু ল ছুর্ 'জিন্ প ল সোগস্ প ব্সল্ লো। শেস্ প স্মোস্ পস্ নি শেস্ প ম ইন্ প'ই দ্বঙ্ পো ল সোগস্ প ব্সল্ লো। ম

ব্স্রু.ঙ্‌.'জি.ন্ পস্ নি গ্স্রু.ঙ্‌.বর্ 'জি.ন্ প'ই দ্রন্ প ব্সল্ লো। (তাঞ্জুর, ম্দো, সে. ৩৫৯খ১ এবং ৬-৭)।

"প্রমাণ হিতবিষয়ের প্রাপ্তি এবং অহিতবিষয়ের ত্যাগের হেতুভূত। প্রমাণ অবিসংবাদক জ্ঞান এবং তাহা অগৃহীতগ্রাহী। প্রমাণকে অবিসংবাদক বলায় মরীচিকায় জল-জ্ঞান ইত্যাদি বিসংবাদক জ্ঞান নিরস্ত হইল। জ্ঞান বলায়, অচেতন ইন্দ্রিয়াদি নিরস্ত হইল। আর অগৃহীতগ্রাহী বলায় স্মৃতি নিরস্ত হইল।"

প্রমাণের দ্বারা যাহা ভাল (হিত) তাহার গ্রহণ, আর যাহা মন্দ (অহিত) তাহার ত্যাগ করা হয়। যে সকল পদার্থ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহাদের কতকগুলি গ্রাহ্য, আর কতকগুলি ত্যাজ্য। যে সকল বস্তু সম্বন্ধে আমরা উদাসীন—গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না, আর ত্যাগ করিতেও ইচ্ছা করি না, অর্থাৎ যাহারা উপেক্ষণীয়, সেগুলি গ্রাহ্য নহে বলিয়া ত্যাজ্যের অন্তর্ভূত হইবে (উপেক্ষণীয়ো হ্যনুপাদেয়ত্বাদ্ধেয় এব—ন্যায়বিন্দু, পৃ ৪-২৪)। কাজেই প্রমাণের দ্বারা সকল পদার্থের জ্ঞানলাভ হইতে পারে এবং তাহার পর গ্রাহ্য বা হিতের গ্রহণ (প্রাপ্তি) এবং ত্যাজ্য বা অহিতের ত্যাগ (প্রহাণ) হয়। প্রমাণের অবিসংবাদকত্ব ও অগৃহীতগ্রাহিত্ব পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রমাণের সংখ্যা লইয়া নানা মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন প্রমাণ একটী, কেহ দুইটী, কেহ তিনটী ইত্যাদি ক্রমে আটটী অবধি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের মতে প্রমাণ দ্বিবিধ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। জগতে যাহা কিছু জানিবার আছে (প্রমেয়) তৎসমুদায় হয় প্রত্যক্ষ, না হয় পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা জানা যায় এবং পরোক্ষ বিষয় অনুমান-প্রমাণের দ্বারা জানা যায়।

"ন প্রত্যক্ষাপরোক্ষাভ্যাং মেয়স্যান্যস্য সম্ভবঃ।
তস্মাৎ প্রমেয়দ্বিত্বেন প্রমাণদ্বিত্বমিষ্যতে॥"

ষড়্দর্শনসমুচ্চয়, পৃ ৩৮।

দিঙ্নাগ বলিয়াছেন,—

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ প্রমাণং হি দ্বিলক্ষণম্।
প্রমেয়ং তত্র সিদ্ধং হি ন প্রমাণান্তরং ভবেৎ॥"

প্রমাণসমুচ্চয়, History of Indian Logic,
পৃ ২৭৭, পাদটীকা।

প্রমাণসমুচ্চয়ে ও তত্ত্বসংগ্রহে (প্রমাণান্তর পরীক্ষা, পৃ ৪৩৩-৪৮৫) প্রত্যক্ষ ও অনুমান ব্যতীত উপমানাদি অন্য প্রমাণের খণ্ডন রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, দিঙ্‌নাগের পূর্ববর্তী মাধ্যমিক নৈয়ায়িকগণ ব্রাহ্মণ্য-নৈয়ায়িকদিগের পথে অনুসরণ করিয়া চারিটী প্রমাণ স্বীকার করিতেন এবং দিঙ্‌নাগের পরও কোন কোন যোগাচার নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম এই তিনটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন (Pre-Diṅnāga Buddhist Texts on Logic, p. xvii, f. n. i)।

[৫]

প্রত্যক্ষ

আমার সম্মুখে একটী ঘট রহিয়াছে, চক্ষু দ্বারা দেখিলাম, ঘটবিষয়ক জ্ঞান জন্মিল। ইহাই হইল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। ঘটটীর আকৃতি ও বর্ণ বস্তুতঃ যেরূপ, সেইরূপেই যদি তাহার প্রত্যক্ষ হয়, তবেই প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত হইবে। কামলাদি পীড়ানিবন্ধন শুক্ল ঘটকে পীত দেখিলে প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত হইবে না। ঘটের আকার, অবস্থানাদির জ্ঞানে কোনরূপ বৈপরীত্য থাকিলে, তাহা যথার্থ প্রত্যক্ষ হয় না। এখন, প্রত্যক্ষরূপ এই যে যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহার বিশেষ কারণ কি? ন্যায়ের পরিভাষা ব্যবহার করিলে, প্রশ্নটী দাঁড়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ কাহাকে বলে? সাধারণতঃ মনে হইবে, চক্ষু দ্বারা ঘট দেখিলাম, চক্ষুই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশেষ কারণ—প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের মত একেবারে বিভিন্ন। অচেতন ইন্দ্রিয়াদি তাঁহাদিগের মতে প্রমাণ হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন, ঘটের সহিত চক্ষুর সংযোগ হওয়ায় ঘটাকার এক বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়, এবং সেই বিজ্ঞান, পটাদিবিষয়ক পটাকারাদি বিজ্ঞান হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া ঘটবোধ জন্মাইয়া দেয়। ঘটাকার বিজ্ঞানটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং ঘটাকারবিজ্ঞানোৎপন্ন ঘটবোধটী প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ এই, "প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ম্ অভ্রান্তম্" (ন্যায়বিন্দু)—প্রত্যক্ষ কল্পনাপোঢ় অর্থাৎ নির্বিকল্পক এবং অভ্রান্ত জ্ঞান। কোন বস্তুর বাচকশব্দের (নামের) সহিত তাহার যদি জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানকে কল্পনা বলে। কল্পনা যথার্থ জ্ঞান নহে, কারণ, তাহা অসদর্থ হইতে উৎপন্ন। সম্মুখে একটী ঘট দেখিয়া পূর্বদৃষ্ট ঘটের স্মরণ হইল এবং দৃশ্যমান ঘটটীকে পূর্বদৃষ্ট ঘটের অনুরূপ দেখিয়া বলিলাম—ইহা ঘট; ইহা ঘটবিষয়ক বিকল্প। দৃশ্যমান্ ঘটটী সৎ—বিদ্যমান, আর পূর্বদৃষ্ট ঘটটী অসৎ—অবিদ্যমান। সৎ ও অসৎ উভয় ঘটের দ্বারা বর্ত্তমান ঘটবিকল্প হইল। এই ঘটবিকল্পে পূর্বদৃষ্ট অসৎ ঘটটীও কারণ বলিয়া বিকল্প সদর্থক (অর্থাৎ বিদ্যমান অর্থ জন্য) হইল না।

বাচক শব্দের সহিত স্পষ্টতঃ যোগ না থাকিলেও যেখানে যোগের সম্ভাবনা রহিয়াছে, সে স্থলে

বাচক শব্দের অপ্রয়োগেও কল্পনা হইতে পারে। ক্রন্দনরত কোন বালক মাতৃস্তন দর্শন করিয়া যতক্ষণ না 'ইহা সেই মাতৃস্তন' এই ভাবে পূর্বদৃষ্ট মাতৃস্তনের স্মরণ করিতে পারে, ততক্ষণ সেই শিশু মাতৃস্তন বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে না, এবং ক্রন্দন হইতেও বিরত হয় না। এখানে বালকটীর মাতৃস্তন বিষয়ক যে জ্ঞান হইল, তাহা বিকল্প। বালক কোন বাচক শব্দের প্রয়োগ করে নাই, কিন্তু বর্ত্তমান স্তনজ্ঞানে পূর্বদৃষ্টস্তনজ্ঞানের অপেক্ষা থাকায়, তাহা অসদর্থক জ্ঞান বা কল্পনা হইল। প্রত্যক্ষ জ্ঞান এইরূপ কল্পনাবর্জিত হওয়া চাই। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত পদার্থ হইতে যে জ্ঞান হইবে, তাহা প্রত্যক্ষ। বসুবন্ধু বলিয়াছেন, "ততোঽর্থাদ্ বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষমিতি" (ন্যায়বার্ত্তিক, চৌখাম্বা সংস্করণ, পৃ ৪০, ও ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা, চৌখাম্বা সংস্করণ, পৃ ১৫০) ; যে বস্তু জ্ঞানের বিষয় হয়, কেবলমাত্র সেই বস্তু হইতে জ্ঞান হইলে তবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান অভ্রান্ত হওয়া দরকার। নৌকায় করিয়া দ্রুত যাইবার সময় মনে হয়, তীরবর্ত্তী বৃক্ষ সকল বিপরীতভাবে চলিতেছে। এ স্থলে গমনশীল বৃক্ষের যে জ্ঞান হইল তাহা ভ্রমাত্মক, প্রত্যক্ষ নহে। দেহাদির কোন পীড়া নিবন্ধন কোন বস্তুর দর্শনে ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহাও ভ্রান্ত বলিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে না।

প্রত্যক্ষ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে, (১) ইন্দ্রিয়জ্ঞান, (২) মনোবিজ্ঞান, (৩) আত্মসংবেদন এবং (৪) যোগিজ্ঞান।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পঞ্চকের কোন একটীকে আশ্রয় করিয়া বাহ্যরূপাদিবিষয়ক যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তাহা ইন্দ্রিয়জ্ঞান।

প্রত্যক্ষের মনোবিজ্ঞানরূপ যে ভেদ, দিঙ্নাগ-ধর্মকীর্ত্তিপ্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যগণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পারিভাষিক ও আগমসিদ্ধ (বুদ্ধবচনের অনুরোধে স্বীকৃত) ; বস্তুতঃ তাহার লৌকিক উপযোগিতা নাই। "দ্বাভ্যাং ভিক্ষবো রূপং দৃশ্যতে চক্ষুর্বিজ্ঞানেন তদাকৃষ্টেন মনোবিজ্ঞানেনেতি।" (ন্যায়-বিন্দুটীকাটিপ্পনী, পৃ ২৬)—এই বুদ্ধ-বচনের অনুরোধে রূপাদি বাহ্য-বিষয়ে ইন্দ্রিয় জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনোবিজ্ঞান স্বীকৃত হইয়াছে। কুমারিলাদি মীমাংসকগণ এই মনোবিজ্ঞানের অনেক দোষ দেখাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটাদি মনোবিজ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে গৃহীতগ্রাহিত্বপ্রযুক্ত তাহা অপ্রমাণই হইবে। যদি ইন্দ্রিয়-ব্যাপার নিরপেক্ষভাবে বাহ্যরূপাদি মনোবিজ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা হইলে জগতে অন্ধ-বধির কেহ থাকিবে না ; কারণ, চক্ষুরাদির অভাব থাকিলেও রূপাদি বিষয় মনোবিজ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হইবে। এই সমস্ত দোষ পরিহারের জন্য ধর্মকীর্ত্তি (ন্যায়বিন্দু, ১.৯) মনোবিজ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন,—

"স্ববিষয়ানন্তরবিষয়সহকারিণেন্দ্রিয়জ্ঞানেন সমনন্তরপ্রত্যয়েন জনিতং তন্ মনোবিজ্ঞানম্।"

তিনি বলেন, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ঘটপটাদির সন্তানে দ্বিতীয়ক্ষণে যে অনুরূপ ঘটপটাদি উৎপন্ন হয়, তাহাই মনোবিজ্ঞানের বিষয়। দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন বস্তু মনোবিজ্ঞানের আলম্বন; কাজেই গৃহীতগ্রাহিত্বদোষের প্রসঙ্গ রহিল না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসন্তানের অন্তর্গত দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন বস্তুটী মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞান ইহার সমনন্তর কারণ হইয়া থাকে। অতএব অন্ধাদির ইন্দ্রিয়জ্ঞান না থাকায় সমনন্তর কারণের অভাব বশতঃ মনোবিজ্ঞান সম্ভব হয় না। ধর্মোত্তর বলেন,—"এতচ্চ সিদ্ধান্তপ্রসিদ্ধং মানসং প্রত্যক্ষম্। ন ত্বস্য প্রসাধকমস্তি প্রমাণম্। এবং জাতীয়কং তদ্‌যদি স্যান্ন কশ্চিদ্দোষঃ স্যাদিতি বক্তুং লক্ষণমাখ্যাতমস্যেতি।" (ন্যায়বিন্দু, পৃ ১১-১২)

"এই মানসপ্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তপ্রসিদ্ধ—ইহার প্রসাধক প্রমাণ নাই, কিন্তু যদি ইহা এইরূপে (পূর্বোক্তরূপে) ব্যাখ্যাত হয়, তাহা হইলে কোন দোষের প্রসঙ্গ নাই, ইহাই বলিবার জন্য মনোবিজ্ঞানের লক্ষণ কথিত হইয়াছে।" শান্তরক্ষিত-কৃত তত্ত্বসংগ্রহে কিন্তু মানসজ্ঞানের কোন লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, পঞ্জিকাকার কমলশীল ধর্মোত্তরের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে, মনোবিজ্ঞান সিদ্ধান্তপ্রসিদ্ধ বলিয়া অর্থাৎ ইহার লৌকিক সার্থকতা না থাকায় গ্রন্থকার ইহা নিরূপণ করেন নাই।

(সিদ্ধান্তপ্রসিদ্ধত্বান্ মানসস্যাত্র ন লক্ষণং কৃতম্—তত্ত্বসংগ্রহ, পঞ্জিকা, পৃ ৩৯৬)

নৈয়ায়িকদিগের মানসপ্রত্যক্ষ হইতে বৌদ্ধদিগের এই মনোবিজ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক্। তাই নাম-সাদৃশ্যে এক ভ্রম হইবার আশঙ্কায় বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল। নৈয়ায়িক-সম্মত মানসপ্রত্যক্ষ বৌদ্ধদিগের স্বসংবেদনরূপ প্রত্যক্ষের অন্তর্গত; কারণ, বৌদ্ধমতে জ্ঞানমাত্রেই স্বপ্রকাশ স্বত উপলব্ধ—তাহার উপলব্ধির জন্য অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা নাই। নৈয়ায়িকদিগের মতে জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশিত করিলেও স্বপ্রকাশে অক্ষম; জ্ঞানের উপলব্ধি অনুব্যবসায়াদি জ্ঞানান্তরের দ্বারা সংঘটিত হয়। ইহাই কটাক্ষ করিয়া ধর্মকীর্ত্তি বলিয়াছেন,—

"অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি।"

সর্বদর্শনসংগ্রহ, বৌদ্ধদর্শন।

বস্তুগ্রাহক চিত্ত ও চিত্তের সুখাদি অবস্থা সমূহের আপনা হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে আত্মসংবেদন বা স্বসংবেদন প্রত্যক্ষ বলে।

কোন যথার্থ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সমাধিযুক্ত যোগীর মনে সে বিষয়টী সম্বন্ধে যখন স্পষ্টজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সেই বিকল্পশূন্য অভ্রান্ত জ্ঞানকে যোগিজ্ঞান বলে। এই যোগিজ্ঞান সাহায্যে মনুষ্যমাত্রেই সর্ববস্তুর অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে পারে, এবং এই জ্ঞানবলেই বুদ্ধ সর্বজ্ঞ হইয়াছিলেন। মনুষ্যমাত্রেরই বুদ্ধত্বলাভ সম্ভবপর বলিয়া সর্বজ্ঞত্ব সকলেরই সাধনায়ত্ত। বৌদ্ধ-দিগের যোগিজ্ঞান স্বীকারের ইহাই হেতু।

বৌদ্ধদিগের মতে প্রত্যক্ষে বিষয়ের স্বলক্ষণের জ্ঞান হয়। সম্মুখে একটী ঘট দেখা যাইতেছে, এই ঘটে এমন একটী রূপ বা ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার জন্য এটীকে পূর্বদৃষ্ট ঘটের সদৃশ বোধ করিয়া, ঘট বলিয়া চিনিতে অসুবিধা হইতেছে না। যখনই যেখানে ঘট দেখিব, তখনই পূর্বদৃষ্ট সকল ঘটের সহিত তাহার ঐক্য দেখিতে পাইব। ইহাই হইল ঘটের সামান্যরূপ বা ঘটত্ব। ঘটটীর আবার একটী বিশেষরূপ আছে, যাহার জন্য ঘটটী নিকটে থাকিলে স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে আর দূরে থাকিলে অস্পষ্ট হইবে। নিকটে থাকায় স্পষ্টতা এবং দূরে থাকায় অস্পষ্টতা—ইহার কারণ হইল, ঘটের স্বলক্ষণরূপ। বৌদ্ধমতে স্বলক্ষণই হইল বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ—তাহা পরমার্থ সৎ। অকৃত্রিম—অনারোপিতরূপযুক্ত হইয়া তাহা বিদ্যমান থাকে, এবং তাহার দ্বারা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ (অর্থক্রিয়াকারিত্ব) হয়। ঘটত্ব বলিলে নীল, পীত, শ্বেত, লোহিত, কোন ঘটকেই বুঝাইবে না। ঘটত্ববোধটী কল্পনামাত্র। ঘটত্বটী কল্পিত ও অসৎ; ইহার অর্থক্রিয়াকারিত্ব নাই অর্থাৎ ইহার দ্বারা মানুষের কোন প্রয়োজনসিদ্ধি হইতে পারে না। স্বলক্ষণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়, আর সামান্যলক্ষণ অনুমান জ্ঞানের বিষয়।

বৌদ্ধদিগের মতে প্রমাণ ও প্রমাণফল এক। আপাতদৃষ্টিতে হেতু ও ফল একই হইবে, ইহা বিসদৃশ মনে হয়। জৈন এবং ব্রাহ্মণ্যদার্শনিকগণ সবিশেষ যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহা হইলেও বৌদ্ধেরা হেতু ও ফলের একত্ব কেন স্বীকার করেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। কোন একটী নীল পদার্থের দর্শন হওয়ায় নীলজ্ঞান প্রত্যক্ষ হইল। বৌদ্ধেরা বলিবেন—এই নীলজ্ঞান প্রমাণ ও প্রমাণফল উভয়ই হইবে। এখন আপত্তি এই, একই বস্তু প্রমাণ ও প্রমাণফল—সাধ্য ও সাধক কিরূপে হইবে? তাই বৌদ্ধদিগের কথা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। বৌদ্ধেরা সাকার জ্ঞানবাদী; তঁাহাদের মতে নীলপদার্থের দর্শন করিলে নীলাকার—নীলসদৃশ এক জ্ঞান হয়; সেই নীলাকার জ্ঞান পীতাদি পদার্থের জ্ঞান হইতে বিভিন্ন যে নীলবোধরূপ জ্ঞান, তাহা বুঝাইয়া দেয়। কেবলমাত্র চক্ষু দ্বারা দেখিয়া আমরা নীলকে নীল বলিয়া জানিতে পারি না, পরন্তু নীলসদৃশজ্ঞান হইতে নীলের জ্ঞানলাভ করি। নীলসাদৃশ্য বা নীলসারূপ্য হইতে নীলবোধ অবগত হওয়া যায়। নীলসাদৃশ্য ও নীলজ্ঞান দুইটী বিভিন্ন বস্তু নহে (জ্ঞানাদব্যতিরিক্তং সাদৃশ্যং, ন্যায়বিন্দু পৃ ১৫.১১)। যাহা নীলসাদৃশ্যরূপে গৃহীত হয়, তাহাই নীলবোধরূপে প্রতীত হয়; একই নীলপ্রত্যক্ষের দুইটী রূপ মাত্র। কাজেই একই বস্তুর একটী রূপ প্রমাণ, আর একটী প্রমাণফল—ইহাতে কোন বিরোধ নাই (তত একস্য বস্তুনঃ কিঞ্চিদ্রূপং প্রমাণং কিঞ্চিৎ প্রমাণফলং ন বিরুধ্যতে। ন্যায়বিন্দু পৃ ১৫,২০-২১)।

[৬]

অনুমান

দিঙ্‌নাগ বলেন, হেতুর দ্বারা কোন বিষয় জানার নাম অনুমান। (লিঙ্গাদর্থদর্শনমনুমানম্—র্জেস্ স্থ দ্পগ্‌ প নি র্তগ্‌স্ লস্ দোন্ ম্থোঙ্‌ ’ব’ও, Nyāyapraveśa, §55) পর্বতে ধূম দেখিলাম; আমাদের অনুমান হইল পর্বতে বহ্নি রহিয়াছে। সাধ্য-বহ্নিবিশিষ্ট পর্বত পক্ষ, বহ্নি সাধ্যধর্ম, ধূম হেতু। হেতুর তিনটী বিশেষ লক্ষণ থাকা চাই, নতুবা অনুমান সত্য হইবে না। সে তিনটী লক্ষণ এই—(১) পক্ষে হেতুর সত্ত্ব, অর্থাৎ অস্তিত্ব (২) সপক্ষে অর্থাৎ সাধ্যধর্মবিশিষ্ট স্থলে হেতুর সত্ত্ব এবং (৩) বিপক্ষে অর্থাৎ সাধ্যধর্মবর্জ্জিত স্থলে হেতুর অসত্ত্ব। উপরের উদাহরণটী লইয়া হেতুর তিনটী লক্ষণ মিলাইবার চেষ্টা করা যাক্। (১) পক্ষ-পর্বতে হেতু-ধূমের সত্ত্ব রহিয়াছে। (২) যাহা কিছু সাধ্যধর্মবিশিষ্ট অর্থাৎ বহ্নিমান্ বলিয়া নিশ্চিত, তৎসমুদায়ই সপক্ষ, যেমন মহানস (পাকশালা); এই সপক্ষে ধূমের সত্ত্ব রহিয়াছে। (৩) আর যাহা কিছুতে বহ্নির অভাব নিশ্চিত তাহাই বিপক্ষ, যেমন হ্রদাদি জলাশয়; এই বিপক্ষে বহ্নির অভাব—অসত্ত্ব রহিয়াছে।

উদ্দ্যোতকর এবং তাঁহার অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ্য-নৈয়ায়িকগণ উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণের (পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব এবং বিপক্ষাসত্ত্ব) সহিত "অবাধিতত্ব" ও "অসৎপ্রতিপক্ষত্ব" এই দুইটী লক্ষণ যোগ করিয়া পঞ্চলক্ষণাত্মক হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জৈনদিগের মতে 'অন্যথানুপপত্তি' একমাত্র লক্ষণই পর্য্যাপ্ত। তাঁহারা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য নৈয়ায়িকদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন,—

> "অন্যথানুপপন্নত্বং যত্র তত্র ত্রয়েণ কিম্।
> নান্যথানুপপন্নত্বং যত্র তত্র ত্রয়েণ কিম্॥ ইতি বৌদ্ধান্ প্রতি"
> "যৌগান্ প্রতি তু
> অন্যথানুপপন্নত্বং যত্র কিং তত্র পঞ্চভিঃ।
> নান্যথানুপপন্নত্বং যত্র কিং তত্র পঞ্চভিঃ॥"

ন্যায়দীপিকা, পৃ ৩২।

এই ত্রিলক্ষণ হেতুর সাহায্যে আমরা মনে মনে যখন কোন অনুমান করিয়া থাকি, তাহার নাম স্বার্থানুমান, আর শব্দ প্রয়োগ করিয়া অপরকে বোঝাইবার চেষ্টা করি, তাহার নাম পরার্থানুমান। গৌতমের ন্যায়সূত্রে অনুমানের এইরূপ বিভাগ নাই। বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ সম্ভবতঃ প্রথম স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই ভেদে অনুমানবিভাগের কথা বলেন। প্রশস্তপাদভাষ্যে এই দ্বিবিধ অনুমানের উল্লেখ আছে, কিন্তু এই ভাষ্য যে দিঙ্‌নাগাদি বৌদ্ধাচার্যের পূর্ববর্ত্তী, সে বিষয়ে কোনরূপ নিঃসংশয়

প্রমাণ নাই। জৈনন্যায়ে এবং নব্যন্যায়ে এই দ্বিবিধ অনুমানের কথাই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমানে মূলতঃ কোন ভেদ নাই, স্বার্থানুমান মানসিক—জ্ঞানাত্মক, আর পরার্থানুমান বাচনিক—শব্দাত্মক (পরার্থানুমানং শব্দাত্মকং স্বার্থানুমানং তু জ্ঞানাত্মকম্। ন্যায়বিন্দু, পৃ ১৭.৪)।

সাধ্যের সহিত হেতুর সম্বন্ধের দিক্ দিয়া হেতুকে 'অনুপলব্ধি', 'স্বভাব' ও 'কার্য' এই তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কোন স্থলে ঘট না দেখিতে পাইয়া বলিলাম, এস্থলে ঘট অবিদ্যমান, যেহেতু ঘটের অনুপলব্ধি হইতেছে; ইহা 'অনুপলব্ধি' হেতুর উদাহরণ। 'স্বভাব' হেতু—ইহা একটী বৃক্ষ, যেহেতু ইহা শিংশপা। শিংশপা একপ্রকার বৃক্ষবিশেষ, ইহা আমাদের জানা আছে। যখন কোন কারণে বৃক্ষজ্ঞানে আমাদের সন্দেহ হয়, তখন যদি কেহ বলিয়া দেয় যে, সন্দিগ্ধ বস্তুটীর নাম শিংশপা, তখন তাহাকে বৃক্ষ বলিয়া অনুমান করিতে কোনরূপ অসুবিধা হয় না। 'কার্য' হেতুর উদাহরণ—এখানে অগ্নি রহিয়াছে, যেহেতু ধূম রহিয়াছে। ধূম অগ্নির কার্য; কার্য দেখিয়া কারণের অনুমান করিলাম। ন্যায়বিন্দুকার ধর্মকীর্ত্তি, স্বভাবানুপলব্ধি, কার্যানুপলব্ধি, ব্যাপকানুপলব্ধি, স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি ইত্যাদি একাদশ প্রকারের অনুপলব্ধির উদাহরণ দিয়াছেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, একবিংশ ভাগ, পৃ ২৩৬-২৩৭ দ্রষ্টব্য); কিন্তু তিনি আরও বলিয়াছেন, কার্যানুপলব্ধি প্রভৃতি দশটীর প্রথমোক্ত স্বভাবানুপলব্ধিতেই অন্তর্ভাব হইতে পারে (ইমে সর্বে কার্যানুপলব্ধ্যাদয়ো দশানুপলব্ধিপ্রয়োগাঃ স্বভাবানুপলব্ধৌ সংগ্রহমুপযান্তি। ন্যায়বিন্দু ২।৪৩) ষড়্দর্শন সমুচ্চয়ের টীকাকার গুণরত্নের মতে বিরুদ্ধোপলব্ধি, বিরুদ্ধকার্যোপলব্ধি, কারণানুপলব্ধি এবং স্বভাবানুপলব্ধি এই চারিটী প্রধান। অবশিষ্ট সাতটী ইহাদেরই অন্তর্ভুক্ত (গুণরত্নের টীকা সহিত ষড়্দর্শন সমুচ্চয়, Bib. Indica, ১৯০৫, পৃ ৪২।৪৩)।

সাধ্য যাহাই হউক না কেন তাহাদ্বারা কোন বিধি বা নিষেধ প্রকাশিত হইবে। বিধিপ্রকাশক বা নিষেধপ্রকাশক সাধ্য বাদ দিয়া অপর কোন সাধ্যের কল্পনা আমরা করিতে পারি না (সাধ্যশ্চ কশ্চিদ্বিধিঃ কশ্চিৎপ্রতিষেধঃ ন্যায়বিন্দু পৃ ২৪. ১৯-২০)। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ হেতুর মধ্যে "কার্য" ও "স্বভাব" হেতু বিধিসাধক এবং "অনুপলব্ধি" নিষেধসাধক।

হেতুদ্বারা সাধ্যনির্ণয়ের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু হেতুর দ্বারা কেন সাধ্যনির্ণয় হইবে তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনীয়। ধরা যাক্, মহানসে (পাকশালায়) প্রথম ধূমের সহিত অগ্নি দেখিলাম। তাহার পর প্রদীপে ধূম ও অগ্নি একত্র দেখিলাম। আরও কয়েকবার ধূম ও অগ্নি এইরূপ এক জায়গায় দেখিয়া আমাদের মনে একটা ধারণা হইল, ধূমের সহিত অগ্নির একটী যোগ আছে, সাহচর্য আছে। ইহার পরও যত বার ধূম দেখি, তত বার ধূমের সহিত অগ্নি দেখি। অগ্নি নাই অথচ ধূম আছে, এরূপ কখনও দেখিতে পাইলাম না। পূর্বের ধারণা আরও সুস্পষ্ট হইল। ভাবিয়া লইলাম, ধূম ও

অগ্নির মধ্যে নিয়ত সাহচর্য বা অবিনাভাব (অর্থাৎ ধূম থাকিলে অগ্নি এবং অগ্নির অভাবে ধূমের অভাব) রহিয়াছে। ইহার পর একবার দূর হইতে পর্বতশিখরে ধূম দেখিলাম। তখন পূর্বলব্ধ ধূম ও অগ্নির নিয়তসাহচর্যজ্ঞানের স্মরণ হইল; অনুমান করিলাম, পর্বতটী অগ্নিমান্ বা পর্বতে অগ্নি রহিয়াছে। অনুমানটী অগ্নি ও ধূমের নিয়তসাহচর্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে। এখন ধূম ও অগ্নির নিয়ত সাহচর্য বা অবিনাভাব অর্থাৎ ধূম থাকিলে অগ্নি এবং অগ্নির অভাবে ধূমের অভাব যে সকল সময়ে এবং সকল দেশে সত্য হইবে তাহার হেতু কি? পূর্বে কোথাও অগ্নিবিহীন ধূম দেখা যায় না বলিয়া যে ভবিষ্যতে কোথাও দেখা যাইবে না, তাহার কোন নিশ্চয় নাই। ধূম ও অগ্নির একত্র অবস্থান সম্ভাবনামাত্র। এইরূপে অবিনাভাব অনিশ্চিত—অপ্রমাণ হওয়ায় অনুমান অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। যাঁহারা অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে চান না, তাঁহারা অনুমানের বিরুদ্ধে এই আপত্তি দেন (তুলনীয়—অথানুমানং ন প্রমাণম্—শতশঃ সহচরিতয়োরপি ব্যভিচারোপলব্ধেশ্চ লোকে ধূমাদি-দর্শনানন্তরং বহ্ন্যাদিব্যবহারশ্চ সম্ভাবনামাত্রাৎ...তত্ত্বচিন্তামণি—অনুমিতিখণ্ড, Bib. Indica, পৃ ২১-২২)। বৌদ্ধ নৈয়ায়িকেরা ইহার উত্তরে বলিবেন—হেতু ও সাধ্যের মধ্যে যদি এমন কোনরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় যে, হেতুধর্ম সাধ্যধর্ম হইতে উৎপন্ন (তদুৎপত্তি) অথবা হেতুধর্ম সাধ্যধর্মের স্বভাব (তাদাত্ম্য) তাহা হইলে হেতুর দ্বারা সাধ্যনির্ণয় অসম্ভব নহে। যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই উৎপন্ন বস্তুটী কোন স্থানে বর্তমান থাকিলে তাহার সেই উৎপাদক বস্তুও তথায় না থাকিয়া পারে না। অগ্নি হইতে ধূম উৎপন্ন হয়, ইহা সত্য হইলে যেখানে ধূম থাকিবে, সেখানে অগ্নি নিশ্চয়ই থাকিবে—কারণ ব্যতিরেকে কার্য হইতে পারে না। হেতু সাধ্যের স্বভাব হইলেও সাধ্যনির্ণয়ে কোন বাধা থাকিতে পারে না। যাহা শিংশপা, তাহা বৃক্ষ না হইয়া পারে না। যিনি বাংলাদেশের অধিবাসী, তিনি ভারতবর্ষেরও অধিবাসী। ধর্মকীর্ত্তি বলিয়াছেন,—

কার্যকারণভাবাদ্ বা স্বভাবাদ্ বা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাবনিয়মোঽদর্শনান্ন ন দর্শনাৎ॥

সর্বদর্শনসংগ্রহ, বৌদ্ধদর্শন।

'কার্যকারণভাব অথবা স্বভাব—দুইএর কোন একটী হইতে (দুইটী পদার্থের মধ্যে) অবিনাভাব সম্বন্ধ স্থির হয়। কেবলমাত্র (দুইটী পদার্থের) একসঙ্গে অবস্থানের দর্শন বা অদর্শনের দ্বারা অবিনাভাব নির্ণয় হয় না'। অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা অবিনাভাবের অবধারণ হয়, ইহা বলিলে সাধ্য ও হেতুর মধ্যে কখনও ব্যভিচার থাকিবে না এরূপ নিশ্চয় হয় না, কারণ অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানে যাহা প্রত্যক্ষতঃ দেখা যাইতেছে না—এরূপ স্থলে যে ব্যভিচারের আশঙ্কা আছে, তাহা নিবারিত হইবার উপায় কি? হেতু ও সাধ্যের কার্য-কারণ সম্বন্ধ দেখাইতে পারিলে

ব্যভিচারের আশঙ্কা থাকে না। কারণ ভিন্ন কার্য হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা স্বতঃই নিবৃত্ত হয়; কারণ ইহা অসম্ভব কল্পনা (ব্যাঘাত) এবং যতক্ষণ অবধি না এই অসম্ভব কল্পনা আসিয়া পড়ে, ততক্ষণ আশঙ্কা করা যাইতে পারে (ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা)।

এই তদুৎপত্তি বা কার্যকারণভাব উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধিপঞ্চকের দ্বারা হইয়া থাকে। উৎপত্তির পূর্বে কার্যের (১) অনুপলব্ধি, কারণের (২) উপলব্ধির পর, কার্যের (৩) উপলব্ধি, এই কার্যের উপলব্ধির পর কারণের (৪) অনুপলব্ধি, আবার কার্যের (৫) অনুপলব্ধি, দুইবার উপলব্ধি এবং তিনবার অনুপলব্ধি—উপলব্ধি ও অনুপলব্ধিতে মিলিয়া এই পাঁচটী কারণ সমষ্টি (পঞ্চকারণী) হইতে ধূম ও বহ্নির কার্য-কারণভাব নিশ্চয় হয়। এইরূপে তাদাত্ম্য বা স্বভাব নিশ্চয়ের দ্বারাও অবিনাভাবের নিশ্চয় হয়। যদি শিংশপার (বৃক্ষবিশেষ) বৃক্ষত্ব অপগত হয়, তাহা হইলে তাহার শিংশাপাত্বও অপগত হইবে অর্থাৎ তখন আর শিংশপাই থাকিবে না। (সর্বদর্শনসংগ্রহ—বৌদ্ধদর্শন)।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকেরা যে অবিনাভাব—প্রতিবন্ধ বা ব্যাপ্তি লইয়া এত আলোচনা করিয়াছেন, তাহার কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত ন্যায়সূত্রে পাওয়া যায় না। সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য মূলক হেতু এবং দৃষ্টান্তের দ্বারা সাধ্য নির্ণয়ের কথা আছে মাত্র। দৃষ্টান্তমূলক অনুমানকে ব্যাপ্তিমূলক করিয়া তোলাই ন্যায়-আলোচনার ক্ষেত্রে দিঙ্নাগাদি বৌদ্ধাচার্যগণের পরম কৃতিত্ব। বাৎস্যায়ন ব্যাপ্তির কথা স্পষ্টতঃ কিছু না বলিলেও, হেতু ব্যাখ্যান কালে (ন্যায়সূত্র ১।১।৩৪-৩৫) সাধ্য ও হেতুর মধ্যে ব্যাপ্তি-সূচক একটী বাক্য সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য উভয় প্রকার হেতুর সহিত যোজিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে সাধর্ম্য হেতুর রূপ,—"শব্দ অনিত্য, যেহেতু শব্দ উৎপত্তিধর্মক, যাহা উৎপত্তিধর্মক তাহা অনিত্য"। বৈধর্ম্য হেতুর রূপ,—"শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহা উৎপত্তিধর্মক; যাহা অনুৎপত্তিধর্মক তাহা নিত্য যেমন—আত্মা" (উৎপত্তিধর্মকত্বাদিতি। উৎপত্তিধর্মকমনিত্যং দৃষ্টমিতি।... অনিত্যঃ শব্দ উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ, অনুৎপত্তিধর্মকং নিত্যং যথা আত্মাদি দ্রব্যমিতি)। বাৎস্যায়নের এইরূপ হেতু প্রদর্শনে আমরা ব্যাপ্তির একটু আভাস পাইলাম। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাৎস্যায়ন বৈধর্ম্য হেতুর প্রয়োগে যে ব্যতিরেক বাক্যের—"যাহা অনুৎপত্তিধর্মক (উৎপত্তিধর্মক নহে), তাহা নিত্য (অনিত্য নহে)" প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের মতে 'বিপরীতব্যতিরেক' নামক দৃষ্টান্তাভাস (ন্যায়বিন্দু, ৩.১৩৬)। ব্যতিরেক বাক্যে সাধ্যাভাবে হেত্বভাব প্রদর্শনীয় (ন্যায়প্রবেশ, ১ম ভাগ, পৃ ২) এই নিয়ম অনুসারে উক্ত বাক্যটীর "যাহা নিত্য (অনিত্য নহে) তাহা অনুৎপত্তিধর্মক (উৎপত্তিধর্মক নহে)"—এইরূপ আকার হওয়া উচিত ছিল। যাহাই হউক, বাৎস্যায়নের হেতুব্যাখ্যান হইতে

বোঝা গেল, তাঁহার সময় ব্যাপ্তির কথা উঠিয়াছিল মাত্র, ব্যাপ্তিবাদের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই।

অনুমানের সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা হইয়াছে। এখন অনুমানঘটক বাক্য বা 'অবয়ব'-গুলির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া দরকার।

(১)	শব্দ অনিত্য	...	পক্ষ
(২)	যেহেতু উহা কৃতক	...	হেতু
	যাহাই কৃতক তাহাই অনিত্য	...	সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত
(৩)	যেমন ঘট		
	যাহা নিত্য (অনিত্য নহে) তাহা অ-কৃতক	...	বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ সাধারণতঃ পক্ষ-হেতু-দৃষ্টান্ত—এই তিনটী অবয়ব স্বীকার করেন। ধর্মকীর্ত্তির মতে পক্ষনির্দেশের ততটা আবশ্যকতা নাই (দ্বয়োরপ্যনয়োঃ প্রয়োগে নাবশ্যং পক্ষনির্দেশঃ—ন্যায়বিন্দু, ৩.৩৬)। 'উপনয়' ও 'নিগমন' তাঁহাদিগের মতে পুনরুক্তিমাত্র, নিরর্থক।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের মতে যাহা 'পক্ষ', গৌতম তাহাকে 'প্রতিজ্ঞা' বলিয়াছেন। জিতারি তদীয় 'হেতুতত্ত্বোপদেশে' (গ্তন্ ছিগ্স্ ক্যি দে খো ন ঞিদ্ ব্স্তন্ প। মূল সংস্কৃত পাওয়া যায় নাই; তিব্বতী অনুবাদ রহিয়াছে) এইভাবে পক্ষের লক্ষণ করিয়াছেন,—প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বস্তুতঃ বিদ্যমান (যাহা অলীক নহে) ধর্মের সহিত সংযুক্ত, বাদীর নিজের সাধ্যরূপে ঈপ্সিত (বাদী যাহাকে স্বয়ং সাধন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন) এবং বস্তুতঃ বিদ্যমান যে ধর্মী তাহাকে 'পক্ষ' বলে; যেমন শব্দ অনিত্য। অনিত্যতা একটী প্রসিদ্ধ ধর্ম, আর শব্দও একটী প্রসিদ্ধ ধর্মী, উভয়েই বস্তুতঃ বিদ্যমান—অলীক নহে, শব্দরূপ প্রসিদ্ধ ধর্মী অনিত্যতারূপ প্রসিদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট হইয়াছে। শব্দের অনিত্যতা বাদীর অভিপ্রেত, এবং ইহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানপ্রমাণের বিরোধী নহে। কাজেই 'শব্দ অনিত্য' একটী অদুষ্ট পক্ষের উদাহরণ।

যদি কোন বাদী বলে 'শব্দ অশ্রাবণ' (শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে), তাহা পক্ষ হইবে না। শব্দকে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করি, প্রত্যক্ষতঃ শব্দকে শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া জানি। তাই 'শব্দ অশ্রাবণ' বলিলে প্রত্যক্ষ-বিরোধ হয়। কাজেই প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বলিয়া উহা পক্ষ হইল না। (তত্র পক্ষঃ প্রসিদ্ধো ধর্মী প্রসিদ্ধবিশেষণেন বিশিষ্টঃ স্বয়ং সাধয়িতুম্ ইষ্টঃ প্রত্যক্ষাদ্যবিরুদ্ধঃ=দে ল ফ্যোগ্স্ নি রব্ তু গ্রুব্ প'ই ছোস্ চন্ নো। রব্ তু গ্রুব প'ই খ্যদ্ পর্ গ্যি ব্যে ব্রগ্ ব্দগ্ ঞিদ্ স্গ্রুব্ পর্ 'দোদ্ প ম্ঙোন্ সুম্ ল সোগ্স্ প 'গল্ প মেদ্ প ইন্ তে। তাঞ্জুর, ম্দো, সে. ৩৪৫ক ২-৩)।

হেতুর সম্বন্ধে অনেক কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত দ্বিবিধ; সাধর্ম্য দৃষ্টান্ত এবং বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত। দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিবার সময় হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্বোক্ত অনুমানের উদাহরণটীর প্রতি দৃষ্টি করিলেই বোঝা যাইবে, দৃষ্টান্তের সহিত সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্য বশতঃ হেতু সাধ্যের গমক হয় না, পরন্ত হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি বশতঃ হেতু সাধ্যের গমক হয়; দৃষ্টান্তটীতে সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের গ্রহণ হয় মাত্র।

পরবর্তিকালে বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে যখন অন্তর্ব্যাপ্তির কথা উঠিল, তখন তাঁহারা আর দৃষ্টান্তের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন না। হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ স্থির হইলেই অনুমান হইতে পারে। স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির জন্য অনুমানে দৃষ্টান্তের অপেক্ষা থাকে (তস্মাদ্ ব্যসনমাত্রং বহির্ব্যাপ্তিগ্রহণে বিশেষেণ সত্ত্বে হেতৌ কেবলং জড়ধিয়াম্ এব নিয়মেন দৃষ্টান্তসাপেক্ষঃ সাধনপ্রয়োগঃ পরিতোষায় জায়তে। তেষামেবানুগ্রহার্থম্ আচার্যো দৃষ্টান্তম্ উপাদত্তে। যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা ঘট ইতি। পটুমতয়স্তু নৈবং দৃষ্টান্তম্ অপেক্ষন্তে। অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থন; Six Buddhist Nyāya Tracts, পৃ ১১২)।

জৈন নৈয়ায়িক সিদ্ধসেনদিবাকরও বলিয়াছেন,—

> অন্তর্ব্যাপ্ত্যৈব সাধ্যস্য সিদ্ধের্বহিরুদাহৃতিঃ।
> ব্যর্থা স্যাত্তদসদ্ভাবেঽপ্যেবং ন্যায়বিদো বিদুঃ॥
>
> ন্যায়াবতার, ২০।

অন্তর্ব্যাপ্তি দ্বারা সাধ্যের সিদ্ধি হওয়ায় উদাহরণ নিরর্থক। আর অন্তর্ব্যাপ্তি না থাকিলে উদাহরণের দ্বারাও সাধ্যসিদ্ধি হয় না, কাজেই উদাহরণ উভয়তঃ নিরর্থক।

পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টান্ত—অনুমানের এই যে তিনটী অঙ্গ বা অবয়বের কথা বলা হইল, তাহার কোন একটীতে দোষ রহিয়া গেলে, অনুমানেও দোষ রহিয়া যাইবে। এই দুষ্ট অনুমানকে 'অনুমানাভাস' বলে। অনুমানাভাস ত্রিবিধ; পক্ষে দোষ থাকিলে, 'পক্ষাভাস'; হেতুতে দোষ থাকিলে, 'হেত্বাভাস'; আর দৃষ্টান্তে দোষ থাকিলে 'দৃষ্টান্তাভাস'। গৌতমের ন্যায়সূত্রে হেত্বাভাসের উল্লেখ আছে, কিন্তু পক্ষাভাস বা দৃষ্টান্তাভাসের উল্লেখ নাই। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত বলেন, পক্ষদোষ অর্থাৎ পক্ষাভাস এবং দৃষ্টান্তদোষ অর্থাৎ দৃষ্টান্তাভাস হেতুদোষ বা হেত্বাভাসের অন্তর্গত।

(যে চৈতে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধতাদয়ঃ পক্ষদোষাঃ যে চ বক্ষ্যমাণাঃ সাধনবিকলত্বাদয়ো দৃষ্টান্তদোষাস্তে বস্তুস্থিত্যা সর্বে হেতুদোষা এব প্রপঞ্চমাত্রং তু পক্ষদৃষ্টান্তদোষবর্ণনম্।......

অত এব চ শাস্ত্রেঽস্মিন্ মুনিনা তত্ত্বদর্শিনা।
পক্ষাভাসাদয়ো নোক্তা হেত্বাভাসাস্ত দর্শিতাঃ ॥

ন্যায়মঞ্জরী, পৃ ৫০২।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িক জিতারি হেতুতত্ত্বোপদেশে বলিয়াছেন,—(গৌতমাদি) পরকল্পিত 'পূর্ব্ববৎ', 'শেষবৎ' ও 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান অনুমানাভাস, কারণ 'তাদাত্ম্য' বা 'তদুৎপত্তি' সম্বন্ধ দ্বারা ব্যাপ্তিনির্ণয় হয় নাই। (কীদৃশা অনুমানাভাসাঃ, পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্টঞ্চেতি পরকল্পিতানি সর্বাণি অনুমানানি অনুমানাভাসাঃ, তেষাং তাদাত্ম্যতদুৎপত্তিলক্ষণেনাপ্রতিবন্ধাৎ = র্জেস্ স্থু দ্পগ্ প ল্তর্ স্নঙ্ ব চি 'দ্র প শি.গ্ চে ন। স্ঙ ম দঙ্ ল্দন্ প দঙ্ ল্হগ্ ম দঙ্ ল্দন্ প দঙ্। স্প্যি ম্থোঙ্ ব স্তে। গ্শ.ন্ গ্যিস্ ব্র্তগ.স্ প'ই র্জেস্ স্থু দ্পগ্ প থম্স্ চদ্ নি র্জেস্ স্থ দ্পগ্ ল্তর্ স্নঙ্ ব ইন্ তে। দে র্নমস্ ল দে'ই ব্দগ্ ঞিদ্ দঙ্ দে লস্ ব্যুঙ্ প'ই ম্ছ.ন্ ঞিদ্ কিয্স্ 'ব্রেল্ ব মেদ্ প'ই ফিয্র্ রো। তাঞ্জুর, ম্দো, সে. ৩৫৪খ ২-৩)।

কোন কোন বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের মতে অনুমানাভাসের সংখ্যা প্রায় দশসহস্র; পক্ষাভাস ৯২১৬, হেত্বাভাস ১১৭ এবং দৃষ্টান্তাভাস ৮৪, মোট ৯৪১৭ (Hindu Logic as preserved in China and Japan, পৃ ৫৯)। ন্যায়প্রবেশে নয় প্রকার পক্ষাভাস, চৌদ্দ প্রকার হেত্বাভাস (অসিদ্ধ ৪, অনৈকান্তিক ৬, এবং বিরুদ্ধ ৪) এবং দশ প্রকার দৃষ্টান্তাভাসের উল্লেখ রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তদীয় বৌদ্ধন্যায় শীর্ষক প্রবন্ধে ন্যায়প্রবেশ ও ন্যায়বিন্দুর উল্লিখিত পক্ষাভাসাদির বিবরণ দিয়াছেন। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, একবিংশভাগের বৌদ্ধন্যায় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।*

---

* এই প্রবন্ধ রচনায় পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের নিকট বিশেষ উৎসাহ ও সহায়তা পাইয়াছি। কৃতজ্ঞতার সহিত এখানে তাঁহার উল্লেখ করিতেছি।

মন্তব্য

তিব্বতী অক্ষরের বাঙ্গালা প্রত্যক্ষর—

অ ই উ এ ও	...	(স্বরবর্ণ)
আ ঈ ঊ ঐ ঔ	...	(সংস্কৃত শব্দের জন্য)
ক খ গ ঙ		
চ ছ জ ঞ	...	পশ্চিম বঙ্গের মত উচ্চারণ
চ. ছ. জ.	...	পূর্ববঙ্গের মত (=ts, ts-h, dz)
ট ঠ ড ণ	...	(সংস্কৃত শব্দে আগত)
ত থ দ ন		
প ফ ব ম		
ঘ ঝ ঢ ধ ভ	...	(কেবল সংস্কৃত শব্দে আসে)
য় র ল ব়		
শ স		
ষ	...	(মাত্র সংস্কৃত শব্দে আসে)
শ. স.	...	(সংস্কৃত তালব্য শ=ś, ইংরেজী sh, এবং সংস্কৃত দন্ত্য স=s, ইংরেজী hiss শব্দের ss—ইহাদের ঘোষবৎরূপ ; শ.=ঘোষ শ=ź, স. =ঘোষ স =z ; উচ্চারণে যথাক্রমে zh ও z)
হ	...	(সংস্কৃতবৎ)
'	...	(তিব্বতীয় বিশিষ্ট ধ্বনি, glottal stop, আরবীর alif hamzah—কণ্ঠনালীতে উচ্চারিত স্পৃষ্ট ধ্বনি)

শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— গ্রন্থের স্থল নির্দ্দেশে পৃ (=পৃষ্ঠার) উল্লেখ না থাকিলে সংখ্যাগুলি যথাসম্ভব অধ্যায়, **আহ্নিক,** সূত্র, শ্লোকাদির জ্ঞাপক হইবে।

শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. লিট. মহাশয়ের নির্দেশানুসারে তিব্বতী অক্ষরের বাঙ্গালা প্রত্যক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রাচীন বঙ্গে বেদ-চর্চ্চা

বাঙ্গালী বিদ্যার্থিগণের বেদ-চর্চ্চায় শৈথিল্য দেখিয়া একজন বিখ্যাত পণ্ডিত 'মিত্রগোষ্ঠী' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,—বঙ্গদেশের জল-বায়ু বেদ-বিদ্যা প্রসারের অনুকূল নহে। তিনি অবশ্য বর্ত্তমান-কালের অবস্থা দর্শনেই আক্ষেপ করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালেও বাঙ্গালীর মনীষা যথোচিতরূপে বেদালোচনায় নিয়োজিত হইয়াছিল কি না, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। বঙ্গের বিশিষ্ট প্রতিভার নিদর্শনস্বরূপ যে-সকল গ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বৈদিক গ্রন্থের সংখ্যা অধিক নহে। গুণবিষ্ণু, হলায়ুধ, রামনাথ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি কয়েকজন বঙ্গীয় পণ্ডিত নানাবিধ গৃহ্য কর্ম্মের উপযোগী বৈদিক মন্ত্রগুলির উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এই ভাষ্যকারগণের গ্রন্থে বেদ-জ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায়, এবং প্রাচীন গ্রন্থ, শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি লেখসমূহে বাঙ্গালা দেশে বেদ-চর্চ্চার যাহা কিছু নিদর্শন লক্ষিত হয়, এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব এবং বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ প্রাচীনকালে বেদবিদ্যায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালায় বৈদিক ধর্ম্মের প্রথম প্রবেশ

বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, পঞ্জাব ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের গন্ধার, কেকয় ও মদ্রজাতির মধ্যে এবং মধ্যদেশের কুরু ও পঞ্চাল জাতির মধ্যে বৈদিক সভ্যতা প্রথম বিকাশ লাভ করে এবং তাহার পর বেদপন্থী আর্য্যগণ ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া নূতন অধিকৃত দেশসমূহে বৈদিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন।[১] এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি প্রাচ্য দেশসমূহে উত্তরকালে বেদাচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

---

১ এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের আলোচনা দ্রষ্টব্য।—

Keith, *Cambridge History of India*, vol. I, pp. 79-81 ; Hopkins, *Journal of the American Oriental Society*, vol. xix, pp. 19-28 ; Pischel and Geldner, *Vedische Studien*, vol. II, p. 218 ; vol. III, p. 152 ; Macdonell and Keith, *Vedic Index*, vol. I, p. 468 ; Suniti Kumar Chatterji, *Origin and Development of the Bengali Language*, p. 43.

অথর্ব্ব বেদের একটি মন্ত্রে (৫।২২।১৪) একজন ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন—"জ্বররোগ (তক্মন্) এদেশ হইতে প্রস্থান করিয়া সুদূরবর্ত্তী অঙ্গ ও মগধদেশ আক্রমণ করুক।" এই উক্তি হইতে অনুমান করা হয় যে, বিধর্ম্মীর অধিকৃত দেশ বলিয়াই অঙ্গ ও মগধের প্রতি মধ্যদেশীয় বৈদিক ঋষির বিদ্বেষভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদেশ, অঙ্গ ও মগধ অপেক্ষা আরও পূর্ব্বে অবস্থিত, সুতরাং এই দুই দেশ অতিক্রম না করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম অবশ্যই বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।[২]

শতপথব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে যে, বিদেঘ মাথব বৈদিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমি সরস্বতীতীর হইতে যাত্রা করিয়া সদানীরা নদীর অপর পারে বিদেহ দেশে অর্থাৎ বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের উত্তরাংশে আগমন করেন।[৩] এই আখ্যানকেই বৈদিক আর্য্যগণের উক্ত প্রদেশ অধিকারের বর্ণনা বলিয়া গণ্য করা হয়। ঐতরেয় আরণ্যকে বেদধর্ম্মের উল্লঙ্ঘনকারীরূপেই বঙ্গ, বগধ ও চেরপাদগণের উল্লেখ আছে।[৪] বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রে কয়েকটি নিষিদ্ধ দেশের নাম উল্লিখিত আছে। তাহার মধ্যে পুণ্ড্র ও বঙ্গের নাম দেখা যায়।[৫] উত্তর বঙ্গের এক অংশের প্রাচীন নাম পুণ্ড্র এবং আধুনিক পূর্ব্ব বঙ্গই প্রাচীন বঙ্গভূমি।[৬] এই সকল দেশে গমনে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতকে বৌধায়নের কাল নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই সময়েও বঙ্গভূমি বেদাচার-বহির্ভূত দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। আদিপুরাণেও তীর্থযাত্রা ব্যতীত বঙ্গদেশে গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে।[৭]

প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গদেশের নিন্দা

---

২ কেহ কেহ মনে করেন যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের পূর্ব্বাংশেও বৈদিক ঋষিদের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। "By the time of the Atharvaveda...the occupation of Eastern India must have been completed."—H. C. Chakladar, *Modern Review*, 1930, p. 44.

৩ শতপথব্রাহ্মণ ১।৪।১।১৪।

৪ প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মীয়ুরিতি। যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ।—ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১।৫। কিন্তু সায়ণাচার্য্য বঙ্গ, বগধ ও চেরপাদ শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন।

৫ আরট্টান্ কারস্করান্ পুণ্ড্রান্ সৌবীরান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গান্ প্রানূনামিতি চ গত্বা পুনস্তোমেন যজেত সর্ব্বপৃষ্ঠয়া বা।—বৌধায়নধর্ম্মসূত্র ১।১।৩০।

৬ Nundo Lal Dey, *Geographical Dictionary of Ancient and Midiæval India*, p. 22.

৭ অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
বিনা যাত্রাং তু যো গচ্ছেৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।
—মিত্রমিশ্র-কৃত 'বীরমিত্রোদয়' গ্রন্থের সংস্কারপ্রকাশে (চৌখাম্বা সংস্করণ, পৃ ৪৪৬) উদ্ধৃত আদিপুরাণ।

উপরে প্রদর্শিত শ্রৌত ও স্মার্ত্ত গ্রন্থে বাঙ্গালাদেশের নিন্দাসূচক উল্লেখের দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই দেশ পূর্ব্বে অবৈদিক আচার গ্রহণের জন্য বেদাচারের বিকাশভূমি মধ্য-দেশের অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল। মহাভারত (আদি, ১০৪ অধ্যায়), বায়ুপুরাণ (৯৯ অঃ) ও মৎস্য-পুরাণে (৪৮ অঃ) বর্ণিত আছে যে, অসুররাজ বলির পাঁচ পুত্রের নাম হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও কলিঙ্গ এই পাঁচ দেশের নামকরণ হইয়াছে। বঙ্গদেশে অসুর-প্রভাবের নানারূপ নিদর্শন আছে। দিনাজপুর জেলায় বাণগড় বা দেবীকোটনামক স্থানে অসুররাজ বাণের রাজধানী ছিল, এইরূপ অনুমান করা হয়।[৮] হয়ত এই অসুরগণ বিরুদ্ধাচরণ করাতেই প্রাচীনকালে বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই। খ্রীষ্টজন্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে সুহ্মে ও পুণ্ড্রে অর্থাৎ পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে জৈন ধর্ম্ম প্রবল প্রতাপে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহাও বিভিন্ন জৈন গ্রন্থের উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়।[৯] প্রবর্দ্ধমান জৈনধর্ম্ম এবং প্রতিবেশী রাজ্য মগধে প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্ম, এই দুই অবৈদিক ধর্ম্ম অবশ্যই বঙ্গদেশে বেদাচার প্রবর্ত্তনে প্রতিকূলতা করিয়াছিল। কালক্রমে অবৈদিক ধর্ম্মের অধিকার মন্দীভূত হইলেও তাহার প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এই জন্য বহুকাল পর্য্যন্ত এদেশে বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

বঙ্গে অবৈদিক ধর্ম্মের প্রভাব

রামায়ণ, মহাভারত এবং বায়ু, মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণে পুণ্ড্র, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত ও বঙ্গের উল্লেখ আছে।[১০] ঐ পুরাণগুলিতে ভারতবর্ষের যেরূপ সীমানির্দ্দেশ দেখা যায়, তাহাতে মনে হয় যে, কিরাতদেশ অর্থাৎ ত্রিপুরা জেলার পশ্চিমভাগ পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশকে বেদানুগামী ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ধরা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত পূর্ব্বদেশেও পুণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ) ও কামরূপে মুনিরা তপস্যা করিতেন, যাজ্ঞিকেরা হোম করিতেন।[১১] মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে স্পষ্ট কথিত আছে যে,

বঙ্গে বেদাচার প্রবর্ত্তন ও

---

৮ D. R. Bhandrkar, *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, vol. xii, p. 113.

৯ আচারাঙ্গসূত্র, পৃ ৪৪ ; কল্পসূত্র, পৃ ৭৯ ; জৈন হরিবংশ, ৬১ ও ৬২ পর্ব্ব।

১০ রামায়ণ, অযোধ্যা, ১০ ; মহাভারত, আদি ১১৩,৫৩-৫৫ ; ভীষ্ম ৯, ৪৬। বায়ুপুরাণ ৪৫শ অঃ ; মৎস্যপুরাণ ১১৪ শ অঃ ; বিষ্ণুপুরাণ ২য় অংশ, ৩য় অঃ।

১১ পূর্ব্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ।
পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গা মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্ব্বশঃ॥
*   *   *   *
তপস্তপ্যন্তি মুনয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ।—বিষ্ণুপুরাণ ২।৩।১৫ ও ২০।

পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ ও মগধের অধিবাসিগণ 'শাশ্বত ধর্ম্ম' জানিতেন।[১২] অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মতে আনুমানিক ২৫০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ভারতবর্ষে বেদানুমোদিত ধর্ম্ম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।[১৩]

পাণিনীয় মহাভাষ্যে ব্যাকরণের উদাহরণ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি লিখিয়াছেন,—"লোকেশ্বর আজ্ঞাপয়তি ...প্রাগঙ্গং গ্রামেভ্যো ব্রাহ্মণা আনীয়ন্তামিতি।" নরপতি আজ্ঞা করিতেছেন,—পূর্ব্বদিকে অঙ্গদেশ পর্য্যন্ত [ব্রাহ্মণ-বসতি স্থাপনার্থ] গ্রাম হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন কর।[১৪] এই উদাহরণ হইতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব দেখিয়া শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজা পুষ্যমিত্র দূর দূরান্তর হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন; সেই ঘটনাই তাঁহার সমসাময়িক ভাষ্যকার পতঞ্জলির গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রাচ্য দেশে ব্রাহ্মণ আগমন

বঙ্গদেশের বিভিন্ন কুলপুস্তকের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, গৌড়েশ্বর মহারাজ আদিশূরের সভায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব হইয়াছিল। তিনি কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। ৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে (রাঢ়ীয়কুলমঞ্জরীর মতে ৬৬৮ শকে অর্থাৎ ৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে) এই ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে আগমন করেন। ইঁহারাই বঙ্গের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে'র রাজন্যকাণ্ডে বিভিন্ন কুলগ্রন্থের বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের কুলপুস্তকে বর্ণিত আছে, গৌড়াধিপ শ্যামলবর্ম্মার 'শাকুন সত্র' সম্পাদনের জন্য কনৌজ-নিবাসী যশোধর মিশ্র প্রভৃতি বেদবিদ্যায় পারদর্শী পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করেন। অধিকাংশ কুলগ্রন্থের মতে ১০০১ শকাব্দ অর্থাৎ ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দ যশোধরের আগমনকাল।[১৫] শ্যামল বর্ম্মার রাজত্বকালে আগত এই বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদিগের বংশধরেরা অদ্যাপি 'পাশ্চাত্ত্য বৈদিক' নামে পরিচিত।

১২। কুরবঃ সহপাঞ্চালা সাল্বা মাৎস্যাঃ সনৈমিশাঃ।
কোশলাঃ কাশপৌণ্ড্রাশ্চ কালিঙ্গা মাগধাস্তথা।
চেদয়শ্চ মহাভাগা ধর্ম্মং জানন্তি শাশ্বতম্। —মহাভারত, কর্ণ ৪৮।১৪-১৫।

১৩। *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, vol. xii, p. 111.

১৪। পাতঞ্জল মহাভাষ্য ৬।১।২।

১৫। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', ব্রাহ্মণকাণ্ড, তৃতীয় অংশ, পৃ ৩৯।

কুলগ্রন্থের বর্ণনায় অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলেও, মূল ঘটনার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না।[১৬] বঙ্গদেশে একাধিক বার ব্রাহ্মণ আমদানী করা হইয়াছিল, একথা সত্য বলিয়াই মনে হয়। তাহার ফলে দেশে বেদানুমোদিত ধর্ম্ম দৃঢ়মূল হইয়াছে, এবং অবৈদিক ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছে, কিংবা রূপান্তরিত হইয়া বৈদিক ধর্ম্মের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। কিন্তু কুলপুস্তকে বর্ণিত ব্রাহ্মণ আগমনের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন না—এইরূপ অনুমান অসঙ্গত, তাহা আমরা প্রাচীন তাম্রশাসন আলোচনাকালে দেখাইব।

বেদবিদ্যায় বাঙ্গালীর অজ্ঞতার উল্লেখ

প্রাচীন কালে বেদবিরুদ্ধ আচার গ্রহণের জন্য শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে বঙ্গদেশ নিন্দাভাজন হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছি। পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থেও বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ বেদ-চর্চ্চায় শৈথিল্যের জন্য তিরস্কৃত হইয়াছেন। 'কুসুমাঞ্জলি'-রচয়িতা উদয়নাচার্য্য কোন এক গৌড় মীমাংসককে অবজ্ঞার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতকে বরদরাজ মিশ্র তাঁহার 'কুসুমাঞ্জলি-বোধিনী' টীকায় উক্ত গৌড় মীমাংসককে 'পঞ্চিকা'কাররূপে নির্দ্দেশ করিয়া সমস্ত গৌড়বাসীদিগের বেদ-জ্ঞান সম্বন্ধে তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন।[১৭] 'প্রকরণপঞ্চিকা' নামক প্রসিদ্ধ মীমাংসাগ্রন্থের রচয়িতা শালিকনাথ খ্রীষ্টীয় নবম শতকের প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। এই তিরস্কার-সূচক উক্তি যদি তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা বিদ্বেষ-প্রসূত স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয় নবম বা দশম শতকে কোন গৌড়ই বেদ জানিতেন না, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। যেমন কাব্যে গৌড়ী রীতির উপযোগিতা সত্ত্বেও 'কাব্যাদর্শ' প্রভৃতি অলঙ্কারগ্রন্থে উক্ত রীতির অবিমিশ্র নিন্দা দেখিয়া উহা প্রাদেশিক পক্ষপাতের ফল বলিয়া মনে করা হয়,[১৮] বরদরাজের গ্রন্থে গৌড়ীয়দিগের বেদজ্ঞানের নিন্দা সম্বন্ধেও সেরূপ মনে করিবার কারণ আছে। অবশ্য এস্থলে কেবল বঙ্গদেশই 'গৌড়' শব্দের লক্ষ্য না-ও হইতে পারে, কারণ ঐ শব্দে মুখ্যতঃ বঙ্গভূমিকে বুঝাইলেও বিন্ধ্যের উত্তরদিকে আরও চারিটি দেশকে 'গৌড়' বলা হইত।[১৯] যাহা হউক, শালিকনাথের সময়ে গৌড়ে বেদবিদ্ পণ্ডিতের অভাব ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

১৬। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', ১ম ভাগ, ২৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৭। গৌড়ো মীমাংসকঃ পঞ্চিকাকারঃ। গৌড়ো হি বেদাধ্যয়নাভাবাদ্ বেদত্বং ন জানাতীতি গৌড়মীমাংসক ইত্যুক্তম্।—'কুসুমাঞ্জলি-বোধিনী, সরস্বতীভবন গ্রন্থমালা, পৃ ১২৩।

১৮। Sivaprasad Bhattacharya, Gaudi Riti in Theory and Practice, *Indian Historical Quarterly*, vol. iii, pp. 376-394.

১৯। সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিলিকোৎকলাঃ। পঞ্চ গৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ।—স্কন্দপুরাণ

তাম্রশাসন, শিলালিপি ও প্রাচীন গ্রন্থে বাঙ্গালীর যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদ-চর্চ্চার উল্লেখ

দিনাজপুর জেলায় দামোদরপুর গ্রামে প্রাপ্ত পাঁচখানি তাম্রশাসনের উক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে গুপ্তরাজগণের শাসন সময়ে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন।[২০] একজন ব্রাহ্মণ 'অগ্নিহোত্র' সম্পাদনের জন্য এবং আর একজন 'পঞ্চ মহাযজ্ঞ' অনুষ্ঠানের জন্য পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ের শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন।[২১]

ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত তিনখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায়,—খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে ধর্ম্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের 'বারক মণ্ডলে' ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বেদাধ্যয়ন প্রচলিত ছিল। প্রথম শাসনখানির গ্রহীতা ভরদ্বাজগোত্রজ চন্দ্রস্বামী যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়-শাখাবলম্বী ষড়ঙ্গাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন।[২২] দ্বিতীয় ও তৃতীয় শাসনের গ্রহীতারাও উভয়েই কাণ্ব-বাজসনেয়-শাখার অনুগামী ছিলেন।[২৩]

সপ্তম শতকের মধ্যভাগে খোদিত ত্রিপুরা-তাম্রশাসনে দেখা যায়,—প্রদোষ শর্ম্মা নামে একজন ব্রাহ্মণ চারি বেদে অভিজ্ঞ ('চাতুর্ব্বিদ্য') শতাধিক ব্রাহ্মণের বাসের জন্য রাজা লোকনাথের নিকট ভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।[২৪] প্রদোষ শর্ম্মার মাতামহ বুধস্বামী 'অগ্ন্যাহিত' ব্রাহ্মণ ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার গৃহে সর্ব্বদা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত।[২৫]

রাজতরঙ্গিণীতে (৪।৪৬১) ও পঞ্চ গৌড়ের উল্লেখ আছে। 'শব্দ-কল্পদ্রুমে' উদ্ধৃত 'শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রে' গৌড়ের এইরূপ সীমানির্দ্দেশ দেখা যায়,—

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥

২০ R. G. Basak, Damodarpur Copper-plate Inscriptions.—*Epigraphia Indica*, vol. xv, p. 129.

২১ *Ibid.*, pp. 130, 133.

২২ Grant of the Time of Dharmāditya, l. 19.—*Indian Antiquary*, 1910, p. 196.

২৩ Second Grant of the Time of Dharmāditya, ll. 10, 11; Grant of the Time of Gopachandra, l. 13.—*Indian Antiquary*, 1910, pp. 200, 204.

২৪ Tipperah Copper-plate Grant of Lokanātha, l. 24.—*Epigraphia Indica*, vol. xv, p. 307.

২৫ *Ibid.*, l. 18.

এই সকল তাম্রশাসনের বিবরণ হইতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, কুলপুস্তকে বর্ণিত ব্রাহ্মণ আগমনের পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান ছিলেন।

নেপালের রাজকীয় পুথিশালায় চতুর্ভুজ-বিরচিত 'হরিচরিত' কাব্যের একখানি পুথি আছে। চতুর্ভুজ সেই গ্রন্থের পুষ্পিকায় বলিয়াছেন,—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্ণরেখ গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের নিকট হইতে বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত করঞ্জনামক একখানি গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রামে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্রে নিপুণ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন।[২৬] স্বর্ণরেখের পৌত্র আচার্য্য দিবাকর ত্রয়ী-পরায়ণ ছিলেন।[২৭] সুতরাং দেখা যাইতেছে, পালবংশীয় ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে বরেন্দ্র ভূমিতে শ্রুতিবিদ্ ব্রাহ্মণগণের বসতি ছিল।

দিনাজপুরে আবিষ্কৃত ভট্ট গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভ-লিপি হইতে জানা যায়,—খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে পালরাজ দেবপালের মন্ত্রী দর্ভপাণি 'বেদচতুষ্টয়রূপ মুখপদ্মলক্ষণাক্রান্ত' ছিলেন।[২৮] তাঁহার পৌত্র কেদারমিশ্র "বাল্যকালেই একবার মাত্র দর্শনে চতুর্ব্বিদ্যা-পয়োনিধি পান করিয়া তাহা আবার উদ্গীরণ করিতে পারিতেন"।[২৯] শিলালিপির এই উক্তিতে দর্ভপাণি ও কেদারমিশ্রের বেদ-মন্ত্র কণ্ঠস্থ করার কথা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই 'বৃহস্পতি-প্রতিকৃতি' কেদারমিশ্রের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া রাজা শূরপাল বহুবার মস্তকে শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

২৬ গ্রামোত্তমোঽস্ত্যমলমঞ্জুগুণৈকপুঞ্জঃ শ্রীমান্ করঞ্জ ইতি বন্দ্যতমো বরেন্দ্র্যাম্।
যত্র শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পদপ্রবীণাঃ সচ্ছাস্ত্রকাব্যনিপুণাঃ স্ম বসন্তি বিপ্রাঃ॥
কীর্ণঃ প্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণকামঃ শ্রীস্বর্ণরেখ ইতি বিপ্রবরোঽবতীর্ণঃ।
তং গ্রামমগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং জগ্রাহ শাসনবরং নৃপধর্ম্মপালাৎ॥

—*Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Manuscripts belonging to the Durbar Library, Nepal* (vol. I) by Mm. Haraprasad Shastri, p. 134.

২৭ ত্রয়ীপরঃ কাশ্যপগোত্রভাস্করস্তৎপুত্র আচার্য্যবরো দিবাকরঃ। *Ibid.*, p. 135.

২৮ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা, পৃ ৭৮। এইস্থলে মূল সংস্কৃত পাঠ—'বিদ্যাচতুষ্টয়মুখাম্বুরুহাস্যলক্ষ্মা'; 'বিদ্যাচতুষ্টয়' শব্দে চারি বেদ গৃহীত হইয়াছে।

২৯ সকৃদ্দর্শনসম্পীতান্ চতুর্ব্বিদ্যাপয়োনিধীন্।
মহাসাগরস্যাসম্পত্তিমুদ্গিরন্ বাল এব সঃ॥
গৌড়লেখমালা, পৃ ৭৭।

ইহা দ্বারা বুঝা যায়,—শূরপালদেবের শাসন-সময়েও বরেন্দ্রমণ্ডলে যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত।[৩০] কেদারমিশ্রের পুত্র ভট্ট গুরবমিশ্র 'বেদার্থ-চিন্তাপরায়ণ' ছিলেন এবং স্বয়ং শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।[৩১] এই শিলাস্তম্ভ-লিপি হইতে জানা গেল, খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতকে পালরাজত্বের সময়ে গুরবমিশ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে বেদবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং স্বয়ং গুরবমিশ্র বেদের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনেও এই গুরবমিশ্র 'অঙ্গ সমূহের সহিত সমগ্র বেদের অধীতী' এবং 'মহাদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।[৩২]

দেবপালদেবের সমসাময়িক নারায়ণের রচিত 'ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশ' নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে এবং উহার প্রথম অংশ এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কাত্যায়ন-কৃত 'ছন্দোগপরিশিষ্টে'র টীকা। এই টীকা প্রকৃতপক্ষে স্মৃতিগ্রন্থ হইলেও ইহাতে রচয়িতার বেদজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নারায়ণের পূর্ব্বপুরুষগণও বেদজ্ঞ ছিলেন। তিনি টীকার প্রারম্ভে পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহারা উত্তররাঢ়ে বাস করিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে পরিতোষ 'সোমপীথী' ও বেদের 'দেহবন্ধ'স্বরূপ ছিলেন[৩৩]। ধর্ম্ম নামে তাঁহার এক পুত্র বৈদিক ক্রিয়ায় পরম জ্ঞানী ছিলেন।[৩৪] ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, খ্রীষ্টীয় নবম শতকে উত্তর-রাঢ়ে সোমযাগের প্রচলন ছিল এবং বেদবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির অভাব ছিল না।

খ্রীষ্টীয় ১০ম শতকে মহীপালদেবের বাণগড়-লিপিতে উল্লিখিত চবটিগ্রাম-নিবাসী কৃষ্ণাদিত্য

---

৩০ গৌড়লেখমালা, পৃ ৮২।

৩১ ঐ, ৮৩ ও ৮৪ পৃষ্ঠা।

৩২ যঃ সর্ব্বাসু শ্রুতিষু পরমঃ সার্দ্ধমঙ্গৈরধীতী
যো যজ্ঞানাং সমুদিতমহাদক্ষিণানাং প্রণেতা।
গৌড়লেখমালা, পৃ ৬২।

৩৩ চরিতমহতি যেষামন্বয়ে সোমপীথী
সমজনি পরিতোষশ্ছন্দসাং দেহবন্ধঃ।
অলভত স হি বিপ্রাচ্ছাসনং তালবাটীং
তদিহ ভজতি পূজামুত্তমা যেন রাঢা॥
ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশ, শ্লো ৩, পৃ ২।

৩৪ শ্রৌতে বিধৌ সততনির্ম্মলধীপ্রসারঃ:—ঐ, শ্লো ৫, পৃ ২।

যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়-শাখা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন[৩৫] এবং পরবর্ত্তী শতকে তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-শাসনের গ্রহীতা ছত্রাগ্রাম-নিবাসী খোদ্দুল্ল দেবশর্ম্মা এবং মদনপালের তাম্রশাসনোক্ত চম্পাহিট্টি-নিবাসী বটেশ্বর স্বামিশর্ম্মা সামবেদের কৌথুম-শাখাধ্যায়ী ছিলেন।[৩৬]

৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত সাঙ্গ্‌লী-তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে যে, রাষ্ট্রকূটবংশীয় চতুর্থ গোবিন্দ কেশব-দীক্ষিতনামক এক ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। উক্ত লিপি হইতে জানা যায়,—পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর হইতে আগত কেশবের পিতা যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়-শাখা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।[৩৭] এই স্থলে দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে একজন উত্তর বঙ্গবাসী বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ অন্য দেশে যাইয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ১২শ শতকে কামরূপরাজ বৈদ্যদেব বরেন্দ্রী-নিবাসী সোমনাথকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। তৎসম্পর্কিত তাম্রশাসনে সোমনাথকে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্যের জন্য সর্ব্বোত্তম শ্রোত্রিয় বলা হইয়াছে এবং শ্রৌত ও স্মার্ত্ত বিদ্যায় বৃহস্পতির সহিত তুলনা করা হইয়াছে।[৩৮]

উপরি উদ্ধৃত প্রাচীন শাসনসমূহের প্রমাণ হইতে দেখা যাইতেছে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক ও তাহার পরবর্ত্তী কালে বঙ্গদেশে বহু বেদজ্ঞ পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা ভূতিবর্ম্মার সময়ে তদানীন্তন কামরূপ এবং অধুনাতন উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গের একটি গ্রামে বহুসংখ্যক বিভিন্নবেদীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাহা আমরা ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি।[৩৯] তাহা হইলে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ-সমাজ ছিল না, একথা সত্য

---

৩৫ বাণগড় লিপি, পংক্তি ৪৭, ৪৮। —গৌড়লেখমালা, পৃ ৯৭।

৩৬ Amgachi Grant of Vigrahapala III, ll. 38, 39.—*Epigraphia Indica*, vol. xv, p. 298.

মনহলি-লিপি, পঙ্‌ক্তি ৪৩।—গৌড়লেখমালা, পৃ ১৫৪।

৩৭ Sangli Plate of the Rāṣṭrakūṭa Govinda iv. ll. 46, 47.—*Indian Antiquary*, xii, p. 257.

৩৮ তীর্থেষু ভ্রমণাচ্ছ্রুতাধ্যয়নতো দানাত্তথাধ্যাপনাদ্
যজ্ঞানাং করণাদ্‌ব্রতৈকচরণাৎ সর্ব্বোত্তরঃ শ্রোত্রিয়ঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তরহস্যেষু বাগীশ ইব বিশ্রুতঃ।
কমৌলি-লিপি, ২৬শ ও ২৭ শ্লোক—গৌড়লেখমালা, পৃ ১৩৪।

৩৯ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, কামরূপ-শাসনাবলী, পৃ ৯।

হইতে পারে না। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, শুঙ্গ নরপতি পুষ্যমিত্রের সময় হইতে প্রাচ্য দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা হইয়াছিল। অনুমান হয়, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যে সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডে ঐ ধর্ম্ম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং বেদপন্থী ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশের পূর্ব্বদিকে কামরূপ পর্য্যন্ত বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারাই ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসনে উল্লিখিত বিভিন্নবেদীয় ব্রাহ্মণ। এই তাম্রশাসনে বিভিন্ন বেদের বিভিন্ন শাখাবলম্বী ২০৫ জন ব্রাহ্মণের নাম আছে। ইহার মধ্যে ১০৫ জন বাজসনেয় (শুক্ল-যজুর্ব্বেদী), ৭৪ জন বাহ্বৃচ্য (ঋগ্বেদী), ১৫ জন ছান্দোগ (সামবেদী), ৯ জন চারক্য (কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদী) এবং ২ জন ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয় (কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদী) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।[৪০] খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভাস্করের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ভূতিবর্ম্মা এই ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিয়াছিলেন।

বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে, কাণ্ব-শাখাবলম্বী অধ্বর্য্যু দেবধর ভট্ট নিরাকুল চিত্তে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।[৪১]

ইঁহারই সমসাময়িক রত্নবর্ম্মার প্রথম তাম্রশাসনে কথিত আছে,—'পরাশরগোত্রজ কাণ্বশাখার বাজসনেয়িগণের অগ্রণী দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন; বেদবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই ব্রাহ্মণকে লাভ করিয়া ত্রয়ী (বেদবিদ্যা) কৃতার্থম্মন্য হইয়াছিলেন"।[৪২]

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে প্রদত্ত ধর্ম্মপালের প্রথম তাম্রশাসনে শ্রাবস্তি নামে এক জনপদের উল্লেখ আছে। শ্রাবস্তির অন্তর্গত কোসঞ্জ গ্রামে 'কলির পাপ, যাজ্ঞিকগণের হোমধূমে অন্ধ হওয়াতে, প্রবেশ করিতে পারে নাই। সেই গ্রামে কৌথুম-শাখী ব্রাহ্মণদিগের নেতা, সামবেদজ্ঞ-দিগের মধ্যে অখণ্ডনীয় প্রতাপবান্, শাণ্ডিল্যগোত্রজ রামদেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন'।[৪৩]

---

৪০ ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসন, পংক্তি ৫৪-১২৬;—কামরূপ-শাসনাবলী, পৃ ১৭-২৬।

৪১ অধ্বর্য্যুণা যেন কৃতং বিতত্য বৈতানিকং কর্ম্ম নিরাকুলেন।
বলবর্ম্মার তাম্রশাসন, শ্লোক ২৭।—কামরূপ-শাসনাবলী, পৃ ৭৮।

৪২ পরাশরোঽভূদ্ভুবি দেবদত্তঃ কাণ্বোঽগ্রজো বাজসনেয়কাগ্র্যঃ।
আসাদ্য যং বেদবিদাং পরার্ধ্যং ত্রয্যা কৃতার্থাস্মিতমেব সম্যক্ ॥১৬
কামরূপ-শাসনাবলী, পৃ ৯৯।

৪৩ গ্রামঃ কোসঞ্জনামাস্তি শ্রাবস্ত্যাং যত্র যজ্বনাম্।
হোমধূমান্ধকারান্ধং নাবিশৎ কলিকল্মষম্ ॥
তৎসম্ভবানাং প্রবরো দ্বিজানামুদারধীঃ কৌথুমশাখমুখ্যঃ।
রামোপমঃ সামবিদামখণ্ড্যঃ শাণ্ডিল্যগোত্রোঽজনি রামদেবঃ।—ঐ, পৃ ১৫৫।

বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত একাদশ শতকের শিলিমপুর-শিলালিপিতে শ্রাবস্তির অন্তর্গত তর্কারি গ্রামকে ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঐ গ্রামে বেদ ও স্মৃতির আলোচনা করিয়া দ্বিজগণ বারংবার শ্রৌত ও গৃহ্য হোমের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদিগের কীর্ত্তিদ্বারা শুভ্র আকাশে হোমধূম উত্থিত হইয়া ক্ষীরসমুদ্রস্থিত শৈবলের শোভা ধারণ করিত।[৪৪] এই শিলালিপিতে উল্লিখিত শীয়ম্বকের বিপ্রেরা শ্রুতি ও স্মৃতিসম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে জগতের লোকের সংশয় নিরসন করিতেন।[৪৫] সেই গ্রামবাসী কার্ত্তিকেয় শ্রুতিতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন।[৪৬]

বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত দুইখানি শিলালিপির উক্তি হইতে জানা গেল,—শ্রাবস্তি নামক স্থান বেদবিদ্যার জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় শিলিমপুর-লিপির আলোচনাকালে প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রাবস্তি গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪৭] মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কামরূপের রাজা ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত জনপদ কামরূপের পশ্চিম দিকে পৌণ্ড্র দেশের পূর্ব্ব-সীমার নিকট অবস্থিত ছিল।[৪৮] উভয় মতেই শ্রাবস্তি জনপদ বাঙ্গালা দেশের সীমার মধ্যে পড়ে।

ধর্ম্মপালের আর একখানি তাম্রশাসনে কামরূপের অন্তর্গত খ্যাতিপলি গ্রামের উল্লেখ আছে।

---

৪৪ তেষামার্য্যজনাভিপূজিতকুলং তর্কারিরিত্যাখ্যয়া
শ্রাবস্তিপ্রতিবদ্ধমস্তি বিদিতং স্থানং পুনর্জন্মনাম্।
যস্মিন্ বেদস্মৃতিপরিচয়োত্তিন্নবৈতান-গার্হ্য-
প্রাজ্যাবৃত্তাহুতিষু চরতাং কীর্ত্তিভির্ব্যোম্নি শুভ্রে।
ব্যভ্রাজন্তোপরি পরিসরদ্ধোমধূমা দ্বিজানাং
দুগ্ধাম্ভোধি প্রসৃতবিলসচ্ছৈবলালীচয়াভাঃ।

Silimpur Stone-slab Inscription, slokas 1 and 2.—*Epigraphia Indica*, vol. xiii, p. 290.

৪৫ শ্রৌতস্মার্ত্তার্থবিষয়জগৎসংশয়চ্ছেদদক্ষ—*Ibid.*, l. 7.

৪৬ শ্রুতৌ চ শ্রদ্ধাবস্থিতিঃ।—*Ibid.*, l. 14, p. 291.

৪৭ *Epigraphia Indica*, vol. xiii, p. 287. শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই।—*Indian Antiquary*, vol. xlviii, pp. 208-211. শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ঐ মত সমর্থন করিয়াছেন।—*Indian Antiquary*, vol. lx, pp. 14-18.

৪৮ কামরূপ-শাসনাবলী, পৃ ১৬৬।

সেই স্থান হইতে যাজ্ঞিকগণের হোমধূম আকাশে উত্থিত হইত এবং 'চতুর্ব্বেদী'-পাঠ-ধ্বনিতে সমস্ত গ্রাম মুখরিত হইত।[৪৯]

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে রাজা ভোজবর্ম্মার বেলাব-শাসনের প্রতিগ্রহীতা উত্তর রাঢ়া নিবাসী রামদেব শর্ম্মা বাজসনেয়-চরণাশ্রিত এবং যজুর্ব্বেদের কাণ্বশাখাধ্যায়ী ছিলেন।[৫০]

হরিবর্ম্ম-দেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্টের ভুবনেশ্বর শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি রাঢ় প্রদেশের সিদ্ধল-গ্রামবাসী শ্রোত্রিয়বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। সমগ্র সামবেদ ও নানাবিধ শাস্ত্রে 'অদ্বিতীয়' জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া ভবদেব মীমাংসাও ধর্ম্ম শাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[৫১] ইঁহার রচিত দুই খানি স্মৃতিগ্রন্থ—'কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি'ও 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক' প্রকাশিত হইয়াছে।

বিজয় সেনের বারাকপুর-তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে,—মধ্যদেশ হইতে আগত কান্তিজোগ-নিবাসী 'আশ্বলায়ন-শাখা-ষড়ঙ্গাধ্যায়ী' উদয়কর দেবশর্ম্মা রাজ্ঞী বিলাসবতীর 'কনকতুলাপুরুষদানে' হোমানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।[৫২]

বল্লালসেনের নৈহাটী-শাসনের প্রতিগ্রহীতা 'সামবেদ--কৌথুমশাখা-চরণানুষ্ঠায়ী' বাসুদেব শর্ম্মা রাজমাতা বিলাসবতীর 'হেমাশ্বমহাদানে' আচার্য্য ছিলেন।[৫৩]

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন-শাসনের গ্রহীতা গর্গগোত্রীয় কৃষ্ণধর দেবশর্ম্মা ঋগ্বেদের অশ্বলায়ন শাখা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।[৫৪]

লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া শাসনের গ্রহীতা কৌশিকগোত্রজ রঘুদেব শর্ম্মা যজুর্ব্বেদেব 'কাণ্ব-শাখাধ্যায়ী' ছিলেন।[৫৫]

উক্ত রাজার গোবিন্দপুর-শাসনের গ্রহীতা বাৎস্যগোত্রীয় উপাধ্যায় ব্যাসদেব শর্ম্মা এবং নবাবিষ্কৃত

---

৪৯ কামরূপ-শাসনাবলী, পৃ ১১৪, ১১৫।

৫০ Belāva Copper-plate of Bhojavarman, ll. 42-45.—*Inscriptions of Bengal*, vol. iii, p. 21.

৫১ Bhuvanesvar Inscription of Bhatta Bhavadeva, ll. 15-17.—*Ibid.*, p. 34.

৫২ Barrackpur Copper-plate of Vijayasena, ll. 37-39.—*Ibid.*, p. 63.

৫৩ Naihati Cɔpper-plate of Ballālasena, ll. 50, 51.—*Ibid.*, p. 74.

৫৪ *Ibid.*. p. 171.

৫৫ Anulia Copper-plate of Lakshmanasena, ll. 42, 43.—*Ibid.*, p. 87.

শক্তিপুর-শাসনের গ্রহীতা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কুবের দেবশর্ম্মা সামবেদের 'কৌথুম-শাখা-চরণের' অনুসরণ করিতেন।[৫৬]

'সামবেদ-কৌথুম-শাখা-চরণানুষ্ঠায়ী' ভরদ্বাজগোত্রীয় ঈশ্বর দেবশর্ম্মা লক্ষ্মণসেনের 'হেমাশ্বরথমহাদানে' আচার্য্যের কার্য্য করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ ভূমি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তপনদীঘি-তাম্রশাসন হইতে জানা যায়।[৫৭]

লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-শাসনের গ্রহীতা কৌশিকগোত্রজ গোবিন্দ দেবশর্ম্মা অথর্ব্ববেদীয় 'পৈপ্পলাদ-শাখাধ্যায়ী' ছিলেন।[৫৮]

ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ-তাম্রশাসনোক্ত ভার্গব-গোত্রজ ভট্ট নিব্বোক শর্ম্মা যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।[৫৯]

এই সকল খোদিত লিপির বর্ণনায় প্রাচীন বঙ্গে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণের সদ্ভাব লক্ষিত হইলেও বাজসনেয়-শাখাবলম্বী যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণেরই বাহুল্য দেখা যায়। মহিদাস কৃত 'চরণব্যূহ-পরিশিষ্ট-ভাষ্যে'ও বঙ্গদেশে বাজসনেয় বেদের প্রচলনের কথা বর্ণিত আছে। মহিদাস দেশ-ভেদে বিশেষ বিশেষ বেদ-শাখা প্রচারের কথা বলিতে যাইয়া মহার্ণবের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা হইতে জানা যায়ে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কানীন এবং গুর্জ্জর দেশে বাজসনেয়-মাধ্যন্দিন-শাখা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।[৬০]

বিভিন্ন গ্রন্থ, শাসন ও প্রশস্তির প্রমাণ হইতে জানা গেল যে, খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বেদ-চর্চ্চা প্রচলিত ছিল। এই প্রাচীন লেখ-সমূহে উল্লিখিত ব্রাহ্মণেরা আধুনিক কালের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় গায়ত্রী-মন্ত্র মাত্র পাঠ করিয়াই 'বেদাধ্যায়ী' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এই ব্রাহ্মণগণের

---

৫৬ Govindapur Copper-plate of Lakshmanasena, ll. 43, 44.—*Inscriptions of Bengal*, vol. III, p. 96 ; লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত (শক্তিপুর) তাম্রশাসন, পংক্তি ৪১-৪৩।—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৩৭ শ ভাগ, পৃ ২১৪।

৫৭ Tapanadighi Copper-plate of Lakshmanasena, ll. 42-44.—*Inscriptions of Bengal*, vol. III, p. 102.

৫৮ Madhainagar Copper-plate of Lakshmanasena, ll. 46-48.—*Ibid.*, p. 112.

এই তাম্রশাসনের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে বাঙ্গালা দেশে অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণের বাস ছিল।

৫৯ Ramganj Copper-plate of Isvaraghosha, ll. 29-31.—*Ibid.*, p. 154.

৬০ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গশ্চ কানীনো গুর্জ্জরস্তথা।
বাজসনেয়ী শাখা চ মাধ্যন্দিনী প্রতিষ্ঠিতা।
—চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত শৌনকীয় 'চরণব্যূহ-পরিশিষ্ট,' পৃ ৩২।

পরিচয়ে বিশেষণগুলি বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রযুক্ত হইয়াছে। শাসনীকৃত ভূমির কোন কোন গ্রহীতার সম্পর্কে বেদাধ্যয়নের উল্লেখ দেখা যায় না। কেশবসেনের ইদিলপুর-তাম্রশাসন ও বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়-তাম্রশাসনে গ্রহীতাদিগের গোত্র ও প্রবরের পরিচয় আছে; কিন্তু তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই।[৬১] আবার বিশ্বরূপসেনের 'সাহিত্য-পরিষৎ-তাম্রশাসনে'র গ্রহীতাকে যজুর্ব্বেদান্তর্গত কাণ্ব-শাখার 'একদেশাধ্যায়ী' বলা হইয়াছে।[৬২] দামোদরের চট্টগ্রাম-তাম্রশাসনের গ্রহীতা 'যজুর্ব্বেদী' ছিলেন এই মাত্র বর্ণিত হইয়াছে; তাঁহার বেদ অধ্যয়নের কথা উল্লেখ করা হয় নাই।[৬৩] আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গুরবমিশ্র তাঁহার শিলালিপিতে যে-কয়জন পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবল প্রপিতামহ ও পিতার বেদবিদ্যায় পাণ্ডিত্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, পিতামহ বা অন্য কাহারও বেদজ্ঞান সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নাই।[৬৪] সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, যিনি প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাকেই তাম্রশাসনে 'বেদাধ্যায়ী' বলা হইয়াছে; যিনি স্বশাখার কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিতেন, তাঁহাকে 'একদেশাধ্যায়ী' বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে; এবং যাঁহার বেদবিদ্যার সহিত পরিচয় ছিল না, তাঁহার গোত্র ও প্রবরমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, কিংবা তিনি যে-বেদ অনুসারে সংস্কারাদি অনুষ্ঠান করিতেন, সেই বেদের নাম করা হইয়াছে।

প্রাচীন লেখ-সমূহের উক্তির প্রামাণিকতা

দ্বাদশ শতকে বিরচিত বাঙ্গালী পুরুষোত্তমের 'পাণিনীয়-ভাষাবৃত্তি'তে ব্যাকরণের বৈদিক অংশ পরিত্যক্ত হওয়ায় কেহ কেহ মনে করেন যে, এই সময় হইতে বঙ্গদেশে বেদালোচনায় অনাদর দেখা দিয়াছিল। ভাষাবৃত্তির টীকাকার সৃষ্টিধর চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—লক্ষ্মণসেনের আদেশ অনুসারে পুরুষোত্তম 'ভাষাবৃত্তি' হইতে পাণিনি-ব্যাকরণের বৈদিক অংশ বাদ দিয়াছিলেন।[৬৫] আদেশের কথা সত্য হইলেও ইহা নিশ্চিত যে, লক্ষ্মণসেন বেদের প্রতি অবজ্ঞাহেতু বৈদিক অংশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন নাই। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ পণ্ডিত পুরুষোত্তমের পক্ষে বৈদিক ব্যাকরণ রচনা অশোভন হইবে মনে করিয়াই তিনি ঐরূপ আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের সময়ে যে বঙ্গে বেদ-চর্চ্চার একেবারে অভাব হয় নাই, সে-বিষয়ে তাম্রশাসনের উক্তি ব্যতীত আরও প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

৬১ *Inscriptions of Bengal,* vol. III, pp. 125, 137.

৬২ *Ibid.*, p. 147.

৬৩ *Ibid.*, p. 161.

৬৪ গৌড়লেখমালা, পৃ ৭১-৭৫

৬৫ শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ভাষাবৃত্তির ভূমিকা, পৃ ৫, ২০।

'অদ্ভুতসাগর'গ্রন্থে লক্ষণসেনের পিতা বল্লালসেন 'বেদায়নৈকপথিক' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। ৬৬ চারিখানি তাম্রশাসনেও তাঁহাকে 'বেদায়নৈকাধ্বগ' বলা হইয়াছে। ৬৭ বল্লালের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট বরেন্দ্রভূমিতে বেদার্থ ও স্মৃতি ব্যাখ্যায় শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ৬৮ অনিরুদ্ধের কৃত স্মৃতিগ্রন্থ 'পিতৃদয়িতা' সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ হইতে জানা যায়,—অনিরুদ্ধের সময়ে বঙ্গদেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইত। ঐ ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধস্থলে উপস্থিত থাকিয়া স্বয়ং কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন; বর্ত্তমান কালের ন্যায় তখন শ্রাদ্ধে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না, সুতরাং কুশময় ব্রাহ্মণ আবশ্যক হইত না ৬৯।

অনিরুদ্ধের পর ভট্ট গুণবিষ্ণু 'ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্য' রচনা করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ ভট্ট 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' গ্রন্থে যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পরে রামনাথের মন্ত্র-ব্যাখ্যা ব্যতীত বঙ্গে বেদালোচনার অন্য বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভক্তিরসের উন্মাদনায় বা নব্যন্যায়ের উদ্দীপনায় কিংবা অন্য কোন কারণে এই সময়ে বেদবিদ্যার হ্রাস হইয়াছিল। বাঙ্গালী বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনায় সুপটু বলিয়া বিখ্যাত। বেদবিদ্যার আলোচনায়ও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধিবৃত্তিরই সমধিক প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইঁহারা বেদের অর্থ লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মন্ত্র আবৃত্তির প্রতি বিশেষ আগ্রহ রহিল না।

---

৬৬ মুরলীধর ঝা-সম্পাদিত অদ্ভুতসাগর, পৃ ১।

৬৭ প্রত্যূহঃ কলিসম্পদামনলসো বেদায়নৈকাধ্বগঃ
সংগ্রামঃ শ্রিত-জঙ্গমাকৃতিরভূদ্বল্লালসেনস্ততঃ।—

Anulia, Govindpur and Tapanadighi Copper-plates of Lakshmanasena.—*Inscriptions of Bengal*, vol. iii, pp. 86, 95, 101; নবাবিষ্কৃত (শক্তিপুর) তাম্রশাসন, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৩৭শ ভাগ, পৃ ২২১।

৬৮ বেদার্থ-স্মৃতিসংকথাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলধীবিলাসনয়নঃ সারস্বতব্রহ্মণি।
ষট্‌কর্ম্মাহভবদ্বাধীশীলনিলয়ঃ প্রখ্যাতসত্যব্রতো
বৃত্রারেরিব গীষ্পতির্নরপতেরস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ।

দানসাগর, ৬ শ্লোক।—*Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the India office*, vol. III, p. 543.

৬৯ সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত 'পিতৃদয়িতা,' পৃ ২০, ৩৫।

অন্যান্য দেশে বেদ কণ্ঠস্থ করা হইত।[১০] অনেক স্থলে এখনও ব্রাহ্মণেরা বেদের মন্ত্র মুখস্থ করেন। নবম শতকে বঙ্গদেশে শূরপালের মন্ত্রী কেদার মিশ্র চতুর্ব্বেদ 'উদ্গীরণ' করিতে পারিতেন এবং দ্বাদশ শতকে কামরূপের অন্তর্গত খ্যাতিপলি গ্রাম চতুর্ব্বেদের পাঠ-ধ্বনিতে মুখরিত হইত, তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু বোধ হয়, বঙ্গদেশে 'অধ্যয়ন'পূর্ব্বক বেদার্থ-বোধের প্রথা বহুলভাবে প্রচলিত ছিল না; এই জন্য খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব'-প্রণেতা হলায়ুধ লিখিয়াছেন,—"উৎকল ও পশ্চিম-দেশীয়গণ প্রথমে বেদ অধ্যয়ন করেন, কিন্তু রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ কর্ম্মমীমাংসার সাহায্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের ইতিকর্ত্তব্যতা বোধের জন্য আংশিক বেদার্থ মাত্র বিচার করেন।"[১১] তিনি আরও বলিয়াছেন,—"কেবল অর্থজ্ঞানে বেদপাঠ সিদ্ধ হয় না, যথাবিধি 'অধ্যয়ন'পূর্ব্বক অর্থ-বোধের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"[১২] এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, হলায়ুধের সময়ে বাঙ্গালীরা অন্যান্য দেশীয়-দিগের মত আবৃত্তিপূর্ব্বক বেদ শিক্ষা করিতেন না। হলায়ুধের মতে ঐরূপে শিক্ষা না করিলে বেদবিদ্যায় সফলতা লাভ হয় না। প্রকৃতপক্ষে বাল্যে আবৃত্তির প্রথা রহিত হওয়াতেই বাঙ্গালী পণ্ডিত বেদে তেমন পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে পারেন না।

বেদ-চর্চ্চার হ্রাস

কোন দেশে শাস্ত্রবিশেষের হস্তলিখিত পুথির আধিক্য বা অল্পতা দেখিয়া তথায় সেই শাস্ত্রের পঠন-পাঠনের আধিক্য বা অল্পতা নিরূপিত হইতে পারে। বাঙ্গালা দেশে পুরাতন হস্তলিখিত মূল বেদ পাওয়া যায় না।[১৩] কিন্তু তাহা হইলেও অতি প্রাচীনকালে এই দেশে বেদের পঠন-পাঠন ছিল না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ, বঙ্গের জলবায়ুর দোষে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক অপেক্ষা প্রাচীন সকল পুথিই প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে; গৃহস্থের সাবধানতায় কদাচিৎ দুই একখানি রক্ষিত হইয়াছে মাত্র। দ্বাদশ শতকের পরে বঙ্গে বেদালোচনা হ্রাস পাইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পরবর্ত্তী

বঙ্গে মূলবেদের হস্তলিখিত পুথির অভাব

১০ স্বর্গগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"Their mode of study differed widely from that of other provinces where they memorized the Vedas or at least the Veda which they professed. But they cared very little for the meaning. In Bengal, however, the Brāhmanas never memorized even one of the Vedas. They memorized only such of the Mantras as were used in their religious performances, but insisted on knowing their meaning."—*Journal of the Bihar and Orissa Research Society*, vol. v, p. 172.

১১ তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ-সম্পাদিত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, পৃ ১১।

১২ ঐ, পৃ ১২।

১৩ বর্দ্ধমান জেলার মানকর গ্রামের জমিদার ৺হিতলাল মিশ্র মহাশয়ের পুথিশালায় কয়েকখানি হস্তলিখিত বৈদিক

কালে মূল বৈদিক গ্রন্থ পাঠ উঠিয়া গিয়াছিল; সুতরাং মূল বেদের হস্তলিখিত পুথি না পাওয়াতে দ্বাদশ শতকের পূর্ব্বে মূলগ্রন্থ আলোচিত হইত না, এইরূপ বলা চলে না।

বাঙ্গালী বেদ-ভাষ্যকারগণের পরিচয়

খ্রীষ্টীয় ১০ম শতকে ও তাহার পরবর্ত্তী কালে বঙ্গদেশে কয়েকজন বেদ-ভাষ্যকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ সম্পূর্ণ বেদের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। সকলের রচনা আমাদিগের হস্তগত হয় নাই; কোন কোন ব্যাখ্যাকারের নাম মাত্র জানা যায়। দুই তিনখানি মন্ত্রব্যাখ্যা এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় আছে; দুইখানি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল ব্যাখ্যার রচয়িতারা গৃহস্থের দৈনন্দিন ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী বৈদিক মন্ত্রগুলি একত্র করিয়া তাহার উপর ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, সম্পূর্ণ বেদের ব্যাখ্যা করেন নাই।

১। মুগড়াচার্য্য

স্বর্গগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিভিন্ন স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন যে, মুগড়াচার্য্যই প্রথম বাঙ্গালী বেদ-ব্যাখ্যাতা এবং তিনি বেদ-ব্যাখ্যায় যে সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী ভাষ্যকার গুণবিষ্ণু ও হলায়ুধ সেই সম্প্রদায়েরই অনুসরণ করিয়াছেন।[৭৪]

মুগড়াচার্য্যের অস্তিত্বে সন্দেহ

শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন পুথির আলোচনায় অদ্বিতীয় ছিলেন; কিন্তু তিনি 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে'র বঙ্গদেশীয় সংস্করণ ব্যতীত কোন প্রামাণিক গ্রন্থে মুগড়াচার্য্যের উল্লেখ বা পরিচয় পাইয়াছিলেন কিনা, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ-সম্পাদিত 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে'র একটি শ্লোকে "কিং তস্মিন্‌ গড়েন বত্ম' রচিম্‌ত" এইরূপ পাঠ মুদ্রিত আছে। এই স্থলে গ্রন্থকার হলায়ুধ একজন পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বুঝা

সংহিতা আছে, তাহা আমি দেখিয়াছি; কিন্তু উহা আধুনিক কালের নাগরাক্ষরে লিখিত। বরোদা রাজ্যে সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর বৈদিক পুথির ক্যাটালগ্ (পৃ ৭) হইতে জানা যায়, সেই স্থানে বঙ্গাক্ষরে লিখিত 'ছান্দোগ্যব্রাহ্মণে'র একখানি পুথি আছে। মাদ্রাজের আদিয়ার লাইব্রেরীর ক্যাটালগে বঙ্গাক্ষরে লিখিত নয়খানি উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি,—দীঘাপাতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়ের 'সবিতা মেমোরিয়াল্ কলেক্‌শন্'এ ঐতরেয়, আর্ষেয় ও বংশ এই তিনখানি ব্রাহ্মণ এবং শিক্ষা, ছন্দঃ ও নিঘণ্টু এই তিনখানি বেদাঙ্গ গ্রন্থের বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুথি রক্ষিত আছে।

৭৪ বর্দ্ধমান-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২১।তাস, পৃ ২৬৮; *Journal of the Bihar and Orissa Research Society*, vol. v, p. 173; *Indian Historical Quarterly*, vol. vi, p. 783.

যাইতেছে। কিন্তু শ্লোকের এই অংশ বিভিন্ন পুথিতে বিভিন্নরূপে লিখিত দেখা যায়। মনে হয়, উহার প্রকৃত পাঠ হইবে "কিংতস্মিন্নুবটেন বস্য রচিতম্"। বারাণসী হইতে প্রকাশিত 'ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বে' এই পাঠ গৃহীত হইয়াছে।[৭৫] ইণ্ডিয়া আফিস্ লাইব্রেরীর পুথিতেও এইরূপ পাঠ আছে।[৭৬] উবট-রচিত যজুর্ব্বেদভাষ্য সুপ্রসিদ্ধ। হলায়ুধ যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া পূর্ব্বাচার্য্যরূপে উবটের নামোল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই সম্ভব। উবট তাঁহার ভাষ্যের শেষে আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন,—ভোজের রাজত্বকালে অবন্তিতে বসিয়া তিনি 'মন্ত্রভাষ্য' রচনা করিয়াছিলেন।[৭৭] সুতরাং বঙ্গের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই।

২। ভট্ট গুরবমিশ্র

যে-কয়জন বাঙ্গালী বেদব্যাখ্যাতার নাম অবগত হওয়া যায়, তাহার মধ্যে ভট্ট গুরবমিশ্রের নাম প্রথমে উল্লেখযোগ্য। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাঁহার রচিত বেদব্যাখ্যা কিংবা অন্য কোন গ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হয় নাই। তিনি কোন্ বেদ বা বেদের কোন্ অংশ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। দিনাজপুরে আবিষ্কৃত গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে কথিত আছে,—এই 'কলিযুগ-বাল্মীকি' ধর্ম্মেতিহাস-গ্রন্থ সমূহে শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।[৭৮] তাঁহার প্রসন্ন-গম্ভীর রচনা সকলের তৃপ্তি ও পবিত্রতা সাধন করিত।[৭৯] নারায়ণপালদেবের

তাম্রশাসনে গুরবমিশ্র

তাম্র-শাসন হইতে জানিতে পারি,—গুরবমিশ্র বেদান্তের দুরধিগম্য ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সকল বেদাঙ্গ ও সমগ্রবেদে প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়াছিলেন। তিনি

---

৭৫ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, কাশী-সংস্করণ, পৃ ৪, শ্লোক ২১। এই সংস্করণে পূর্ব্ব শ্লোকের তৃতীয় চরণেও উবটাচার্য্যের নাম আছে। ঐ চরণের পাঠ এইরূপ মুদ্রিত দেখা যায়,—"ব্যাখ্যাতো মতিশালিনাহয়মুবটাচার্য্যেণ বেদঃ পরম্"; অথচ বিদ্যানন্দ-সম্পাদিত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে ঐ চরণ নিম্নলিখিতরূপ মুদ্রিত হইয়াছে,—"ব্যাখ্যাতো নহি কেনচিদ্ যুগপদাচার্য্যেণ বেদঃ পরম্"। ১৯৪৩ সংবতে পাষাণাক্ষরে মুদ্রিত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বের এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, এই সংস্করণে সুগড় স্থলে মুগুড় পাঠ দেখা যায়।

৭৬ *Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the India Office*, 1640, (vol. III, p. 520).

৭৭ 'মন্ত্রভাষ্যে'র অন্তিম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৭৮ ধর্ম্মেতিহাসপর্ব্বসু যঃ শ্রুতীর্ব্যাবৃণোৎ।—

গরুড়স্তম্ভ-লিপি, পংক্তি ২৫।—গৌড়লেখমালা, পৃ ৭৬।

৭৯ বাণী প্রসন্নগম্ভীরা ধিনোতি চ পুনাতি চ।—ঐ, পংক্তি ২৬।—ঐ।

মহাদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।[৮০] এই বেদ-ব্যাখ্যাতা গুরবমিশ্র খ্রীষ্টীয় দশম শতকে পাল-বংশীয় রাজা নারায়ণপালদেবের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার প্রপিতামহ দর্ভপাণি ও পিতা কেদারমিশ্র উভয়েই বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং দেবপাল ও শূরপালের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

৩। ভট্ট গুণবিষ্ণু

গুণবিষ্ণুর কাল নির্ণয়

বাঙ্গালীর রচিত যে-কয়খানি বেদব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ভট্ট গুণবিষ্ণুর 'ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্য' সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।[৮১] এই গ্রন্থের মধ্যে ভাষ্যকারের কোনরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না।[৮২] কিংবদন্তী আছে, গুণবিষ্ণু গৌড়ের রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন এই উভয়ের সভাসদ ছিলেন।[৮৩] সপ্তদশ শতাব্দীর বেদব্যাখ্যাতা রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি কতকগুলি মন্ত্রের পাঠান্তর আলোচনাকালে বলিয়াছেন যে, অনিরুদ্ধ ভট্ট ঐ সকল মন্ত্রের বিনিয়োগ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং গুণবিষ্ণু ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন।[৮৪] প্রকৃতপক্ষে অনিরুদ্ধের 'পিতৃদয়িতা'য় উদ্ধৃত মন্ত্রগুলি গুণবিষ্ণুর 'মন্ত্রভাষ্যে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে, দেখা যায়। রামনাথের বচনভঙ্গী হইতে অনুমান হয় যে, বল্লাল-গুরু অনিরুদ্ধ ও 'মন্ত্রভাষ্য'কার গুণবিষ্ণু উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন এবং পরস্পর পরামর্শ করিয়া

---

৮০ বেদান্তৈস্তরপাস্থগমতমং বেদিতা ব্রহ্মতত্ত্বং
যঃ সর্ব্বাসু শ্রুতিষু পরমঃ সার্দ্ধমঙ্গৈরধীতী।
যো যজ্ঞানাং সমুদিতমহাদক্ষিণানাং প্রণেতা
ভট্টঃ শ্রীমানিব স গুরবো দূতকঃ পুণ্যকীর্ত্তিঃ॥

নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসন, পংক্তি ৫২, ৫৩।—গৌড়লেখমালা, পৃ ৬২।

৮১ ১৮২৮ শকাব্দ মঃ মঃ পরমেশ্বর ঝা দারভাঙ্গা হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন; সম্ভবতঃ উপযুক্ত সংখ্যক বিশুদ্ধ আদর্শ পুথির অভাবে দারভাঙ্গা-সংস্করণে সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গদেশেও ভবদেবীয় 'কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি'র পাদ-টীকারূপে 'ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্যের' কিয়দংশ একাধিক বার মুদ্রিত হইয়াছিল। সম্প্রতি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে মুদ্রিত হইয়াছে; আমি উহা সম্পাদন করিয়াছি।

৮২ ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত একখানি 'ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্যের' পুথির বিবরণে গুণবিষ্ণুকে ভট্টদামুকের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।—Julius Eggeling, *Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the India Office*, vol. I, p. 47.

৮৩ মঃ মঃ পরমেশ্বর ঝা-সম্পাদিত 'ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে'র ১৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৮৪ রামনাথ-কৃত 'ধার্ম্মিককর্ম্ম-রহস্য' (সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পুথি) পৃ ৫১ক—"অনিরুদ্ধ-লিখিতো গুণবিষ্ণুধৃতঃ।" পৃ ৫১খ—"অনিরুদ্ধলিখিতং গুণবিষ্ণুনা ব্যাখ্যাতম্।"—"তেন লিখিতং ব্যাখ্যাতঞ্চ গুণবিষ্ণুনা।"

'পিতৃদয়িতা' ও 'ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্য' প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আমি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত 'ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্যে'র ইংরাজী ভূমিকায় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, গুণবিষ্ণু খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে বল্লালসেনের রাজসভায় বর্ত্তমান ছিলেন।[৮৫]

ছন্দোগ অর্থাৎ সামবেদীয়গণের জাতকর্ম্ম হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে-সকল বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, উহা বিভিন্ন সংহিতা ও ব্রাহ্মণ হইতে সংগ্রহ করিয়া গুণবিষ্ণু ভাষ্য করিয়াছেন।

গুণবিষ্ণুর 'ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্য'

এই ভাষ্য আট খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন প্রভৃতি সংস্কার এবং স্নান, সন্ধ্যা, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের উপযোগী চারিশতের অধিক মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অনতিবিস্তৃত মন্ত্রভাষ্যে সমগ্রবেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের সর্ব্বতোমুখী বিদ্যাবত্তা প্রতিফলিত না হইলেও গুণবিষ্ণুর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষ্য সরল, পরিমিত, অথচ সম্পূর্ণ। তিনি ইহাতে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, গৃহ্যসূত্র, নিঘণ্টু, নিরুক্ত, পুরাণ ও স্মৃতিগ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং পদসাধনে সর্ব্বত্র পাণিনি-ব্যাকরণের অনুসরণ করিয়াছেন।

বিভিন্ন গ্রন্থে গুণবিষ্ণুর উল্লেখ

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিতত্ত্বে বারংবার গুণবিষ্ণুর মন্ত্রব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তদশ শতকে রামনাথ বিদ্যা-বাচস্পতি 'ধার্ম্মিক-কর্ম্মরহস্য,' 'সামগ-মন্ত্রব্যাখ্যান' প্রভৃতি গ্রন্থে গুণবিষ্ণুর মন্ত্রভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছেন।[৮৬] এই দুইজন গ্রন্থকারের উক্তি আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ইঁহাদের সময়ে গুণবিষ্ণু অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক বেদব্যাখ্যাতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই সময়েই বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশের 'ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্যে'র পুথিতে বিভিন্নরূপ পাঠ লক্ষিত হইত। এই জন্য রামনাথ রাঢ় প্রদেশের পুথিকে 'রাঢ়ীয় গুণবিষ্ণু' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

'ষট্‌কর্ম্ম-ব্যাখ্যান-চিন্তামণি'-প্রণেতা নিত্যানন্দ এবং 'মন্ত্রার্থদীপিকা'-প্রণেতা শত্রুঘ্ন উভয়েই তাঁহাদের গ্রন্থের আরম্ভে গুণবিষ্ণু-কৃত মন্ত্রভাষ্যের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।[৮৭] নিত্যানন্দের

---

৮৫ *Chāndogya-mantrabhāshya*, Introduction, xxiii, xxxv.

৮৬ *Ibid.*, xxi দ্রষ্টব্য।

৮৭ ষট্‌কর্ম্ম-ব্যাখ্যান-চিন্তামণি (সংস্কৃত কলেজের পুথি) পৃ ১ ; মন্ত্রার্থদীপিকা (যুগলকিশোর শর্ম্ম-সম্পাদিত), পৃ১

আবির্ভাব-কাল কিংবা নিবাস-স্থান স্থির করিতে পারি নাই। শত্রুঘ্ন নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি ত্রিগর্ত্তাধিপতি ধর্ম্মচন্দ্রের অনুরোধে 'মন্ত্রার্থদীপিকা' প্রণয়ন করেন।[৮৮] এই ধর্ম্মচন্দ্র ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পঞ্জাবের জালন্ধর প্রদেশ শাসন করিতেন।[৮৯] সুতরাং বুঝা যাইতেছে, ঐ সময়ে গুণবিষ্ণুর বেদব্যাখ্যার খ্যাতি পঞ্জাব-প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

সায়ণাচার্য্য তাঁহার গ্রন্থে কোন স্থলে গুণবিষ্ণুর নাম করেন নাই, কিন্তু 'মন্ত্রব্রাহ্মণে'র ভাষ্যে দুই স্থলে 'কেচিৎ' বলিয়া কোনও পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা গুণবিষ্ণুর 'মন্ত্রভাষ্যে' অবিকল পাওয়া যায়।[৯০] সুতরাং সায়ণাচার্য্য এই স্থলে গুণবিষ্ণু কিংবা তাঁহার সম্প্রদায়ের কোনও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। ইহা ছাড়া 'মন্ত্রব্রাহ্মণে'র ছয়টি মন্ত্রের সায়ণীয় ভাষ্য গুণবিষ্ণুর ভাষ্যের সহিত প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়।[৯১] এই সকল কারণে মনে হয়, সায়ণ গুণবিষ্ণুর 'মন্ত্রভাষ্যে'র সহিত অপরিচিত ছিলেন না।

হলায়ুধ ভট্টের 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে' বহু মন্ত্রের ব্যাখ্যা গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যা হইতে অভিন্ন দেখা যায়।[৯২] একটি বৈদিক মন্ত্রের পাঠ-ভেদ সম্পর্কে আলোচনাকালে রামনাথ বিদ্যা-বাচস্পতি বলিয়াছেন,—"গুণবিষ্ণুর একখানি হস্তলিখিত পুথিতে এই পাঠ দৃষ্ট হয়, কিন্তু হলায়ুধ প্রভৃতি শিষ্টগণ ইহা গ্রহণ করেন নাই"।[৯৩] এই স্থলে রামনাথ গুণবিষ্ণুকে হলায়ুধ অপেক্ষা প্রাচীন স্থির করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। রামনাথের এই উক্তি এবং অন্যান্য আভ্যন্তরীণ প্রমাণের বলে আমি 'ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্যে'র ভূমিকায় সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, গুণবিষ্ণুর ভাষ্য হইতে হলায়ুধ বহু অংশ স্বরচিত 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে' অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করিয়াছেন।[৯৪]

---

৮৮ মন্ত্রার্থদীপিকা, পৃ ১।

৮৯ Cunningham, *Archæological Survey of India Reports*, vol. v, p. 152.

৯০ 'মন্ত্রব্রাহ্মণের' ১।২।১৮ এবং ২।৬।১ মন্ত্রের সায়ণীয় ভাষ্যের সহিত গুণবিষ্ণুর ৩।৪৬ মন্ত্রের ভাষ্য তুলনীয়।

৯১ মন্ত্রব্রাহ্মণের ১।২।৫, ২।৪।১-৪ ও ২।৪।৬ মন্ত্রের সায়ণীয় ভাষ্যের সহিত যথাক্রমে গুণবিষ্ণুর ৯।৩১, ১।৬-৯ ও ১।১৮ মন্ত্রের ভাষ্যে মিল দেখা যায়।

৯২ মৎসম্পাদিত ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের ইংরাজী ভূমিকা xxxi পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৯৩ রামনাথ-কৃত 'সামগমন্ত্রব্যাখ্যান' (সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পুথি), পৃ ১৮ক : গুণবিষ্ণু-পুস্তকে ছান্দসঃ অংস্বরাদিলোপ ইতি পাঠঃ ন তু হলায়ুধাদিশিষ্ট-পরিগৃহীতঃ।

৯৪ *Chāndogyamantrabhāshya*, Introduction, p. xxxiii.

আমরা দেখিলাম,—হলায়ুধ, সায়ণ, নিত্যানন্দ, শত্রুঘ্ন এবং রামনাথ বেদব্যাখ্যায় গুণবিষ্ণুর নিকট ঋণী।[৯৫] ইহা অবশ্যই গুণবিষ্ণুর ভাষ্যের উপাদেয়তা প্রতিপাদন করে।

বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে গুণবিষ্ণু-কৃত 'ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণভাষ্যের' একখানি পুথি আছে। উহা সামবেদীয় 'মন্ত্রব্রাহ্মণে'র ভাষ্য।[৯৬] এই গ্রন্থের সহিত 'ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্যে'র বিশেষ পার্থক্য নাই।

গুণবিষ্ণু-রচিত বিভিন্ন ভাষ্য

মহামহোপাধ্যায় পরমেশ্বর ঝা দারভাঙ্গা হইতে প্রকাশিত 'ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্যে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি মিথিলায় চন্দনপুর গ্রামে একজন বৈদিক পণ্ডিতের নিকট গুণবিষ্ণুর রচিত 'পারস্কর-গৃহ্যভাষ্যে'র একখানি পুথি দেখিয়াছেন।[৯৭] এই ভাষ্যগ্রন্থে সম্ভবতঃ 'পারস্কর-গৃহ্যসূত্রো'ক্ত বৈদিক মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, গুণবিষ্ণু গৃহ্য কর্ম্মের উপযোগী বৈদিক মন্ত্রগুলির উপর তিনখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

৪। হলায়ুধ ভট্ট

হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে' 'কাণ্বশাখি-বাজসনেয়'-গণের 'গার্হস্থ্যকর্ম্মে'র উপযোগী কিঞ্চিদধিক তিন শত মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে-সকল অনুষ্ঠানে ঐ মন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়, গ্রন্থকার প্রারম্ভেই

হলায়ুধের মন্ত্রব্যাখ্যার বিবরণ

তাহার এক সূচী দিয়াছেন। এই শ্লোকবদ্ধ সূচীতে দন্তধাবন হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত চল্লিশ প্রকার কর্ম্মের নাম আছে। অনেক কার্য্যে সামবেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয়গণের একই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, সে-সকল স্থলে গুণবিষ্ণু ও হলায়ুধের ব্যাখ্যা প্রায় একরূপ, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অন্যান্য মন্ত্রের ব্যাখ্যায় হলায়ুধ তাঁহার সহজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। গুণবিষ্ণুর ভাষ্য সরল ও সংক্ষিপ্ত; হলায়ুধের ব্যাখ্যা সরল হইলেও পুরাণাদি নানা শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা উপচিত এবং স্মৃতি-নিবন্ধের ন্যায় কর্ম্মানুষ্ঠানসম্বন্ধীয় প্রমাণ প্রয়োগে পরিপূর্ণ।

'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে'র ভূমিকায় গ্রন্থকার আত্মপরিচয় দিয়াছেন।[৯৮] তিনি বাৎস্য মুনির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ধনঞ্জয়, মাতার নাম উজ্জ্বলা। পিতা অগ্নিতে

---

৯৫ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় যজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়ের ব্যাখ্যার এক খানি পুথি আছে; উহাতে ব্যাখ্যা-কর্ত্তার নাম নাই। ঐ ব্যাখ্যার প্রারম্ভে গুণবিষ্ণুর ও হলায়ুধের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংস্কৃত পুথি।—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৩৮ শ ভাগ, পৃ ২৩৮।

৯৬ *Descriptive Catalogue of Mss. in the Central Library*, vol. i, p. 112.

৯৭ 'ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্য', দারভাঙ্গা-সংস্করণ, পৃ ১৭৪।

৯৮ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, ৫-২৪ শ্লোক।

আহুতি দিতেন, তাহার ধূম আকাশে উত্থিত হইয়া দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতি 'শ্রাদ্ধকৃত্য-পদ্ধতি' ও 'পাকযজ্ঞ-পদ্ধতি' নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ঈশান নামে অপর ভ্রাতা 'দ্বিজাহ্নিক-পদ্ধতি' রচনা করেন। হলায়ুধ প্রথম বয়সে লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন, পরে ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে সকলেই শ্রুতিবিদ্যাকে কিছুকালের জন্য কণ্ঠে ধারণ করিত, কিন্তু তিনিই ঐ বিদ্যার সমধিক প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় অগ্নিতে হোম করিতেন।

হলায়ুধের পরিচয়

হলায়ুধের নিজের উক্তি হইতে জানা যায় যে, তিনি 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' ব্যতীত আর চারিখানি 'সর্ব্বস্ব'-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'দ্বিজনয়ন' নামে আরও একখানি গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।[৯৯] এই ছয়খানি পুস্তকের মধ্যে 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' একাধিকবার বাঙ্গালা দেশে ও কাশীধামে ছাপা হইয়াছে। সম্প্রতি বিহার ও উড়িষ্যা অনুসন্ধান-সমিতির মুখপত্রে 'মীমাংসাসর্ব্বস্ব' প্রকাশিত হইতেছে।

হলায়ুধের রচিত গ্রন্থ

হলায়ুধ তাঁহার সময়ে প্রচলিত বাঙ্গালা দেশের বেদাধ্যয়ন-প্রথার নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার কথার সারমর্ম্ম এই যে, উৎকল ও পশ্চিমদেশীয়গণ বেদ মুখস্থ করেন, অর্থবোধের চেষ্টা করেন না; রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ একেবারেই বেদ মুখস্থ করেন না, যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য কেবল তদুপযোগী মন্ত্রগুলির অর্থ শিক্ষা করেন।[১০০] এই উভয় প্রথাই নিন্দনীয়। যথাবিধি 'অধ্যয়ন' অর্থাৎ আবৃত্তিপূর্ব্বক অর্থ-বিচার করিতে হইবে, ইহাই হলায়ুধের মত। তিনি বলিয়াছেন, সমগ্র বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া তাহার অর্থ বিচার করা অসম্ভব বোধ হইলে, বরং কেবল ক্রিয়াকাণ্ডের উপযোগী মন্ত্রভাগ উক্ত নিয়মে শিক্ষা করা উচিত। কারণ, বিনা 'অধ্যয়নে' অর্থ জানিয়াও ফল হয় না।[১০১] এই বেদাধ্যয়ন-প্রথার সমালোচনা হইতে বুঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে দেশে বেদবিদ্যার প্রচার মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল।

হলায়ুধের সময়ে বেদাধ্যয়নের রীতি

---

৯৯ *Notices of Sanskrit Mss.*, vol. II, 66.

১০০ কলৌ আয়ুঃপ্রজ্ঞোৎসাহশ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাৎ উৎকলপাশ্চাত্ত্যাদিভির্ব্বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈস্ত্ব-ধ্যয়নং বিনা কিয়দেকবেদার্থস্য কর্ম্মমীমাংসাদ্বারেণ যজ্ঞেতিকর্ত্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে।—ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব (কাশী-সংস্করণ), পৃ ৭।

১০১ ঐ, পৃ ৮।

গুণবিষ্ণুর 'ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্যে'র মত হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব'ও রঘুনন্দন, রামনাথ, নিত্যানন্দ, ও শক্রঘ্নের গ্রন্থে প্রমাণস্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দাক্ষিণাত্য অনিরুদ্ধভট্টের 'ছান্দোগ্য-মন্ত্র-কৌমুদী', বর্দ্ধমানের 'গঙ্গাকৃত্য-বিবেক', রামকৃষ্ণভট্টাচার্য্য-কৃত 'মন্ত্রকৌমুদী' এবং রামকৃষ্ণ-ভট্ট কৃত 'শ্রাদ্ধসংগ্রহে' হলায়ুধের উল্লেখ পাওয়া যায়।

নানা গ্রন্থে হলায়ুধের উল্লেখ

৫। রামনাথবিদ্যাবাচস্পতি

হস্তলিখিত পুথির বিভিন্ন ক্যাটালগ্ হইতে রামনাথ-কৃত 'সংস্কারপদ্ধতি-রহস্য', 'স্মৃতি-রত্নাবলী' 'কাব্যপ্রকাশ-রহস্য', 'ত্রিকাণ্ড-বিবেক', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা-বিবৃতি', 'লিঙ্গাদিসংগ্রহ টিপ্পনী' এবং 'লীলাবতী-রহস্যের' নাম অবগত হওয়া যায়। সম্প্রতি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার দুইখানি নূতন গ্রন্থের পুথি পাওয়া গিয়াছে। ইহার একখানি 'ধার্ম্মিক-কর্ম্মরহস্য, অপরখানি 'সামগ-মন্ত্রব্যাখ্যান'। এই দুইখানি পুথি আলোচনা করিয়া আমি গুণবিষ্ণু সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছি। 'ধার্ম্মিক-কর্ম্মরহস্যে' গ্রন্থকার 'পরিভাষা' ও 'সময়-রহস্য' নামে আরও দুইখানি স্বরচিত গ্রন্থের নাম করিয়াছেন।

রামনাথের গ্রন্থাবলী

গুণবিষ্ণু ও হলায়ুধের মন্ত্র-ভাষ্যের ন্যায় রামনাথের 'সামগ-মন্ত্রব্যাখ্যান'ও ক্রিয়াকাণ্ডের উপযোগী মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে গ্রন্থকার পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকারদিগের পাঠের আলোচনাপ্রসঙ্গে স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম বিচার-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, কখন কখন গুণবিষ্ণু, হলায়ুধ, সায়ণ প্রভৃতি ভাষ্যকারগণের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন এবং বিভিন্ন-দেশে প্রচলিত মন্ত্র-পাঠের তুলনা করিয়া দোষ-গুণ বিচার করিয়াছেন। গ্রন্থের নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, ইহাতে সামবেদীয় কর্ম্মের উপযোগী মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মন্ত্রের সংখ্যা এক শতের অধিক হইবে না।

রামানথের সামগমন্ত্র-ব্যাখ্যানের পরিচয়

রামনাথ 'সংস্কারপদ্ধতি-রহস্যে'র শেষে গ্রন্থ-সমাপ্তির কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, তিনি খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।[১০২] 'ধার্ম্মিক-কর্ম্ম-

---

১০২ বেদবেদেষু-শীতাংশু (১৫৪৪)-সম্মিতে শাক বৎসরে।
ভবদেবীয়টীকেয়ং রামনাথেন নির্ম্মিতা।
R. L. Mitra, *Notices of Sanskrit Mss.*, 2177.

রহস্যে'র প্রারম্ভে গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—গন্ধর্ব্বরায় নামে খ্যাত রাজা নারায়ণদেবশর্ম্মার অনুরোধে তিনি ঐ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।[১০৩] ইঁহার রচিত কোন গ্রন্থই আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, কিংবা আলোচিত হয় নাই। এই গ্রন্থরাজি যথাযথভাবে আলোচিত হইলে, গ্রন্থকার রামনাথের অতুলনীয় জ্ঞানগৌরব সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিবে।

রামনাথের পরিচয়

৬। রামকৃষ্ণভট্টাচার্য্য

রামকৃষ্ণের রচিত বহুগ্রন্থের পুথি পাওয়া যায়। কিন্তু একই রামকৃষ্ণ সকল গ্রন্থের রচয়িতা কি না, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। পূর্ব্ববর্ণিত ভাষ্যকারগণের ন্যায় ইনিও ইঁহার 'মন্ত্র-কৌমুদীতে' কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানে পাঠ্য মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইনি অধিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই এবং প্রায় সর্ব্বত্র পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাখ্যা-কারদিগকে অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহার ভাষ্যে অনেক স্থলে স্মৃতিশাস্ত্রোচিত আলোচনা স্থান পাইয়াছে; মন্ত্রের ব্যাখ্যার সহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বহুল পরিমাণে আলোচিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণের 'গ্রন্থ-কৌমুদী'

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (*Notices* III, 2380) তর্কপঞ্চান ভট্টাচার্য্য-কৃত এক 'মন্ত্রকৌমুদী'র বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ এবং রামকৃষ্ণের 'মন্ত্রকৌমুদী' অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে, বুঝা যাইতেছে,—রামকৃষ্ণের উপাধি ছিল তর্কপঞ্চানন।

রামকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; ব্যাখ্যারীতি দেখিয়া মনে হয়, ইনি অনতিপ্রাচীন গ্রন্থকার।

উপরি উক্ত বেদ-ব্যাখ্যাগুলিতে গ্রন্থকারগণের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। অতি অল্পসংখ্যক বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা-সংবলিত আরও কয়েকখানি বাঙ্গালী-রচিত পুথি পাওয়া যায়। কিন্তু উহাতে তেমন কিছু বৈশিষ্ট্য নাই। এই সকল ব্যাখ্যায় গ্রন্থকারগণ পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকারগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন মাত্র।[১০৪]

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য

---

১০৩ [যো না]রায়ণদেবশর্ম্মনৃপতির্গন্ধর্ব্বরায়াহ্বয়ো
[শ্রী] নারায়ণ-দেব এব সুকৃতস্থিত্যৈ প্রয়াতা (?) ক্ষিতৌ।
তেনে তেন মহাকুলীনকৃতিনা শ্রীরামনাথ-দ্বিজ-
দ্বারাচারপরম্পরাবিধিনিধিঃ প্রেক্ষাবতাং প্রীতয়ে।
ধার্ম্মিক-কর্ম্মরহস্য (সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পুথি), পৃ ১।

১০৪ সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত কংসারি মিশ্রের 'প্রতিষ্ঠা-মন্ত্র-ব্যাখ্যা' এবং 'সবিতা মেমোরিয়াল কলেক্‌শনে' রক্ষিত রুক্মিণী চক্রবর্ত্তীর পুত্র নন্দকিশোর সিদ্ধান্তের 'মন্ত্রবোধিনী' এইপ্রকারের পুস্তক।

পূর্ণপ্রজ্ঞ-মত

অদ্বৈত ও বৈষ্ণব দর্শনের খ্যাতি বরাবরই আছে। অদ্বৈত দর্শনমতে কেবল ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা; জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক, ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; প্রভেদ ভাব, অবিদ্যা হইতেই হয়। জীব অবিদ্যামুক্ত হইলে, আপনার প্রকৃত স্বভাব জানিতে পারে এবং মুক্ত হয়। ব্রহ্মের নিগুর্ণত্ব, জগতের মিথ্যাত্ব, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব, অবিদ্যার অনাদিত্ব এবং জগৎসৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব অদ্বৈতদর্শন দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে।

বৈষ্ণবদর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, জীব এবং ব্রহ্ম পরস্পর হইতে বিভিন্ন; ব্রহ্ম একপ্রকৃতিক নহেন, বহুত্ব ব্রহ্মেরই ভিতর নিহিত;—জড়জগতের উপাদান এবং বহুজীব ব্রহ্মেরই অংশরূপে ব্রহ্মেরই মধ্যে নিহিত; ব্রহ্ম নিগুর্ণ নহেন, তিনি গুণপূর্ণ। সৃষ্টি (বা জগৎ) সত্য, কিন্তু নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; মায়া অচিন্তনীয় বা অপরিজ্ঞেয় নহে, মায়া ঈশ্বরেরই ইচ্ছা; ব্রহ্ম সত্য, সুতরাং ব্রহ্মের সহিত যাহার সম্বন্ধ, তাহাও সত্য; জগৎ ব্রহ্মের ইচ্ছার ফল, সুতরাং জগৎ সত্য।

অদ্বৈত ও বৈষ্ণব-দর্শন উভয়ই বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয় শ্রেণীর দার্শনিকেরাই বেদান্তের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া নিজ নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্তের যথার্থ তাৎপর্য্য কি? উপনিষদে এমন অনেক মন্ত্র আছে, যাহা দ্বারা অদ্বৈতবাদ সমর্থন করা যাইতে পারে; আবার এমন অনেক মন্ত্র আছে, যাহা দ্বারা বৈষ্ণব-মতও সমর্থন করা যায়। ব্রহ্মসূত্র বা ব্যাসসূত্রের ভিত্তি এই সকল উপনিষদ্-মন্ত্রের উপর। ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা ব্যাস উপনিষদ্-মন্ত্র সকলের তাৎপর্য্য যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই সেই অনুসারে সূত্রগুলি রচনা করিয়াছিলেন। সূত্রগুলির যথার্থ অর্থ কি, তাহা বুঝিতে পারিলে, বাদরায়ণ শ্রুতিমন্ত্র সকলের তাৎপর্য্য কি বুঝিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র শ্রুতিরই উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতের বিরুদ্ধবাদী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাদরায়ণের সূত্রগুলি সাধারণ পাঠকের বোধগম্য নহে। ভাষ্যকার-গণের ভাষ্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সূত্রের অর্থ করিতে পারা যায় না। ভাষ্যকারগণের মধ্যে এক শ্রেণীর ভাষ্যকারেরা অদ্বৈত-মতাবলম্বী, এবং আর এক শ্রেণীর ভাষ্যকারেরা বৈষ্ণব দার্শনিক। সুতরাং শ্রুতির যে যথার্থ মত কি, তাহা সাধারণের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন।

মাধ্বগণ বলেন,—শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিবার পক্ষে একটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। অষ্টাদশ পুরাণ ও ভগবদ্গীতায় শ্রুতির বড় সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্র অষ্টাদশ পুরাণ ও

ভগবদ্গীতা অদ্বৈতবাদ সমর্থন করে, কি বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মত স্বীকার করে, তাহা বিচার-সাপেক্ষ।

মানুষের সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য কি, তাহারই অনুসন্ধানের জন্য দর্শনশাস্ত্রের প্রবৃত্তি। সকল দর্শনকারই ধরিয়া লইয়াছেন, মানুষের অবস্থা দুঃখজনক অথবা পরিবর্ত্তনশীল। দুঃখ ও নিয়ত পরিবর্ত্তনের অবস্থা যাহাতে অতিক্রম করা যায়, সেই দিকে সকল চেষ্টা নিয়োজিত করা চাই। দুঃখ আত্মার অভিপ্রেত নয়, পরিবর্ত্তনও নয়; অথচ আত্মাকে দুঃখ ও পরিবর্ত্তনের অধীন হইতে হয়। আত্মা দুঃখ এবং পরিবর্ত্তন চায় না; এই সকল হইতে মুক্ত হইতে চায়; কিন্তু দুঃখ এবং পরিবর্ত্তন হইতে কি করিয়া মুক্ত হওয়া যায়? দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে হইলে, পরিবর্ত্তনের হাত এড়াইতে হইলে, দুঃখ এবং পরিবর্ত্তনের কারণ কি এবং ইহারা কোন্ নিয়মের বশবর্ত্তী, তাহা জানিতে হয়।

আমাদের সম্মুখে যে জগৎ তাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, আমরা যখন যে অবস্থার অধীন হই, তাহাও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু আত্মার কোন সময়ে কোন পরিবর্ত্তন হয় না। পরিবর্ত্তন একদিকে যেমন সুখোৎপাদক, আর একদিকে তেমনি দুঃখোৎপাদক; পরিবর্ত্তনের হাত এড়াইতে পারিলে সুখ-দুঃখের হাত এড়াইতে পারা যায়। এক শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মত, সুখ-দুঃখের হাত এড়ানই কাজ। কিন্তু আবার বলিতে পারা যায়, দুঃখ মানুষের প্রিয় নয়, সকল মানুষই সুখান্বেষী; যে পরিবর্ত্তন সুখপ্রদ, সেই পরিবর্ত্তনের হাত এড়াইবার প্রয়োজন কি? অনেক দার্শনিকের মত এই যে, যাহাতে সুখ হয়, তাহার চেষ্টায় কোন দোষ নাই—তাহা মঙ্গলপ্রদ। তাঁহাদের মত এই যে, দুঃখের সহিত যুদ্ধ করিয়া দুঃখকে পরাস্ত করিয়া সুখ আনয়ন করাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায়, পরিবর্ত্তন-জনিত সুখ ও দুঃখ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। সে স্থলে সে সুখকে আলিঙ্গন করিলেই দুঃখের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সুখকে আলিঙ্গন করা হয়। যাহার সহিত দুঃখের মোটেই সম্বন্ধ নাই, এমন যদি কোন সুখ থাকে, সেই সুখকে আলিঙ্গন করাই কাজ। আমরা জীবনে যত সুখের পরিচয় পাই, সবই পরিবর্ত্তন-জনিত সুখ। দুঃখের সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সুতরাং তাহা পরমার্থ নহে। যদি সম্পূর্ণভাবে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে এরূপ সুখের হাতও এড়াইতে চেষ্টা করিতে হয়।

দুঃখের হাত এড়ানই জীবনের উদ্দেশ্য। পরিবর্ত্তন সুখ এবং দুঃখের জনক। আমাদের যখনই এক অবস্থার পরিবর্ত্তে অন্য অবস্থা আসে, তখনই হয় সুখ, না হয় দুঃখের অনুভব হয়; এবং এই সুখ ও দুঃখ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং সুখই বা কি, দুঃখই বা কি,—উভয়ই পরিত্যাজ্য। অতএব সুখ-দুঃখের মূলীভূত পরিবর্ত্তন আত্মার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ নহে। আত্মা যখন দুঃখ চায় না, তখন দুঃখের অতীত কোন অবস্থা আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা। দুঃখের সহিত যখন সুখের

সম্বন্ধ, তখন সুখের অবস্থাও আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা নহে। আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা সুখ-দুঃখের অতীত এবং সকল পরিবর্ত্তনের অতীত। আবার এমনও দেখা যায়, একজন যাহাকে দুঃখজনক মনে করে, আর একজনের পক্ষে তাহা দুঃখ নহে। যখনই মানুষ কোন অবস্থাকে দুঃখপ্রদ বলিয়া জানে, তখনই তাহা তাহার দুঃখজনক হয়। দুঃখকে দুঃখ বলিয়া না জানিলে, দুঃখও অনেক সময়ে সুখজনক হয়। সাধারণ লোকে যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করে, দার্শনিক তাহাকে দুঃখ বলিয়াই জানেন। দার্শনিক যাহা দুঃখ বলিয়া জানেন, 'সাধারণ লোক তাহাকে দুঃখ বলিয়া জানিতে না পারিয়া সুখ বলিয়া মনে করে।' সুখ এবং দুঃখ সবই মন লইয়া। যদি মনে করা যায়, সবই দুঃখ—আবার যদি মনে করা যায়, সবই সুখ। আবার আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, তাঁহাদের মত এই যে, বন্ধনই দুঃখের কারণ। প্রকৃত সুখ এবং দুঃখ বলিয়া কিছুই নাই। আমরা বিশেষ বিশেষ সংস্কারের অধীন হইয়া কোন অবস্থাকে দুঃখজনক এবং কোন অবস্থাকে সুখজনক মনে করি। সংস্কারের বন্ধন কাটিতে পারিলেই এ সকল জ্বালা আর থাকে না।

কোন কোন দার্শনিকের মত এই যে, দুঃখকর এবং সুখকর অবস্থা মনেরই কল্পনা-সম্ভূত। সুতরাং সুখকর বা দুঃখকর বলিয়া কোন জগৎ নাই। কল্পনার মূল অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে জানিতে পারিলেই দুঃখের অবসান হয়।

পূর্ণপ্রজ্ঞ (শ্রীমধ্ব) ও তাঁহার মতাবলম্বীরা বলেন,—সুখদুঃখময় জগৎ মিথ্যা হইতে পারে এবং তাহাকে মিথ্যা বলিয়া ভাবিতে পারিলে, সুখ দুঃখের হাত এড়াইতে পারা যায়; কিন্তু জগৎকে যদি মনের কল্পনা বলা যায়, তাহা হইলে জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ভাবাও আর একটা মনের কল্পনামাত্র। যাঁহারা জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ভাবিয়া দুঃখের হাত এড়াইতে চান, তাঁহারা কল্পনায়ই সুখী হইতে চান। বিশেষতঃ জোর করিয়া জগতের অস্তিত্ব যদি আমরা অস্বীকার করিতে যাই, তাহা হইলে জগতের কল্পনা আরও জোর করিয়া আমাদের মনে উদিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি কোন চিকিৎসক রোগীকে বলেন—'ঔষধ খাইবার সময়ে সর্পের চিন্তা করিও না'; তাহা হইলে ঔষধ খাইবার সময়ে রোগীর মনে সর্পের চিন্তা আপনি আসিয়া উদিত হইবে। 'জগৎ নাই' ভাবিতে গিয়া 'জগৎই' মনে হইবে।

মায়াবাদীর উপর এইরূপ আক্রমণ সমীচীন নহে। মায়াবাদীর উদ্দেশ্য নহে যে, 'জগৎ নাই' ভাবিয়া জগতের হাত এড়াইতে হইবে। মায়াবাদী ঠিক চোক বুজিয়া বিপদের হাত এড়াইতে বলেন না। জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংস্কারকে তাঁহারা চূর্ণ করিতে বলেন। সর্পের চিন্তা মনে উদিত হইলে কিছুই যায় আসে না। প্রকৃত সর্প আছে—এই বিশ্বাসই মনে ভয়ের

উদ্রেক করে। যদি কাহারও মনে সংস্কার থাকে, 'অমুক' বৃক্ষে ভূত আছে, তাহা হইলে তাহাকে যদি বলা যায়, তুমি ঐ বৃক্ষের তলা দিয়া যাইবার সময়ে ভূতের চিন্তা মনে আনিও না, তাহা হইলে তাহার প্রতি ঐ উপদেশ মঙ্গলপ্রদ হইবে না; কেননা, ঐ গাছের তলা দিয়া যাইবার সময়ে আপনাআপনি ভূতের চিন্তা তাহার মনে উদিত হইবে এবং সে ভয়ও পাইবে। পক্ষান্তরে ঐরূপ সংস্কারাপন্ন মন হইতে যদি ঐ ভ্রান্ত সংস্কার বিদূরিত করা হয়, তাহা হইলে তাহার মনে ভূতের চিন্তা উদিত হইলেও তাহার ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। শুধু 'জগৎ নাই' বলিয়া চিন্তা করিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। সেই চেষ্টা যত করা যায় ততই বিফলমনোরথ হইতে হয়, অর্থাৎ ততই সেই চিন্তা আরও জোর করিয়া মনে উদিত হয়। 'জগৎ আছে'—এই ভ্রান্ত সংস্কারকে বিচার বা যুক্তি দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিতে হইবে। তখন মনে যে অবস্থা হইবে, সেই অবস্থায় জগতের চিন্তা যতই মনে উদিত হউক না কেন, তাহাতে কিছুই ক্ষতি হয় না। জগতের অস্তিত্বের ধারণা আমরা কিছুতেই এড়াইতে পারি না। জগৎ আছে বলিয়া আমরা যে অনুভব করি, তাহা নিরর্থক নহে। নিশ্চয়ই তাহার মূলে কারণ আছে। জগৎ আছে বলিয়া অনুভব করিবার মূলে যে কারণ আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। সেই কারণে জগৎ যে একেবারেই মিথ্যা, তাহা বলা যাইতে পারে না। কোন যুক্তিই মায়াবাদীকে তাহার গৃহ, শরীর, ক্ষুধা, খাদ্য প্রভৃতির চিন্তা হইতে বিরত করিতে পারে না। কিন্তু ইহাতেই ঠিক মায়াবাদ খণ্ডিত হয় না। কারণ, মায়াবাদী আপনার গৃহ, শরীর, ক্ষুধা ও খাদ্য প্রভৃতির চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি মনে মনে জানেন—ইহা মায়ারই ব্যাপার। কবেকার কি সংস্কার এখনও তাহার মনকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে; তাই একেবারে তিনি এসকল ভুলিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এখন যত তাহার তত্ত্বজ্ঞান হইতেছে, ততই তিনি এসকলে আসক্তিশূন্য হইতেছেন। পরে একেবারে জগদ্-ভ্রম বিদূরিত হইবে। দীর্ঘকাল গতিবিশিষ্ট রেলের গাড়ী চড়িয়া পরে যখন গাড়ী হইতে নামা হয় তখনও যেন রেলের গাড়ী চড়িয়া যাইতেছি এরূপ মনে হয়। সংস্কার একেবারে যায় না; অথচ তত্ত্বজ্ঞানী তাহাতে আসক্ত হন না। আমরা অভ্যাসের বশে অনেক কাজ করিতে পারি; কিন্তু আমাদের আত্মা তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারে। কি মায়াবাদী, কি অন্য কেহ জগতের চিরস্থায়িত্ব বিশ্বাস করিতে বাধ্য, এসকলই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। জগৎ যে এখনই আছে, পূর্ব্বে ছিল না বা পরে থাকিবে না—এমন কেহ বিশ্বাস করে না। কোন না কোন আকারে জগৎ পূর্ব্বেও ছিল ও পরেও থাকিবে—ইহাই সকলের বিশ্বাস। যদি তাহাই হয়, এবং 'আত্মা' বলিয়া যদি অন্য কিছু থাকে, তাহা হইলে এমন এক সূত্র আছে, যে সূত্রে জগতের সহিত আত্মার এমন এক সম্বন্ধ আছে, যাহাতে জগৎ আত্মার সুখ-দুঃখের মূলীভূত কারণ হয়। জগতের

জীব যে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়া জাগতিক সুখ-দুঃখের অধীন হয়, সেই প্রাকৃতিক নিয়ম এই সূত্রঘটিত। বস্তুতত্ত্ববাদীর এই কথার উত্তরে মায়াবাদী বলিবেন, এসকল আত্মার কল্পনা। আত্মা ভিন্ন আর কিছুই থাকিতে পারে না, যদি থাকে আত্মার সহিত কোন সূত্রে তাহার কোন সম্বন্ধ চিন্তা করা যাইতে পারে না। যাহা আত্মার অতিরিক্ত তাহাই অনাত্মা; আলোকের সহিত অন্ধকারের যে সম্বন্ধ, আত্মার সহিত অনাত্মার সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভাবে কোন সম্বন্ধই নাই; তবে যে সম্বন্ধ কল্পনা করা যায়, তাহা মিথ্যা। সুতরাং জগৎ সম্বন্ধে আত্মার যে ধারণা, তাহা মিথ্যা; কিন্তু মিথ্যা হইলেও এরূপ ধারণা হয়, তাহা হইলে ইহাকে মায়া ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। মায়াবাদী যুক্তিতে জগতের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পান না। তিনি যখন যুক্তি করিতে বসেন, তখন দেখেন জগৎ থাকিতে পারে না, কিন্তু জগৎ না থাকিলে, জগৎ সম্বন্ধে সংস্কার কেমন করিয়া হইতে পারে তাহারও কোন উত্তর তিনি যুক্তিতে পান না। 'জগৎ আছে' একথা তিনি বলিতে পারেন না। 'জগৎ নাই অথচ জগতের সংস্কার কেমন করিয়া হয়' একথাও তিনি বলিতে পারেন না; সুতরাং মায়াবাদের অবতারণা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। যখন 'জগৎ না থাকিলে জগতের সম্বন্ধে সংস্কার হইতে পারে না' একথার প্রতিবাদ তিনি করিতে পারেন না, তখন তাঁহাকে প্রমাণ-স্বরূপ শ্রুতিবাক্যের সাহায্য লইতে হয়।

ঈশ্বরকে নিগুর্ণ বলা হইয়া থাকে। বেদান্তেও ব্রহ্মকে নিগুর্ণ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকে বর্ণনা করিতে না পারিয়া উপনিষদ্‌ও 'নেতি' 'নেতি' বলিয়াছেন। ঈশ্বরকে কি বলিব, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। যাহা কিছু বলিতে যাওয়া যায় তাহাই তিনি নহেন, তাই বলিয়া ঈশ্বর কি ব্রহ্ম কিছুই নহেন? পূর্ণপ্রজ্ঞ বলেন, ব্রহ্ম যে কিছুই নহেন, তাহা হইতে পারে না। চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থই গুণযুক্ত কিন্তু ব্রহ্মকে নিগুণ বলা হইয়াছে। নিগুর্ণ বলিয়া ব্রহ্ম যে একেবারে কিছুই নহেন, তাহা হইতে পারে না। আমরা এমন কিছুরই অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না, যাহা একেবারে গুণাতীত। যে কোন বস্তুরই কল্পনা করা যাউক না কেন, তাহার কোন না কোন গুণ থাকিবেই। তবে ঈশ্বরকে কেমন করিয়া নিগুর্ণ বলা যাইতে পারে। নিগুর্ণ কিছুই থাকিতে পারে না। কাজেই ঈশ্বরকে যদি নিগুর্ণ বলা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বর যে কিছুই নহেন—এই ধারণা হওয়া সম্ভব। পূর্ণপ্রজ্ঞ সেই কারণেই ঈশ্বরকে নিগুর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না; অথচ উপনিষদ্ ও বেদান্তের কথাও মিথ্যা নহে। শাস্ত্র যেখানে ব্রহ্মকে নিগুর্ণ বলিয়াছেন, 'নেতি' 'নেতি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে শাস্ত্রের অন্য তাৎপর্য্য আছে। যদি তাহা না থাকিত, তাহা হইলে শাস্ত্র যেখানে তাঁহাকে সৎ, চিৎ ও আনন্দ বলিয়াছেন,

সেখানে সে শাস্ত্রবাক্যে কি বুঝিতে হইবে? শাস্ত্রের এই সকল বাক্য আপাততঃ পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহার কি কোন তাৎপর্য্য নাই?

সরলবুদ্ধি মানবের ঈশ্বর ও জগৎ সম্বন্ধে যে স্বাভাবিক সংস্কার তাহারই উপর পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মত প্রতিষ্ঠিত। তিনি সরল যুক্তি দ্বারা অতিজ্ঞানীদের দুরূহ মতের খণ্ডন করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি বেদ মানিতেন এবং বেদ ও পুরাণের বহুদেবতার মধ্যে বিষ্ণুকেই ঈশ্বরের পদে বসাইয়াছিলেন। এই বিষ্ণু জীব ও জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। জগৎ পরিণামী ও অনিত্য হইলেও তাহা মিথ্যা নহে; কারণ, যাহা মিথ্যা বা অবাস্তব, তাহা কোনদিনই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা জাগতিক বিষয় নিত্য প্রমাণিত হইতেছে এবং এই দ্বিবিধ প্রমাণ-বলে জড়বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বর ও ঈশ্বরী বা বিষ্ণু ও শ্রী সম্বন্ধে অপৌরুষেয় বেদই প্রমাণ এবং ইহাকেই তিনি ত্রিবিধ প্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মনে করিতেন।

ভেদই তাঁহার মতের মেরুদণ্ড। এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর ভেদই তৎসম্বন্ধে যাথার্থ্য আনিয়া দেয়। ভেদকে ঔপাধিক বলিলেও তাহাকে কোনরূপে মিথ্যা বলা যায় না। ভেদের পারমার্থিক সত্তা জ্ঞানেতেই নিহিত থাকে; সুতরাং ভেদ মাত্রই নিত্য। জীব বলিলেই তাহার পরাধীনতা, অল্পজ্ঞতা ও অক্ষমতার বা সামর্থ্যাল্পতার জ্ঞান স্বতই উদিত হয়। সেইরূপ ঈশ্বর বলিলে, তাহার সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্বের জ্ঞান আপনি আসিয়া থাকে। মায়াবাদের দ্বারা এই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সম্পাদন কোনরূপেই হইতে পারে না। জীবকে ব্রহ্ম বলিলেই তাহাতে মায়া অবিদ্যা বা অজ্ঞানের লেশ কোন দিন ছিল না ও থাকিতে পারে না এইরূপ প্রতীতি হইবে। সুতরাং জীব চিরদিনই জীব। জীবের 'ব্রহ্মাস্মি' বলা ভয়ঙ্কর অপরাধ। বিষ্ণুকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেই তাহার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, এবং সেই বিষ্ণুর সেবা করাই তাহার পরমপুরুষার্থ।

ভগবদ্বিগ্রহে ভক্তি, স্বাধ্যায়, সংযম, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, নিত্যানিত্য বিবেক ও ভগবদ্ধ্যান দ্বারা শ্রীহরির দর্শন লাভ হয়। অঙ্গে অঙ্গে বিষ্ণুর নামাঙ্কন, স্ত্রীপুত্রাদির বিষ্ণুজ্ঞাপক নামকরণ করিয়া ভগবৎ-স্মৃতি জাগরূক রাখিতে তিনি আদেশ করেন এবং কায়মনোবাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিতে বলেন। সৎপাত্রে দান, বিপন্নের ত্রাণ ও শরণাগতের রক্ষার দ্বারা কায়িক ভজন করিতে হয়। দীনে দয়া, সর্ব্ববাসনা-বিবর্জ্জিত হইয়া ভগবৎ-কার্য্য করিবার স্পৃহা এবং গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে ঐকান্তিক শ্রদ্ধার দ্বারা মানসিক ভজন সিদ্ধ হয়। স্বাধ্যায়, সত্য, হিত ও প্রিয়কথনের দ্বারা বাচিক ভজন নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

এই ত্রিবিধ ভজনের দ্বারা বিষ্ণু প্রীত হইয়া থাকেন। তিনি প্রীত হইলে, জীব অন্তে বিষ্ণুরূপ পরিগ্রহ করিয়া গোলোকপতি সহ বৈকুণ্ঠে নিত্য বিহার করিতে থাকে। এই সারূপ্য ও সালোক্যই প্রকৃত মুক্তি ; নির্ব্বাণ বা জীবন্মুক্তি কথার কথা মাত্র।

সংক্ষেপত আচার্য্য মধ্বের এই মত। এই মত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের সহিত বহু বিচার করিয়াছিলেন, অনেক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন এবং শেষ ভগবদ্গীতা, ব্রহ্মসূত্র ও দশ উপনিষদের শরণাগত হইয়া প্রত্যেকেরই এক একটী স্বমতানুযায়ী ভাষ্য রাখিয়া গিয়াছেন।

মধ্বাচার্য্যের মতপোষক কিছু কিছু যুক্তি তন্মতাবলম্বিগণ দিয়া থাকেন। আমরা সেই যুক্তি-পরম্পরার অনুসরণ করিয়া নিম্নে কিছু আলোচনা করিব।

গীতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাণী। তিনি সকল রকম সাধনোপায় বর্ণনা করিয়া বলিলেন—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' আবার 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু'। যেহেতু 'বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্' অর্থাৎ আমি অপৌরুষেয় বেদের বেত্তা ও বেদান্তের রচয়িতা, তোমরা না বুঝিয়া বহু মত লইয়া কলহ করিও না। তোমরা আমার শরণাগত হও, আমি তোমাদের মুক্তি দিব। ইহাই আচার্য্য মধ্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি বেদোপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র লইয়া টানাটানি না করিলেই পারিতেন; কারণ, বেদকে কোন জীবই স্পর্শ করিতে পারেন নাই, বিষ্ণু ইহার উদ্ধারকর্ত্তা, পুরাণবিদ্ আচার্য্যের ইহা নিশ্চয়ই জানা ছিল। আর উপনিষদ্-বেদান্ত সনাতন ঠাকুরের ঝুলি, যে যাহা মনে করিয়া হাত দিবে, সে তাহাই পাইবে,—'দুগ্ধে অস্মৈ বাগ্‌দোহং যো বাচো দোহঃ' (ছান্দোগ্য—১.৩.৭)। কামধেনুরূপিণী বাক্, তাঁহাতে যত দোহ বা ক্ষীর আছে, তিনি তাহা তাঁহার সুধী ভক্তগণকে দিয়া থাকেন। ভক্ত শৈবই হউন আর বৈষ্ণবই হউন, তিনি বাক্‌সমূহের মধ্যে প্রার্থিত ক্ষীর লাভ করিয়া কৃতার্থ হন, কিন্তু শেষে তর্জার লড়াই লাগিয়া যায় তাহাদের মধ্যে, যাহারা কেবল ভক্তের গেরুয়া বা কম্বলকন্থা বহন করিতে ব্যস্ত।

পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে গোলোকপতি ও কৈলাসপতির প্রাধান্য বহু প্রকারে ঘোষিত হইয়াছে। আশুতোষ শিবের অর্চ্চনা করিয়া অসুরগণ অজেয় হইয়া স্বর্গের সিংহাসন কাড়িয়া লইত, আর দেবগণ ভীত ও পরাজিত হইয়া অসুর-নিধনের জন্য শ্রীহরির শরণাগত হইতেন। বিষ্ণু অবতীর্ণ হইলেও ভোলানাথের ভুল ঘুচিত না। অসুর আর্ত্ত হইয়া শূলপাণিকে ডাকিলেই তিনি নির্লজ্জের মত চক্রপাণির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আসিতেন, বোধ হয় হরির রঙ্গ দেখিবার জন্য। নিষ্পত্তি হইত আসুরিকতার মুক্তিতে, আর উভয়ের আলিঙ্গনে।

সবিশেষ হরির সহিত নির্ব্বিশেষ হরের মিলন দেখিয়া আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি; আর জগৎ এদিকে অসুরের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পায়। সেই বিষ্ণুর বিভূতির অন্ত নাই, কিন্তু সকল বিভূতির যে শেষ পরিণাম সেই ভস্মই শিবের বিভূতি। সে বিভূতি কি জীবে ধারণ করিতে পারে? জীবের পক্ষে সগুণ শ্রীনিবাসের শরণাগত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবের শ্রীনিবাস-দর্শনের মূলই যে শিব, ইহা স্মরণ রাখা উচিত, কারণ শিবপ্রসাদে প্রমত্ত অসুরের নিধনের জন্য বিষ্ণু তাঁহার দর্শনীয় পদ দেখাইতে ধরায় অবতীর্ণ হন। তাই হরি শিবনিন্দা সহিতে পারেন না, আবার শিব হরির নিন্দা সহিতে পারেন না। আমরা পুরাণ পড়িয়া এই বুঝিয়াছি যে, শিবের গুরু রাম, আর রামের গুরু শিব। আবার দুইজনের বিবাদবার্ত্তা শুনিয়া মনে হয় যেন স্বামিস্ত্রীর কলহ। শেষ দুইজনে মিলিয়া এক হ'ন, তখন হর বড় কি হরি বড় কিছু বুঝিবার উপায় থাকে না। হরি বড় চতুর, তাঁহার হরের প্রতি টানটী কাহাকেও বুঝিতে দেন না, আর পাগল হরের পাগলামী দেখিতে ভালবাসেন। পাগলকে কতবার কত রকম করিয়া ক্ষেপাইয়াছেন, তাহা পুরাণে বিবৃত আছে। এসব হেঁয়ালী বুঝা ভার। আর্য্যগণের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ অথবা সগুণ ও নিগুর্ণ ঈশ্বরদ্বয়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের অনেক ঈশ্বর আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে দ্বন্দ্ব আরও বাড়িয়াছে, ভক্তিবিশেষও কমিয়াছে। যাহা হউক আচার্য্য মধ্বের বিষ্ণুর পরিবর্ত্তে যদি ঈশ্বরের অন্য কোন সর্ব্ববাদিসম্মত নামকরণ করা যায় এবং অঙ্গে নামের ছাপা, তিলকাদি দেওয়া রহিত করা যায়, তবে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে কোনও মানবেরই আপত্তি থাকিতে পারে না। ভগবানের নামে নামকরণ করা খ্রীষ্টান, মুসলমানের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও তৎসহ অবস্থানকারীদের মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল, উহাতে বিশেষ বাধিবে না। কেবল ঈশ্বরের নামকরণ লইয়া একটু ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইবে।

এখন জল, স্থল ও আকাশে অবাধে গমনাগমনের যেরূপ সুব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে সমস্ত মতাবলম্বীদের একত্র মিলিত হইবার সুযোগ আছে। পূর্ব্বে ইহার কিছুই ছিল না। কত দেশ ছিল, কত মত ছিল, তাহা ভারতের লোকেদের জানিবার কোন উপায় ছিল না। নাম লইয়া পরে যাহাতে কলহ না উঠে, সেই জন্য ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা ঈশ্বরের নাম রাখিয়াছিলেন আত্মা, যিনি সকল দেশের ও সকল জীবের পরিচিত ও অত্যন্ত প্রিয়। পরবর্ত্তী আচার্য্যেরা সাধারণ মানবের অনুপযোগী ও অস্বাভাবিক ধর্ম্মমত সৃষ্টি করিয়াছেন এই আত্মার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া। বেদব্যাস ঈশ্বরের শব্দ-বাচ্যত্ব বুঝাইতে গিয়া জোর গলায় বলিলেন 'গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ' (১.১.৬) সকল শব্দই গুণবাচক হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই—স্বরূপবাচক আত্মশব্দ

হইতেই ইহা বুঝা যায়। আর্য্য ঋষিরা যুগযুগান্তর ধরিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া ঈশ্বরকে খুঁজিয়াছিলেন। কোথাও তাঁহাকে পান নাই। যখন পাইলেন, তখন দেখিলেন তিনি অন্তরে বসিয়া হাসিতেছেন। চিন্তামণিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া যদি কেহ আকাশ-পাতাল, গিরি-গহন খুঁজিয়া বেড়ায়, তবে চিন্তামণি হাসিবেন না? ঋষিরা তাঁহার দর্শন পাইয়া বলিলেন—'ও ঠাকুর, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমাদের ভ্রমণ-চক্র দেখিতেছ, তোমাকে খুঁজিতে গিয়া তোমার কত অনাদর করিয়াছি, তুমি একটী কথাও কহ নাই। এইবার তোমাকে ধরিয়াছি, তোমার এই আচরণ সকলকে জানাইয়া দিব।' শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ (ঋগ্বেদ-১০.১৩.১) বলিয়া জগদ্বাসীকে জানাইলেন—এই অমৃত-দেবতা তোমাদেরই মধ্যে বসিয়া আছেন। জ্ঞানে অজ্ঞানে ইঁহার অনাদর করিলে ইনি কথা কহিবেন না। ইঁহার উপাসনা কর, ইনি তোমাদের আর্থিক ও পারমার্থিক সিদ্ধি দান করিবেন—সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয় এতদ্‌ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য-৩.১৪.৩)। আর কি না—ইতঃ প্রেত্য অভিসংভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসা অস্তি (ঐ)। অর্থাৎ ইঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার না করিয়া মরণের পর চলিয়া গিয়া ব্রহ্মলাভ করিয়া অভিসম্পন্ন হইব—এইরূপ যাহাদের বিশ্বাস তাহাদের চিকিৎসা নাই। লোকে বলে এ রোগের আর ঔষধ নাই, সেই কথাই পরম ভক্ত শাণ্ডিল্য ঋষি বলিয়াছেন।

মধ্বপন্থীরা বলেন, আচার্য্য শঙ্কর স্বেচ্ছামত আত্মার কখন সংসারী জীব, কখন ব্রহ্ম অর্থ করিয়া জীবব্রহ্মৈকবাদ স্থাপন করিতে গিয়া উপনিষদের ভিন্নার্থ করিয়াছেন। উপনিষদের প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে 'য এবং বেদ' বলিয়া যে ফলশ্রুতি আছে, তাহা কাহার জন্য? আত্মাকে হারাইয়া যাহারা মরে, আত্মাকে পাইয়া যাহারা বাঁচে, তাহারাই জীব, তাহাদের জন্যই এই ফলশ্রুতি। জীবাত্মা আর 'সোনার পাথর বাটী' এক কথা। আত্মা নিত্য, সত্য, সনাতন, আর জীব মর্ত্ত্য। আত্মা শব্দের অর্থ লইয়া বোধ হয় পূর্ব্বে-পূর্ব্বে বহু মতভেদ ছিল এবং শঙ্করের সময়ে আত্মা 'সোনার পাথর বাটীতে' পরিণত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে এই গোল মিটাইবার জন্য পরমাত্মা কল্পিত হইয়াছিলেন এবং জীবের বহুকালের আত্মত্বের দাবী মানিয়া তাহাকে পরমাত্মার অংশ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এই ব্রহ্মাংশবাদটুকু বাদ দিলে রামানুজ-প্রমুখ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের সহিত মধ্বমতের আর কোন বিরোধ থাকে না। আত্মা কি জড়বৎ বিস্তৃত পদার্থ যাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া অংশ বা অণুতে পরিণত করা যায়? আত্মার বহির্লিঙ্গ যে প্রাণ তাহার সমত্ব বুঝাইতে গিয়া উপনিষৎকার বলিয়াছেন,—একটী জীবাণুর, একটী পিপীলিকার, আর একটী হস্তীর প্রাণ সমান। প্রাণী ক্ষুদ্র বলিয়া তাহার প্রাণ

ক্ষুদ্র নহে। সুতরাং আত্মার অংশত্বজ্ঞান জড়বুদ্ধির পরিচায়ক। আত্মার অকার্ৎস্ন্যও তদ্রূপ যুক্তিবিরুদ্ধ। আত্মার উপমার নিমিত্ত বলা হইয়াছে 'অসকৃদ্বিদ্যুত্তং সকৃৎবিদ্যুৎ' (বৃহদারণ্যক ৩.৩৬), 'অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো, রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।' (কঠঃ ২. ১০)-পুনঃ পুনঃ দীপ্তিশীল বিদ্যুৎ যেমন বহু নহে এক। একই অগ্নি যেমন পৃথিবীতে বহুরূপে প্রকাশিত হন, সেইরূপ একই আত্মা বহু জীবের মধ্যে বহুরূপে প্রতিভাত হন। এই আত্মাই বিষ্ণুর পরম পদ। কঠোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে,—'বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোর্পরমং পদম্ (৩.৯)।' বহু পুণ্য করিলে তবে—আত্মাকে লাভ করিয়া মানুষ হওয়া যায় এবং তদপেক্ষা বহু তপস্যা করিলে এই আত্মাকে বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া জানা যায়। তখন পাওয়া সার্থক হয়। কারণ, যে বস্তুকে না জানিল, তাহার বস্তু পাওয়া না-পাওয়া সমান। বানরে মুক্তামালার মহত্ব কি বোঝে? সুতরাং সাধারণ লোকে ভগবদ্বিগ্রহ লইয়া মধ্বচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভজন করিলে ভগবৎ-কৃপালাভ করে এবং তাঁহার কৃপায় সদ্গুরু লাভ হয়। তিনি আসিয়া অন্তরে বিষ্ণুতত্ত্বের উদ্বোধন করেন। তাই বলিয়া কেহ যেন ভগবদ্বিগ্রহকে কল্পিত মনে না করেন। আত্মনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে বিষ্ণুতত্ত্ব এই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিগ্রহ সত্য, কল্পিত নহে। শব্দ যেমন অর্থকে জ্ঞাপন করে, দেবমূর্ত্তিও সেইরূপ দেবতত্ত্বকে জানাইয়া দেয়। জ্ঞানগম্য বিষয়কে বর্ণাক্ষর সমন্বয়ের দ্বারা যেমন জানান যায়, মূর্ত্তি দিয়াও সেইরূপ জানান যায়। ভগবানের হস্তপদাদিকে মানুষের ন্যায় মনে করিলে তত্ত্বের উদ্ভব হয় না। সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাস সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত অচল সনাতন সাক্ষিস্বরূপ ভগবানের বড় ঘড় করতালের মত চক্ষুবিশিষ্ট অন্য ইন্দ্রিয়ের সামান্য চিহ্নযুক্ত পদবিহীন জগন্নাথের মূর্ত্তিতে দেখান হইয়াছে। রূপের সহিত তত্ত্বের পরিচয় শুরু করিয়া দেন। অঙ্গে অঙ্গে ধ্যান করিয়া তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিতে হয়, মনুষ্যবৎ অঙ্গের চিন্তার দ্বারা কোন তত্ত্বই উদ্বোধিত হয় না। সম্প্রদায়গুরুদের কৃপায় এসব পদ্ধতি বহুকাল লুপ্ত হইয়াছে। ভগবানের হস্তপদাদির ও আয়ুধাদির কল্পনা কি ভাবে হইয়াছে বেদে স্থানে স্থানে তাহা বিবৃত আছে।

আচার্য্য মধ্ব যদি বিষ্ণুকে আত্মা অতিরিক্ত কিছু বুঝিয়া থাকেন এবং তাঁহার বিগ্রহকে চিন্ময় না ভাবিয়া মনুষ্যশরীরবদ্ বুঝিয়া থাকেন তবে ঐ মতের প্রতিপক্ষে ব্রহ্মসূত্রে কি আছে তাহা মধ্বমতাবলম্বিগণের অনুবর্ত্তন করিয়া এইরূপে দেখান যাইতে পারে—

'করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ' (বেদান্তসূত্র ২·২·৪০) ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়াদি করণবিশিষ্ট মনে করিলে তাঁহাতে মনুষ্যবদ্ ভোগাদির সম্ভাবনা-জনিত দোষ আসে; এবং 'অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা' (ঐ-২·২·৪১) তাঁর মূবিনাশ ও মূর্ত্ত মানবের ন্যায় অসর্ব্বজ্ঞতা দোষের আশঙ্কা হয়। আর কি? 'নচ কর্ত্তুঃ

করণম্' (ঐ ২·২·৪৩) এইরূপ মনুষ্যবৎ কর্ত্তা 'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ' (মুণ্ডক-১.১.৭) উর্ণনাভির ন্যায় নিজের সৃষ্টির করণ হইতে পারে না।

জীবব্রহ্মভেদ-পক্ষে ব্রহ্মসূত্র বলিয়াছেন—

'পৃথগুপদেশাৎ' (২·৩·২৮)—স্বমহিমা উপদেশের নিমিত্ত জীবকে পৃথক্ করিয়া সৃষ্টি করা হয় আর—'তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ' (২·৩·২৯)
আত্মরূপী ভগবানের সারগুণ জ্ঞাতৃত্ব জীবকে প্রদান করায় তাহাকে প্রাজ্ঞবদ্ বিবেচনা করা হয়। জ্ঞাতৃত্ব আছে কিন্তু সৃষ্টি-কর্তৃত্ব নাই।

এইবার বিষ্ণুর সাধনা কিরূপে হয় তৎসম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন—

'স যদশিশিষতি যৎ পিপাসতি যন্ন রমতে তা অস্য দীক্ষাঃ (৩·১৭·১)।' সেই পুরুষ (ভক্ত) যখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াও তাহার ভোজনেচ্ছা ও পানেচ্ছা নিবারণ করেন না, কোন বস্তুতে তৃপ্তিবোধ করেন না, তখনই এই আত্ম-(বিষ্ণু) মন্ত্রের দীক্ষা হয়। 'অথ যদশ্নাতি যৎ পিবতি যদ্রমতে তদুপসদৈরেতি।' (৩·১৭·২) দীক্ষা হইলে তিনি পানভোজন রমণ সকলই করেন, কিন্তু রাক্ষসের মত নহে, ব্রত নিয়মসহ চলিতে থাকেন।

'অথ যদ্ধসতি যজ্জক্ষতি যন্মৈথুনং চরতি স্তুতশস্ত্রৈরেব তদেতি।' (৩.১৭.৩) আত্মধ্যান নিমগ্ন হইয়া যখন তিনি হাস্য করেন, ভোজন করেন, মিথুনীভূত হইয়া ক্রীড়া করেন, তখন যেন তিনি বেদমন্ত্রের দ্বারা স্তুত হইয়া চলিতে থাকেন।

'অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ।'—(৩·১৭·৪)

অনন্তর তিনি যে তপদান সরলতা অহিংসা সত্যকথনাদির আচরণ করেন, ইহাতে আত্মার (গুরুর) দক্ষিণা দেওয়া হয়। ভক্ত মহীদাসের জীবনকে ত্রিবিধ সবনে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং সেইরূপ ভক্তের জীবনের আচরণ সংক্ষেপত বলাও হইয়াছে এবং 'অস্য' পদের দ্বারা আত্মা মন্ত্র ও গুরুর অভিন্নতা প্রদর্শিত হইল। এই জন্যই বৈষ্ণবেরা বলেন 'গুরুকে মানুষ ভজে সে পাপী নরকে মজে'। ইহার পর মন্ত্রে ভক্ত দেহান্তে যজ্ঞান্তে অবভৃত স্নানকারী যাজ্ঞিকের ন্যায় বিষ্ণুরূপী হইয়া উত্থিত হন তাহা বলা হইয়াছে।

আদিত্যই বৈকুণ্ঠের দ্বার-স্বরূপ। যে লোকে সর্ব্ববিধ কুণ্ঠা-বিবর্জ্জিত হইয়া বিচরণ করা যায় ভক্ত দেহান্তে সেই লোক কিরূপে পাইয়া থাকেন তাহা আর্ষ ঈশোপনিষৎ হইতে উদ্ধৃত হইল :—
'অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাৎ অন্যদেবাহুরসম্ভবাৎ। ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নাস্তদ্বিচচক্ষিরে (ঈশা·১৩)।' জন্মালেই লোকে বলে ঐ একজন হয়েছে, মরিলে বলে ঐ একজন মরিল। এই দেখ আমি জন্মিয়াছি কেহ বলে না, এই দেখ আমি মরিয়াছি ইহাও কেহ বলিতে পারে না। জন্মিয়া উৎপত্তির

জ্ঞান ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু মরিয়া মরণের জ্ঞান কি কাহারও হয়? কাহারও যে কাহারও হয় বিচক্ষণ ধীরগণের নিকট তাহা আমরা শুনিয়াছি। কি শুনিয়াছি? 'সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামমৃতমশ্নুতে (ঐ-১৪)।' জন্ম ও মৃত্যু দুই যে এক সঙ্গে জানে সেই মরণের পর অমৃতকে ভোগ করে। সে আবার কি কথা? যে জানে সে কিরূপে পায় তাহাই শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছে—হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ তত্বং পূষন্নপাবৃনু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে। পূষন্ একর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহরশ্মীন্ সমূহ, তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি, যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি। বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং। ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর কৃতং স্মর। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্, যুযোধি অস্মদ্ জুহুরানমেনো ভুয়িষ্ঠা—তে নম-উক্তিং বিধেম॥'—(ঐ-১৫.১৮)। হিরণ্ময় অর্থাৎ লোভনীয় পদার্থের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত রহিয়াছে, হে পোষণকারী—সত্যধর্ম্ম প্রদর্শনের জন্য তাহা অপসৃত কর। হে পূষা, একগতি, সংযমনকারী, প্রসবকারী—প্রজাসৃষ্টির উপাদানভূত রশ্মিসকলকে সম্যক্ বহন কর। তোমার তেজেতে যে কল্যাণতম রূপ দেখিতেছি ঐ ঐ পুরুষ আমি হইতে চাই—প্রাণবায়ু-আর চলিতেছে না, শরীর পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, এখনও ইহা মৃত হয় নাই। ওহে ক্রতু পুরুষ কামকৃত কার্য্য শরণ কর, ওহে কর্ম্মা—স্মরণ কর, তুমি কি কি করিয়াছ একবার স্মরণ কর। পাপকারী আর স্মরণ করিবে কি? তাহার পাপিষ্ঠতর দেহ আজ ভস্মান্ত হইয়াছে। আছে পূত ভক্তের আত্মা অগ্নি জ্যোতিরূপে বর্ত্তমান। তাঁহাকে ভক্ত বলেন—হে অগ্নি, তুমি বিশ্ববিতানে অভিজ্ঞ, হে দেব আমাদের ভগবদ্বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য শোভন পথ দিয়া লইয়া চল। ঐ কুটিল কুণ্ডলীকৃত রশ্মি আমাদের নিমিত্ত সংযোজনা কর, তোমার বহু নমস্কার বিধান বা ব্যবস্থা করিব।

যিনি প্রাণ মন দিয়া ভগবদর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তিনি এই ব্যাখ্যা সরল ও সমীচীন কি না বিচার করিয়া দেখিবেন। মাধ্বগণ যুক্তিপরম্পরায় এই সকল উক্তিই সমর্থন করিয়া থাকেন।

মধ্বাচার্য্য ভগবান্‌কে বিষ্ণু বলিয়াছেন এবং তিনি সবিশেষ অর্থাৎ অশেষ গুণের আকর এবং সর্ব্বদা স্ব-শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মীর দ্বারা সেবিত। উপনিষদ্ আদিত্যমণ্ডলস্থ বিষ্ণু এবং মানবাধিষ্ঠিত বা পুরুষান্তর্গত আত্মাকে এক বলিয়াছেন, এবং এই আত্মাকে সকল বা সর্ব্বকলাযুক্ত কখনও বা অকল বা কলারহিত বলিয়াছেন। শ্রীহরিকে সগুণ কি অগুণ বলা হইবে তাহা দেখা যাউক।

পরিদৃশ্যমান জগতের সকল পদার্থ বিবিধ গুণদ্বারা মণ্ডিত। গুণাগুণভেদের পরিচয় দ্বারা বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান হইয়া থাকে। যিনি এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা, বিশ্ব যাঁহার অনুভূতি, তিনি সকল গুণের জ্ঞাতা, তাঁহাতে কোন গুণ থাকিতে পারে না। তিনি বিষয়ী, তিনি বিষয় নহেন। গুণমণ্ডিত বস্তুর গুণ তাঁহারই কল্পনা। যে শক্তিবলে পরমেশ্বর এই কল্পনা করেন তাহাকে কেহ মায়া, কেহ প্রকৃতি আখ্যা

দেন, এই প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। ঈশ্বর গুণকে সৃষ্টি করেন, এবং গুণের দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন। কিন্তু জগৎ যেমন গুণের বাধ্য, তিনি গুণের বাধ্য নহেন। তবে সকল গুণের তিনি উৎস। যেখানে গুণ তাঁহার বাধ্য, অথচ গুণের তিনি বাধ্য নহেন, সেখানে তাঁহাকে গুণাতীত বলা যাইতে পারে। আমাদের আত্মা সকলই অনুভব করে, সেই জন্য আমরা সকলই জানিতে পারি। আমরা তাহা হইতে বিচ্যুত হইলে জড় হইয়া যাই। তাঁহার স্পর্শজন্য আমাদের জ্ঞাতৃত্ব। আমরা আত্মাকে জাগতিক পদার্থের ন্যায় গুণমণ্ডিত বলিতে পারি না। আত্মাই দেখে, আত্মা দৃষ্ট হয় না। আত্মাই করে, আত্মা কৃত হয় না, আত্মাই চালায়, আত্মা চালিত হয় না। সুতরাং যাহা দেখা যায়, করা যায়, পরিচালিত হয়, আত্মা সেই সকলের অতীত, সুতরাং বিশ্বসংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা আত্মার সদৃশ বা তুলনার যোগ্য হইতে পারে, সুতরাং আত্মাকে বুঝিতে গিয়া "নেতি নেতি" করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। বাস্তবিক আত্মা ইহাও নহে, উহাও নহে, তাই বলিয়া, আত্মা যে কিছু নহে, তাহা নহে, আত্মা যাহা, আত্মা তাহাই, আর কিছু নহে; নিত্য শুদ্ধ—অতি নির্ম্মল, অথচ সকলেরই উদ্ভবকর্ত্তা, সকলেরই পরিচালক ও দ্রষ্টা। সুতরাং এই আত্মাকে আমরা ঈশ্বর বলিতে বাধ্য।

সংসার দুঃখের মূল, সংসার হইতে অব্যাহতি পাইলে, দুঃখের হাত এড়ান যায়। সংসারের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে, সংসার হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। সংসারের সহিত সম্বন্ধের সূত্র মন। এই সূত্র বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে, সংসারের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না। আমার সংসারের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে, সংসার থাকা আর না থাকা আমার কাছে সমান।

এখন কথা এই যে, সংসারের সহিত সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন করা যায় কি না। যদি বিচ্ছিন্ন করা না যায়, যদি বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সংসার মিথ্যা এমন কথা বলা চলে না। সংসার স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে। আমি যদি মন লয় করিতে পারি তবে আমার পক্ষে সংসার রহিত হয়। যোগিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতএব সংসার মনের সংস্কারসম্ভূত। সংসার আছে, কিন্তু সংসারের সহিত আমার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য এমনও হইতে পারে না। যদি সংসার স্বতন্ত্রভাবে থাকে, এবং সংসারের সহিত সম্বন্ধ কোন কারণে হয়, তাহা হইলে, দুঃখের কারণ হয়। সংসারের সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইতে পারিলে দুঃখ ঘুচিয়া যায়। সংসার যদি মনের সংস্কার-সম্ভূত হয়, তাহা হইলে সে সংস্কারকে বদলাইতে পারিলে, দুঃখ আর থাকে না। কিন্তু সংসার যদি সত্য সত্যই থাকে এবং সংসারের সহিত সম্বন্ধ এড়ান অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সংসার মুক্তি হইতে পারে না, সে অবস্থায় সংসারকে সুখের করিবার চেষ্টা করাই পরমার্থ সিদ্ধির হেতু।

সংসার ও জীব আত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে আছে, এই মতকে দ্বৈতবাদ বলিতে হয়; জীব আত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না, আত্মারই অংশরূপে আছে, এই মতকে বিশিষ্টাদ্বৈত-

বাদ বলা হয়; আত্মাই আছে, সংসার বা জীব বস্তুতঃ নাই। সংসার প্রতীয়মান এবং মায়া, জীব অবিদ্যা-উপহিত কল্পনা মাত্র এইরূপ মতই অদ্বৈতবাদ।

সংসার যদি আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইত, তাহা হইলে সংসারের অস্তিত্ব বোধগম্য হইতে পারিত না। সংসার আত্মার কল্পনা, আমি আত্মায় অবস্থিত আছি, সেইজন্য সংসারের অস্তিত্ব আমার বোধগম্য হইতেছে। আমি সেই আত্মার প্রভায় আলোকিত অণু-বিশেষ। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈত-মতই সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়।

মুক্তি সম্বন্ধে মাধ্বগণ বলিয়া থাকেন—

ত্যাগ, ভক্তি, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে জানা মুক্তির একমাত্র উপায়। ধ্যানের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে জানিতে হয়। আমার ঈশ্বরকে অভিজ্ঞান কি হস্তপদাদিরূপে হইবে না আত্মরূপে হইবে?

স্থূল সূক্ষ্ম সকল বস্তুকে ঠিকভাবে জানিতে হইবে—অনুসন্ধান দ্বারা। অবহিতচিত্তে চিন্তা করিয়া বস্তুর বহিরন্তর অবগত হইবার চেষ্টাই ধ্যান।

চিন্তা, ধ্যান এবং ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকিলে শুধু সাধনার দ্বারা তাহা হয় না। অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেই আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

শ্রুতি বলেন, "যখন ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয়, তখন হৃদয়গ্রন্থি ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, সকল সংশয় বিদূরিত হয়, এবং কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।" কুম্ভকার যেমন কুম্ভের চাক ঘুরাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিলেও চাকটী ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধের অবশেষ যতকাল থাকে ততকালই অপরোক্ষিত জীবকে শরীর ধারণ করিতে হয়। "প্রারব্ধের অবসান হইয়া গেলে জীব একেবারে বিমুক্ত হয়, আর তাহাকে সংসারে ফিরিতে হয় না।" এইটী ব্রহ্মসূত্রের শেষ সূত্র।

ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তী মুক্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। মুক্তি বলিতে কি বুঝায়? ন্যায়-মতে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি-লাভই মুক্তি। অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম নির্গুণ, জীব মায়োপাধিরহিত হইলে তাহার নির্গুণত্ব প্রকাশ পায়। সুতরাং সে অবস্থায় জীবের ইচ্ছা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বা সুখ-দুঃখ-ভোগ কিছুই থাকে না। বৈষ্ণব দার্শনিকদিগের মত এই যে, জীবগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে সম্পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় এবং ঈশ্বরের সহিত একত্র আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। বৈষ্ণব দার্শনিকেরা জীবাত্মার একত্ব স্বীকার না করিয়া বহুত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে সকল জীব একরূপও নয়, এক এক জীবের এক এক প্রকৃতি। জীবের প্রকৃতিতে অজ্ঞানহেতু যে কলুষ আছে, তাহা নাশ হইলে জীব বিশুদ্ধ হয়; বিশুদ্ধ জীব পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার যোগ্য হয়।

ঈশ্বর দর্শন দিলে জীবের আর দুঃখ থাকে না। তখন ঈশ্বরের সঙ্গলাভ করিয়া জীব অপার আনন্দে থাকে।

দ্বৈতবাদীর মতে ভক্ত জীবের বিনাশ হইতে পারে না। সকল জীবের বিনাশ হয়, এই মত, তাঁহাদের মতে ভ্রমাত্মক। মুক্ত জীবের যে সুখদুঃখের জ্ঞান থাকে না, তাঁহারা এই মতের বিরোধী। তাঁহারা বলেন সুখদুঃখের জ্ঞান না থাকিলে জীবের অবস্থা জড়ের অবস্থার ন্যায় হইয়া যায়। জীব ও জড়ে তাহা হইলে প্রভেদ কি? স্ফটিক যতই উজ্জ্বল হউক না কেন, তাহা খনিজ পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নয়। যদি মুক্ত জীব ব্রহ্মে মিশিয়া গিয়া ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, তাহা হইলে সমুজ্জ্বল স্ফটিকেরই সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে, দ্বৈতবাদী এইরূপ অবস্থা বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন না। সুতরাং তাঁহাদের মতে মুক্তি দুঃখাদির অবসান নহে, তাঁহাদের মতে মুক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক উপভোগের উপযোগী আনন্দ। মুক্তাত্মার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি আনন্দময় ঈশ্বরের সঙ্গলাভ তাহার শাশ্বত আনন্দের উপভোগের সহায়তা করে।

জীব মুক্ত হইলে ঈশ্বরের সহিত এক বা সমান হয় না; অন্যান্য মুক্ত জীবের সহিত এক বা সমান হয় না। জীব ঈশ্বরের সহিত এক বা সমান পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হইতে পারে না। ঈশ্বর হইতে জীব বিভিন্ন। সকল জীবই পরস্পর বিভিন্ন; এক জীব আর এক জীবের সহিত সমান বা এক হইতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রের মতে ব্রহ্মের সহিত জীবের যখন যোগ হয়, তখন যে ব্রহ্মের সহিত জীবের কিছুমাত্র ভেদ থাকে না, এমন নহে। ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের সহিত জীবের যোগ হইলেও কতিপয় বিষয়ে ব্রহ্মের সহিত জীবের পার্থক্য থাকে। মুক্তাত্মারা ব্রহ্মের সহিত তাঁহাদের যোগ বুঝিতে পারেন কিন্তু ব্রহ্মের সকল শক্তি ও সকল ভাব প্রাপ্ত হন না, এবং ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া একও হইয়া যান না।

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য দুঃখ অতিক্রম করা। মানব-জীবন কি দুঃখময়, কি সুখময়, কি সুখদুঃখময়?

মানব সকল সময় এক অবস্থায় থাকে না। মানবের অবস্থার পরিবর্ত্তন প্রতিনিয়তই হইতেছে। পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা-পরম্পরার দ্রষ্টা আত্মা। আত্মা নির্ব্বিকার এবং নির্ব্বিশেষ। আত্মা নিত্য চৈতন্যময় এবং জ্ঞাতা। অবস্থা-পরম্পরা দেহের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাতেই দেহাভিমানী জীবের সুখদুঃখ ভোগ হয়। অবস্থা-পরম্পরা প্রকৃতির গুণ-সম্ভূত এবং গুণময়; আত্মা গুণাতীত, সুতরাং পরস্পরের আকাশ-পাতাল ভেদ। কিন্তু তথাপি যখন আত্মাকে অবস্থার বশবর্ত্তী মনে হয়, তখন এই দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধসূত্র মানিয়া লইতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের মতে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে ঐরূপ প্রভেদ, সুতরাং বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, তথাপি যে সম্বন্ধ

বোধ হয় তাহা ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র। বিষয় ও বিষয়ী বলিয়া কিছুই নাই, আছে কেবল এক আত্মা। আত্মা বিষয় কল্পনা করিয়া বিষয়ী হন। যিনি বিষয়ী হইয়াও আত্মজ্ঞানবশতঃ বিষয়াতীত তিনি ঈশ্বর। যিনি অজ্ঞানবশতঃ বিষয় ভোগ করেন তিনি জীব।

আত্মা চৈতন্যময় এবং জ্ঞানময়। যদি আত্মা জ্ঞানময় হয়, তাহা হইলে আত্মার জ্ঞানের বিষয় থাকা চাই। যদি আত্মার জ্ঞানের বিষয় না থাকে তাহা হইলে আত্মা জ্ঞাতা বলিয়া কিরূপে পরিচয় দিবেন? আত্মা জ্ঞাতা না হইলে, তাহাকে জ্ঞানময় ও চৈতন্যময়ও বলিয়া জানা যায় না।

যাহা জ্ঞানময় বা চৈতন্যময় নহে, তাহা কি? আমরা যাহাকে জ্ঞান ও চৈতন্যবিরহিত মনে করি, তাহাকে জড় বলিয়া থাকি। এখন জিজ্ঞাসা, জড় বলিয়া বস্তুতঃ কিছু আছে কিনা; আমরা বলিতে পারি, যাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় তাহাকেই আমরা জড় বলিয়া থাকি।

আত্মা জ্ঞাতা, সুতরাং আত্মার জ্ঞানের বিষয় আছে। জ্ঞাতা হইলেই জানিতে হইবে। কি জানিতে হইবে? যাহা কিছু সব জানিতে হইবে। আত্মার স্বভাবই কিছু না কিছু জানা। যাহা জানা যায়, আমরা তাহার বস্তুগত পৃথক্ সত্তা অনুমান করি। আমাদের এই অনুমান যথার্থ হইতে পারে না। আত্মা যদি জ্ঞাতা হয়, তাহা হইলে আত্মার যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহা আত্মার অংশ, কারণ আত্মা হইতে পৃথক্ কিছুই ছিল না, সুতরাং পৃথক্ নূতন কিছুই হইতে পারে না। আমরা জগৎকে পৃথক্ বলিয়া অনুমান ও অনুভব করি বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা আত্মা হইতে পৃথক্ নহে, তাহা আত্মারই অংশ। যদি তাহা অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ আত্মাকে জ্ঞাতা বলা যাইতে পারে না। তিনি যাহা যাহা জানিবার ইচ্ছা করিয়াছেন তাহার উপযোগী করণ নিজের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার কল্পনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন ইহা উপনিষদে কথিত আছে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আত্মার জ্ঞানের বিষয়, সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। আত্মারই জ্ঞানের বিষয়রূপে—সুতরাং আত্মারই অংশরূপে পরিদৃশ্যমান জগতের আত্মার সহিত নিত্য সম্বন্ধ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগতের কোন অংশ আত্মার জ্ঞানের বাহিরে থাকা সম্ভব নহে; তাহা হইলে আত্মারই জ্ঞানের অভ্যন্তরে সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগৎ বিদ্যমান, এবং তিনি জগতের সকল অংশ যুগপৎ জানিতেছেন। আত্মা জগৎকে আংশিকভাবে কখনই জানিতে পারে না। আমরা জীবজগতের সকল অংশ যুগপৎ জানিতে পারি না, এবং যুগপৎ জানাও সম্ভব মনে করি না; সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, আমার আত্মার এমন এক অবস্থা আছে যাহা সমগ্র জগৎকে যুগপৎ জানিতেছে। তদবস্থ আত্মাকেই পরমাত্মা বলা হয়, এবং তিনিই বিষ্ণু। তিনি কল্পিত জাগতিক পদার্থের গুণবিশিষ্ট না হইলেও চিদ্ঘন ও পূর্ণানন্দস্বরূপ।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

মহাপ্রাণ বর্ণ

এই প্রবন্ধে চৌকা বন্ধনীর [ ] মধ্যে যে রোমান অক্ষরে ও রোমানের আধারে প্রস্তুত নূতন অক্ষরে বাঙ্গালা ও অন্য ধ্বনিগুলি লিখিত হইয়াছে, সেই অক্ষরগুলি International Phonetic Association-এর বর্ণমালার। অক্ষরগুলি কোন্ কোন্ ধ্বনির প্রতীক তাহা প্রবন্ধ-মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট বা উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

§ ১। সংস্কৃত ভাষায় বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে 'মহাপ্রাণ বর্ণ' বলে। খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ—এইগুলি মহাপ্রাণ বর্ণ। প্রাতিশাখ্যকারগণ ইহাদের উচ্চারণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক ভারতে ইহাদের উচ্চারণ লুপ্ত হয় নাই। অল্প-প্রাণ স্পর্শ বর্ণের (অর্থাৎ বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের) উচ্চারণ কালে শ্রূয়মান প্রাণ বা উষ্মা বা শ্বাসবায়ুর যুগপৎ নির্গমন ঘটিলে, সোষ্ম বা মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনির উদ্ভব হয়। ক্-এর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বা শ্বাসবায়ু বা উষ্মা নির্গত হইলে, দাঁড়াইল ক্+প্রাণ=খ্; তদ্রূপ গ্+প্রাণ=ঘ্। এই প্রাণ বা উষ্মা বা শ্বাসবায়ু যখন সহজ ভাবে নির্গত হয়, কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরস্থ glottal passage বা কণ্ঠনালী-মুখের মধ্য দিয়া চালিত হইয়া উন্মুক্ত মুখ-বিবরে কোথাও ব্যাহত বা বাধা প্রাপ্ত না হইয়া বাহির হইয়া যায়, তখন ইহা আমাদের কর্ণে হ-কার এবং বিসর্গের ধ্বনিরূপে প্রতিভাত হয় : কণ্ঠনালীর মধ্যস্থিত vocal chords বা অধরোষ্ঠ-স্বরূপ পেশীর আকর্ষণের ফলে glottal passage বা কণ্ঠনালী-মুখের সংবার বা রোধ ঘটিলে, নির্গমনশীল শ্বাসবায়ুর দ্বারা আহত হইয়া উক্ত vocal chords বা কণ্ঠনালীস্থ পেশীগুলির মধ্যে vibration বা ঝঙ্কৃতি হয়, এবং তাহার ফলে, ঘোষ-ধ্বনি হ-কারের উৎপত্তি ঘটে; এবং কণ্ঠনালীর মধ্যস্থিত glottal passage বা মুখ-প্রণালীর বিবার বা মুক্তি ঘটিলে, vocal chords-এর পেশীগুলির আকর্ষণের কারণ থাকে না, নির্গমনশীল শ্বাসবায়ু নিরুপদ্রবে বাহিরে চলিয়া আইসে, কোনও ঝঙ্কৃতি শ্রুত হয় না,—তাহার ফলে অঘোষ হ-কারের উৎপত্তি। এই অঘোষ হ-কারই হইতেছে বিসর্গের মূলধ্বনি, যেস্থলে এই বিসর্গকে আশ্রয়-স্থানভাগিত্ব স্বীকার করিতে হয় না। ইংরেজীর h হইতেছে এইরূপ অঘোষ হ-কার, আমাদের ভারতীয় ঘোষবৎ হ-কার হইতে ইহা পৃথক্। শুদ্ধ প্রাণ বা উষ্মা বা শ্বাসবায়ু, যদি অঘোষ বিসর্গ ও ঘোষ হ-কার রূপে বহির্গত হইতে না পারে, মুখের মধ্যে জিহ্বার বা মুখের বাহিরে ওষ্ঠদ্বয়ের সমাবেশের ফলে, ইহার নির্গমন যদি ব্যাহত হইয়া যায়, তাহা হইলে যে ধ্বনি শোনা

যায়, সেই ধ্বনি হইতেছে জিহ্বাদির সমাবেশ অনুসারে বিভিন্ন বর্গের spirant বা fricative অর্থাৎ উষ্ম ধ্বনি। সহজ ভাবে বিনির্গত h—অঘোষ [h] এবং ঘোষবৎ [ɦ]-এর পরিবর্ত্তে আমরা পাই [x, ɣ; ʃ, ʒ; ʂ ʐ; s, z; θ, ð; f, v] প্রভৃতি উষ্ম ধ্বনি। পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরধ্বনির এবং পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণের প্রভাবে পড়িয়া, অর্থাৎ এই স্বর-ধ্বনির ব্যঞ্জন-ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অবশ্যম্ভাবী সমাবেশের প্রভাবে পড়িয়া, এইরূপ শুদ্ধ বিসর্গ বা হ-কারের, জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয় প্রভৃতি (কণ্ঠ্য, ওষ্ঠ্য এবং তালব্য প্রভৃতি) উষ্ম ধ্বনিতে পরিবর্ত্তন দেখা যায়: যেমন [ah, aɦ > ax, aɣ; ih, iɦ > iç, ij, বা iç, iʒ; uh, uɦ > uɸ, uβ], ইত্যাদি। এই সকল বিশিষ্ট উষ্ম ধ্বনি হইতেছে বিশুদ্ধ কণ্ঠনালীজাত উষ্ম ধ্বনি বা প্রাণধ্বনি [h, ɦ]-এর রূপভেদ। স্পর্শ বর্ণকে মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত করিতে যে প্রাণ বা উষ্মার বা শ্বাসবায়ুর আবশ্যক, তাহা কেবল মাত্র সহজ অঘোষ হ (অঘোষ ক্ চ্ ট্ ত্ প্-এর সহিত) বা ঘোষবৎ হ (ঘোষবৎ গ্ জ্ ড্ দ্ ব্-এর সহিত)। অতএব,—

অল্পপ্রাণ অঘোষ [k c ṭ t p]-এর সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালীয় অঘোষ প্রাণ বা উষ্মা [h] যোগ করিয়া অঘোষ মহাপ্রাণ [kh ch ṭh th ph]-এর উৎপত্তি; এবং তদ্রূপ অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ [g ɟ ḍ d b]-এর সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালীয় ঘোষবৎ প্রাণ বা উষ্মা [ɦ] যোগ করিয়া ঘোষবৎ মহাপ্রাণ [gɦ ɟɦ ḍɦ dɦ bɦ]-এর উৎপত্তি।

ভারতীয়-আর্য্য-ভাষায় আদি যুগ হইতে এই মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি বিদ্যমান, এগুলি আর্য্য-ভাষার বিশিষ্ট ধ্বনি। সেই হেতু আর্য্য ভাষার জন্য ভারতে যখন প্রথম বর্ণমালার উদ্ভব হইল, তখন পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর দ্বারা এই ধ্বনিগুলি দ্যোতিত হইল। পরবর্ত্তী কালে যখন মুসলমানদের আমলে ফারসী লিপির সাহায্যে ভারতীয় ভাষা হিন্দুস্থানী প্রভৃতি প্রথম লিখিত হইল, তখন মহাপ্রাণ বর্ণগুলির প্রকৃতি সহজেই বিশ্লেষ করিয়া, অল্পপ্রাণ ধ্বনিব্যঞ্জক ক, গ, চ, জ, ত, দ প্রভৃতিতে হ-কার যোগ করিয়া লেখা হইল—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৃহ (খ), চ্হ (ছ), জ্হ (ঝ), ত্হ (থ), দ্হ (ধ) ইত্যাদি। ইউরোপীয় রোমান অক্ষরে, প্রাচীন লাটিনেরা যে ভাবে গ্রীকের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিকে রোমান বর্ণমালায় লিখিতেন, সেই রীতির অনুসরণ করিয়া, kh, gh, ch (chh), jh, th, dh প্রভৃতিও লেখা হইল।

§ ২। মহাপ্রাণ ধ্বনির যথাযথ উচ্চারণ করিতে হইলে, অল্পপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনির অনুগামী এই কণ্ঠনালীয় উষ্মধ্বনিরও স্পষ্ট এবং শ্রুতিগম্য উচ্চারণ করা আবশ্যক। হ-কারের উচ্চারণ ভাষায় বিশুদ্ধ ভাবে বিদ্যমান না থাকিলে, এইরূপ মহাপ্রাণ স্পর্শবর্ণগুলির উচ্চারণ করা যে দুর্ঘট হইয়া উঠে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক ভারতে চলিত ভাষার বিকারের সঙ্গে সঙ্গে, সংস্কৃত

বা ভারতের আদি-আর্য্য-ভাষার প্রাচীন উচ্চারণ-রীতি সর্ব্বত্র সংরক্ষিত হইতে পারে নাই। ‘সংস্কৃত’, উচ্চারণ-পরিবর্ত্তন বা উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে, ‘প্রাকৃত’ হইয়া দাঁড়াইল। এই উচ্চারণের ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল, এক স্বাভাবিক বিকাশধর্ম্মের ফলে; কারণ প্রতি পুরুষ বা বংশ-পীঠিকায় অলক্ষিত ভাবে ভাষা একটু একটু করিয়া বদলায়। অনেক সময়ে এই বদলানো এত সূক্ষ্মভাবে ঘটে যে, দুই তিন পুরুষেও সাধারণ লোকে তাহা ধরিতে পারে না। অপর, উচ্চারণের ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল, নানা অনার্য্য-ভাষী জাতি কর্ত্তৃক আর্য্য ভাষা গ্রহণের ফলে; আর্য্য ভাষার ধ্বনি-রীতি অনার্য্যের অভ্যস্ত ছিল না, আর্য্য ভাষা তাহাদের দ্বারা গৃহীত হইতে থাকিলে, অনার্য্য ভাষার বহু ধ্বনি, বহু উচ্চারণ-রীতি এই আর্য্যভাষায় আসিয়া যায়। ভারতবর্ষে যে লক্ষ লক্ষ অনার্য্য-ভাষী আর্য্য ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল, সেরূপ অনুমান করিবার অনেক কারণ আছে। এইরূপে প্রাকৃত যুগেই সংস্কৃত ভাষার ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। পরে আরও ধরে। প্রাকৃত ও আদি-আর্য্য-ভাষার যুগের উচ্চারণ-রীতি কিরূপ ছিল, তাহা সর্ব্বত্র স্পষ্টভাবে বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু আধুনিক আর্য্য ভাষাগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায়, আদি-আর্য্য উচ্চারণ-রীতি বহুস্থলে অনপেক্ষিত ভাবে পরিত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং এইরূপ পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন যে কত প্রাচীন কালে ঘটিয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্ণয় করা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য।

§ ৩। বাঙ্গালা ভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির (এবং হ-কারের) অবস্থান আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের যথাযথ উচ্চারণ-বিষয়ে সমগ্র বঙ্গদেশ (অর্থাৎ রাঢ়, বরেন্দ্র বঙ্গ) এক নহে। এই বর্ণগুলির দুই প্রকারের উচ্চারণের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। এক প্রকারের উচ্চারণ পশ্চিম-বঙ্গে (‘গৌড়দেশে’) শোনা যায়, অন্য প্রকারের উচ্চারণ পূর্ব্ব-বঙ্গে (‘বঙ্গদেশে’) মিলে। উত্তর-বঙ্গে (বরেন্দ্র-ভূমিতে ও কামরূপে) পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রভাব আজ কাল সমধিক, কিন্তু উচ্চারণ বিষয়ে এক সময়ে উত্তর-বঙ্গ রাঢ়ের সহিত সমান ছিল বলিয়া অনুমান হয়। আমরা গৌড় ও বঙ্গ—এই দুই প্রদেশের বিশিষ্ট উচ্চারণ আলোচনা করিব।

§ ৪। গৌড়ের মহাপ্রাণ বর্ণগুলির উচ্চারণ সম্বন্ধে বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিছু বলিব না, অন্যত্র এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। গৌড়ে হ-কারের উচ্চারণ বলবৎ আছে—ঘোষবৎ হ আমরা যথা যথা উচ্চারণ করিয়া থাকি; শব্দের আদিতে, যেমন—হয়, হাত, হিত, হে, হোম, হুকুম, হৌজ ইত্যাদি; শব্দের মধ্যে ঘোষবৎ হ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং সাধারণতঃ কথিত ভাষায় লুপ্ত হয়: যথা, ফলাহার > ফলাআর > ফলার, পুরোহিত > পুরোইত্ > পুরুইত্ > পুরুত্, বাহাত্তর > বাআত্তর, পঁহুছা > পৌঁছা, বহু > বহু

>বৌ, মহু>মৌ, সহি>সৈ, দহি>দৈ ইত্যাদি। শব্দের অন্তে ঘোষবৎ হ গৌড়ে পাওয়া যায় না—লুপ্ত হয়; অথবা শেষে স্বরবর্ণ আনা হয়, এবং এই স্বরবর্ণের আশ্রয় পাইয়া হ অবস্থান করে; যেমন—সাধু>সাহু>সাহ>সাহ্>সা, বা সাহা; ফারসী শাহ্>শা, শাহা; অষ্টাদশ> অট্‌ঠারহ—হিন্দী অঠারহ্, বাঙ্গালা আঠারো; ইত্যাদি। অঘোষ হ—অর্থাৎ বিসর্গ—গৌড়ের ভাষায় কেবল শব্দের অন্তে শোনা যায়, হর্ষ-বিস্ময়াদি-বাচক অব্যয় শব্দে : যেমন —আঃ, এঃ, ইঃ, ওঃ ইত্যাদি; আবার এই ধ্বনি, আশ্রিত স্বরধ্বনির প্রকৃতি অনুসারে, বিকল্পে বিভিন্ন উষ্ম ধ্বনিতে-ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে: আখ্, এশ্, ইশ্, ওফ্ ইত্যাদি। স্পর্শ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির মধ্যে, ফ ভ সাধারণতঃ ওষ্ঠ্য উষ্ম ধ্বনিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে : ফল=[phɔl] না হইয়া [ɸɔl], বা [fɔl]; প্রফুল্ল=[prɔphullɔ] স্থানে [proɸullo, profullo]; ভয়=[bhɔĕ] স্থলে [βɔĕ], উভয়= [ubɦɔĕ] স্থলে [uβɔĕ] বা [uvɔĕ]; অভিভাবক=[obɦibɦabɔk] স্থলে [oβiβɜbok, ovivabok]; লাভ=[labh] না হইয়া [laβ, lav]. ফ ভ ভিন্ন অন্য মহাপ্রাণ বর্ণ (খ ঘ, ছ ঝ, ঠ ঢ, থ ধ) শব্দের আদিতে অবিকৃত থাকে, এগুলি এইরূপ অবস্থায় স্পষ্ট উচ্চারিত হইয়া থাকে—মহাপ্রাণের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ অল্পপ্রাণ স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে অঘোষ বা ঘোষবৎ হ-কারের উচ্চারণ, এখানে পুরাপুরি বিদ্যমান আছে। যেমন—খায়, ক্ষতি (=খেতি), খাঁ, ঘা, ঘুম, ঘ্রাণ, ছয়, ছানা, ঝাউ, ঝড়, ঝাঁক, ঠাকুর, ঠিকা, ঢাক, ঢোল, থালা, থ'লে, ধান, ধর্ম্ম, ধ্রুব, ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের অন্তে এই মহাপ্রাণগুলি আসিলে, বা শব্দের মধ্যে অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্ব্বে আসিলে, ইহাদের প্রাণ-অংশটুকু, অর্থাৎ আনুষঙ্গিক হ-কার (অঘোষ বা ঘোষবৎ), আর উচ্চারিত হয় না, কেবল অল্পপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনিই শোনা যায়; এক কথায়, এই অবস্থায় উচ্চারণে ইহারা অল্পপ্রাণ বর্ণেই পরিবর্ত্তিত হয় : যথা—মুখ=মুক্, রাখ= রাক্, রাখিতে>রাখ্‌তে=রাক্‌তে, দেখিতে>>দেখ্‌তে=দেক্তে, বাঘ=বাগ্, বাঘকে=বাগ্‌কে, =বাক্‌কে, মাছ=মাচ্, মাছটা=মাচ্‌টা, সাঁঝ=সাঁজ্, সাঁঝ-সকাল=সাঁজ্‌-সকাল, কাঠ=কাট্, ষাঠি>ষাট, অষ্ট>অট্‌ঠ>আঠ>আট, রাঢ়>রাড়—(ড ঢ শব্দের মাঝখানে বা শেষে থাকিলে ড় ঢ় হইয়া যায়), হাথ>হাত্, পথ=পত্, বাঁধ=বাঁদ্, সাধিতে=সাধ্‌তে=সাদ্‌তে> সাৎতে, ইত্যাদি। শব্দের অভ্যন্তরে দুই স্বরধ্বনির মধ্যে অবস্থান করিলে গৌড়ে অনেক স্থলে, বিশেষতঃ রাঢ়ে, মহাপ্রাণ বর্ণগুলি রক্ষিত হয়; কিন্তু ভাগীরথীর দুই ধারের দেশে, ভদ্র চলিত ভাষায়, এক্ষেত্রে-ও মহাপ্রাণ বর্ণ শোনা যায় না। অঘোষ মহাপ্রাণ হইলে শব্দের অভ্যন্তরে উচ্চারিত হইতে পারে, কিন্তু অতি মৃদুভাবে, মোটেই জোর দিয়া নহে; যেমন—

দেখা, মিছা=মিছে, কাঠা, কথা—সাধারণতঃ ইহাদের উচ্চারণ করা হয় 'দ্যাকা, মিচে, কাটা, কতা', তবে 'দ্যাখা, মিছে, কাঠা, কথা'ও অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু ঘোষবৎ মহাপ্রাণ সাধারণতঃ পুরাপুরি বা বিশুদ্ধভাবে শোনা যায় না: যেমন—বাঘের, বাঘা; যদি কেহ কলিকাতা অঞ্চলে 'বাগ্‌হের, বাগ্‌হা' বলে, তাহা হইলে লোকে 'রেঢ়ো টান' ধরিয়া ফেলিবে—'বাগের, বাগা'—এইরূপ অল্পপ্রাণ উচ্চারণই স্বাভাবিক। তদ্রূপ বাঁঝা=বাঁজা, মাঝুয়া>মেজো, দৃঢ়=দ্রিঢ়ো, বাধা=বাদা, বাঁধা=বাঁদা।

গৌড় বা পশ্চিম-বঙ্গ সম্বন্ধে অতএব বলা যায়—

১। হ-কার এবং মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি শব্দের আদিতে সুস্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত হয়। শব্দের অভ্যন্তরে বা অন্তে হ-কারের লোপ এবং মহাপ্রাণের অল্পপ্রাণে আনয়নই সাধারণ, তবে ক্বচিৎ বিকল্পে অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হইতে পারে। (সাধুভাষার পাঠে, বা সজ্ঞান ও সচেষ্ট সাধুভাষানুমোদিত উচ্চারণে অবশ্য হ বা ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারিত হইতে পারে)।

২। অঘোষ হ—বিসর্গ—শব্দের অন্তে শোনা যায়, এবং এই অঘোষ হ-ই অঘোষ মহাপ্রাণে—খ ছ ঠ থ ফ-এ—মেলে।

এতদ্ভিন্ন, ন(ণ), ম, র, ল—উচ্চারণে ইহাদের পরে হ-কার আসিলে, এই হ-কারকেও সাধারণতঃ বর্জ্জন করা হয়—যেখানে সচেষ্ট উচ্চারণ করা হয়, সে অবস্থা ছাড়া: যথা—চিহ্ন=চিন্নো, মধ্যাহ্ন=মোদ্দান্ন, অপরাহ্ণ=অপোরান্ন, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্‌মণ > ব্রাম্‌হণ্‌= ব্রাম্মোন, ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্‌ম > ব্রাম্‌হ=ব্রাম্মো, গর্হিত=গোর্‌রিৎ, গোরিৎ, আহ্লাদ অর্থাৎ আহ্‌লাদ > আল্‌হাদ=আল্লাদ, প্রহ্লাদ অর্থাৎ প্রহ্‌লাদ > প্রল্‌হাদ=প্রোল্লাদ্‌, প্রেল্লাদ্‌, পেল্লাদ্‌, ইত্যাদি।

গৌড়ের ভাষা পশ্চিমের হিন্দীর সহিত তুলিত হইলে দেখা যায় যে, হিন্দী এ বিষয়ে গৌড়ের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর রক্ষণশীল। হিন্দীতে সব ক্ষেত্রেই—কি আদিতে কি মধ্যে, কি অন্তে—হ-কার এবং মহাপ্রাণ ধ্বনি অটুট থাকে।

§ ৫। এক্ষণে বঙ্গের অর্থাৎ পূর্ব্ব-বঙ্গের চলিত ভাষায় এই ধ্বনিগুলির যে উচ্চারণ শোনা যায়, তাহার আলোচনা করা যাউক। পশ্চিম-বঙ্গের সাধারণ অধিবাসীর ধারণা এই যে, পূর্ব্ববঙ্গ-বাসিগণ হ উচ্চারণ করিতে পারে না, এবং ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণগুলিকে অল্পপ্রাণ করিয়াই উচ্চারণ করে—ঘ ঝ ঢ ধ ভ-কে গ জ ড দ ব বলিয়া থাকে। চ-বর্গীয় বর্ণগুলির দন্ত্য উচ্চারণ—অর্থাৎ c, ch, j, jh স্থলে ts, s, dz বা z; এবং ড় ঢ় স্থলে র; এইগুলির, ও ঘোষ

মহাপ্রাণের অল্পপ্রাণ উচ্চারণ; তথা হ-কারের লোপ; এই সমস্ত পূর্ব্ব-বঙ্গের ভাষার বৈশিষ্ট্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই মহাপ্রাণগুলিকে যে কেবল মাত্র অল্পপ্রাণ করিয়া লওয়া হয় না, ও হ-কারের লোপ-সাধন মাত্র হয় না, ইহা প্রত্যেক পূর্ব্ববঙ্গ-বাসী জানেন। আসল কথা এই—কণ্ঠনালীতে জাত উষ্ম ধ্বনি হ-কারের পরিবর্ত্তে অন্য একটি ধ্বনি পূর্ব্ব-বঙ্গে ব্যবহৃত হয়, এবং মহাপ্রাণ বর্ণে অবস্থিত অঘোষ বা ঘোষ উষ্মা বা প্রাণ অর্থাৎ বা শ্বাসবায়ু বা হ-কারের স্থানে এই নবীন ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনিটি হইতেছে, কণ্ঠনালীর মুখে অবস্থিত মুখদ্বার স্বরূপ পেশীগুলির স্পর্শ ও ঝটিতি বিচ্ছেদের ফলে জাত এক প্রকার স্পর্শ ধ্বনি—glottal stop বা 'কণ্ঠনালীয় স্পর্শধ্বনি'।

কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়া নিঃশ্বাসবায়ু যখন বহির্গত হয়, তখন তাহা কোথাও বাধা প্রাপ্ত না হইলে, স্বরধ্বনির উৎপত্তি হয়। মুখ-মধ্যে নির্গমন-পথ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলে, মুখ-বিবরের সঙ্কোচ-স্থানের অবস্থান অনুসারে বিভিন্ন উষ্ম ধ্বনির উদ্ভব হয়। মুখ-বিবরের অভ্যন্তর-স্থিত বায়ু-নির্গমন পথকে জিহ্বার দ্বারা পূর্ণ ভাবে বা আংশিক ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া দিতে পারা যায়। আংশিক ভাবে অবরুদ্ধ করিলে, বায়ু যখন জিহ্বার দুই পার্শ্বস্থিত উন্মুক্ত স্থান দিয়া নির্গত হয়, তখন ল-কারের ধ্বনির উদ্ভব হয়। জিহ্বাকে মুখের ঊর্দ্ধভাগে স্পর্শ করাইয়া মুখপথকে সম্পূর্ণ ভাবে বদ্ধ করা যায়, এবং অধরৌষ্ঠকে মিলিত করিয়া-ও মুখ বদ্ধ করিয়াও করা যায়; নির্গমনশীল বায়ু রোধস্থানে আসিয়া জমে, এবং জিহ্বাকে ঝটিতি নামাইয়া লইলে, বা অধরৌষ্ঠকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, রুদ্ধ বায়ু হঠাৎ দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া সবেগে বহির্গত হইবার চেষ্টা করে, তখন একটা explosion বা ফট্-কার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। ফলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ গ্ চ্ জ্ ট্ ড্ ত্ দ্ প্ ব্ প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী স্পর্শ ধ্বনি শ্রুত হয়। কিন্তু মুখপথ রুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে নাসা-পথ উন্মুক্ত থাকিলে, রোধের অবস্থান অনুসারে নাসিক্য ধ্বনি ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্-এর উৎপত্তি হয়। স্পর্শধ্বনির উদ্ভবে জিহ্বা এবং অন্য বাগ্‌যন্ত্রের পূর্ণ স্পর্শ, এবং মুখপথের রোধ আবশ্যক। মুখ-বিবরে জিহ্বা-দ্বারা বা মুখদ্বারে (অধরৌষ্ঠের সহায়তায়) যেরূপ রোধ হয়, তদ্রূপ রোধ কণ্ঠনালীর ভিতরেও হইয়া থাকে; এবং এই রোধ বা স্পর্শের ফলে সেখানে যে স্পর্শধ্বনির উদ্ভব হয়, তাহা বহু ভাষায়, ক, গ, ত, দ, প, ব-এর মত একটি বিশিষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চলিত বাঙ্গালায়—গৌড়ের ভাষায়ও—ইহা দুর্লভ নহে। কাশিবার সময়ে, যখন কণ্ঠনালীপথের পেশীদ্বারা নালীপথের দ্রুত রোধ ও উন্মোচন ঘটে,

তখন আমরা সকলেই এই কণ্ঠনালীর স্পর্শ ধ্বনি উচ্চারণ করি। এই ধ্বনির জন্য ইউরোপীয় ধ্বনিতত্ত্ববিদ্‌গণ ['] বা [ʔ] এইরূপ একটি অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা বাঙ্গালায় ['] (উদ্ধার-চিহ্ন) অথবা [̔] (ইলেক-চিহ্ন) ব্যবহার করিতে পারি। এই ধ্বনির জন্য অক্ষরটি থাকিলে, সাধারণ কাশির ধ্বনি যাহা আমরা কানে শুনি, তাহাকে বানান করিয়া লেখা যায়—[ʔahhə ʔaɦə] ='আঃহ্যা 'আহা। এই ধ্বনি 'হাম্‌জা' নামে আরবীর একটি বিশিষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনি বলিয়া স্বীকৃত: যেমন—ra's, sā'il, ta'ammul, qur'an, ma'ata, mā' ইত্যাদি। জারমান ভাষায় শব্দের আদিতে এই ধ্বনি খুবই পাওয়া যায়—জারমানে যেখানে কোনও শব্দের প্রারম্ভে অন্য কোনও ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকে না, তখন সেখানে এই কণ্ঠনালীয় স্পর্শধ্বনি আসে—জারমান ভাষায় স্বরাদি শব্দ নাই : যেমন—auch, Abend, echt, Ihre, Ehe, und, Uhr, Onkel, Oh!, Oesterreich ইত্যাদি।

পূর্ব্ব-বঙ্গে হ-কারের বদলে যে এই ধ্বনিই ব্যবহৃত হয়, হ-কারের লোপ হয় না, ইহা একটু কান পাতিয়া শুনিলেই গৌড়িয়া লোকও বুঝিতে পারিবেন। যথা—হাইল='আইল্; হয়='অয়; হাত='আত; হাতী='আতী, 'আত্তী; হাঁটিয়া='আইট্যা; হিন্দু='ইন্দু; হুঁকা='উকা, 'উক্কা; হানি='আনি; ইত্যাদি।

§ ৬। মহাপ্রাণ স্পর্শ বর্ণগুলির উচ্চারণ লইয়া পূর্ব্ব-বঙ্গে সর্ব্বত্র ঐক্য নাই। তবে সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, মহাপ্রাণ বর্ণ ঘোষবৎ হইলে, ইহার সঙ্গেকার হ-অংশকে কণ্ঠনালীয় স্পর্শতে পরিবর্তিত করা বঙ্গের (অর্থাৎ পূর্ব্ব-বঙ্গের) প্রাচীন ভাষার রীতি ছিল, এবং এই রীতি এখনও সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। যথা—ঘা অর্থাৎ গ্‌হা স্থলে গ্'া; ঢাক্ অর্থাৎ ড্‌হাক স্থলে ড্'াক্; ধান অর্থাৎ দ্‌হান্ স্থলে দ্'ান্; ভাত অর্থাৎ ব্‌হাৎ স্থলে ব্'াৎ; মধ্য অর্থাৎ মদ্‌ধ্য=মদ্‌ধিয়=মদ্‌-দ্‌হিয়, স্থলে মইদ্‌দ্‌হিয়, তাহা হইতে মইদ্‌দ্'অ, ম্'অইদ্দ; আঘাত অর্থাৎ আগ্‌হাৎ স্থলে আগ্'াৎ; ইত্যাদি।

কিন্তু অঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শ, শব্দের আদিতে অবস্থানে মহাপ্রাণরূপেই উচ্চারিত হইত—যথা—খাওয়া; ঠাকুর; থোয়; ফল। শব্দের মধ্যে অবস্থানে খ, ঠ, থ, ফ কোনও স্থলে মহাপ্রাণ-রূপেই রক্ষিত হইয়া আছে,—যেমন পাখা, আঠা, কথা,—কিন্তু কুত্রাপি এই আভ্যন্তর অবস্থানে এগুলিরও কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ-মিশ্রিত হইয়া যাইবার প্রমাণ আছে।

§ ৭। স্পর্শবর্ণ বা অন্য কোনও বর্ণ এইরূপে কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনির সহিত সংযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হইলে, বাঙ্গালায় তাহার কি নাম দেওয়া যাইবে? ইংরেজিতে ইহাদের নামকরণ করিয়াছে Implosive বা Recursive, বা Consonants with Glottal Closure, বা Consonants

with accompanying Glottal Closure. Implosive-এর বাঙ্গালা করা যাইতে পারে 'অভ্যন্তর-স্পৃষ্ট', Recursive-এর 'পুনরাবৃত্ত', এবং শেষোক্ত ব্যাখ্যাত্মক অভিধার বাঙ্গালা হইতে পারে 'কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ-মিশ্র' বা 'কণ্ঠনালীয় স্পর্শানুগত'। প্রথম ও তৃতীয় নাম দুইটিই শ্রুতমাত্রেই এই প্রকার ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করিয়া দেয়। এই দুইটি নাম আমরা আপাততঃ ব্যবহার করিতে পারি।

§ ৮। পূর্ব্ব-বঙ্গের ভাষায় মহাপ্রাণ-ধ্বনির আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনি-পরিবর্ত্তনের আলোচনা একটু আবশ্যক হইবে :—

ক। দুই স্বরের মধ্যস্থিত ক, অঘোষ উষ্ম কণ্ঠ্য-ধ্বনিতে—জিহ্বামূলীয় বিসর্গের ধ্বনিতে—পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; যথা—ঢাকা = ড্'খ.া। আবার এই অঘোষ খ. ঘোষবৎ ঘ.-এতেও পরিণত হয়। এবং কচিৎ এই ঘ. আবার হ-কাররূপে দৃষ্ট হয়।

খ। চ, ছ, জ যথাক্রমে [ts, s, dz] হয়।

গ। দুই স্বরের মধ্যস্থিত ট ঘোষ ড-এ পরিণত হয়; এই ড কখনও ড়-কার হইয়া যায় না।

ঘ। দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গে—চট্টলে, ত্রিপুরায়—আদ্য ত-কার, থ-কার-ভাব প্রাপ্ত হয়।

ঙ। চট্টল, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টে স্পর্শ প-কার, উষ্ম ফ. অর্থাৎ উপাধ্মানীয় বিসর্গতে পরিবর্ত্তিত হয়। ময়মনসিংহ ও বরিশালের বাঙ্গালায়ও আদ্য প-কারের এইরূপ উচ্চারণ শুনিয়াছি।

চ। আদ্য ও স্বরবেষ্টিত শ, ষ, স,—হ-কার হইয়া যায়। ইহাই হইল পূর্ব্ব-বঙ্গের ভাষার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাধুভাষার প্রভাবে বহুস্থলে শ-এর ধ্বনি পুনরায় আনীত হয়।

§ ৯। পূর্ব্ব-বঙ্গের ভাষায়, শব্দের আদিতে অঘোষ মহাপ্রাণ অবিকৃত থাকে; ঘোষ মহাপ্রাণ, ঘোষবৎ কণ্ঠনালীয়-স্পৃষ্ট-মিশ্র অল্পপ্রাণ হইয়া যায়; এবং হ-কার কণ্ঠনালীয় স্পর্শধ্বনিতে পরিবর্ত্তিত হয়।

শব্দের মধ্যে যদি মহাপ্রাণ ধ্বনি বা হ-কার থাকে, তাহা হইলে সেই মহাপ্রাণ ও হ-কারের স্থলে প্রথমতঃ যথাক্রমে কণ্ঠনালীয়-স্পৃষ্ট-মিশ্র অল্পপ্রাণ এবং কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনি আইসে; এবং পরে, এই অল্পপ্রাণের সহিত যুক্ত কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট-ধ্বনি, বা হ-কারজাত শুদ্ধ কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্টধ্বনি, নিজ স্থান পরিত্যাগ করিয়া শব্দের আদ্য অক্ষরে আসিয়া উচ্চারিত হয়। আদ্য অক্ষরে প্রথমধ্বনি স্বরবর্ণ থাকিলে সেই স্বরবর্ণের পূর্ব্বে বসে, এবং ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে ঐ ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত মিলিত হইয়া নূতন আভ্যন্তর-স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের সৃষ্টি করে। নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলি হইতে বিষয়টি বোধগম্য হইবে।

পাখা = পাক্‌হা > পাক্'া = প্'াকা, ফ.'াকা; দুঃখ = দুক্‌খ = দুক্-ক্‌হ = দুক্-ক্'অ = দ্'উক্‌ক;

পুথি = পুৎ'ই = প'উতি; কথা = কত'আ = ক্'অতা; কথ-বেল = ক্'অদ্-বেল; মেথর = মেত্'অর্ = ম্'এতর্; চিঠি = চিট্'ই = চ'ইডি [ts'iḍi]; কাঁঠাল = কাট্'আল = ক্'আডাল; পাঁঠা = পাট্'আ = প'আডা, ফ্'আডা; উডন = উট্'অন = 'উডন; লাঠি = লাট্'ই = ল্'াডি; তথ্তা = তক্'তা = ত'অক্তা ইত্যাদি।

তদ্রূপ,—অন্ধ > অন্দ্'অ > 'অন্দ; অধ্যক্ষ > অইদ্'দ্'অক্ক, = 'অইদ্দক্ক; আভ = আব্' = 'আব্; আধা = আদ্'আ = 'আদা; কাঁধ = কান্দ্' = ক্'ান্দ্; বাঘ = বাগ্' = ব্'াগ (ভাগ = ব্'াগ); গাধা = গাদ্'া = গ্'াদা; বুদ্ধি = ব্'উদ্দি; দীঘী = দি'গি; জিহ্বা = জিব্ভা = জি'ব্বা, জে'ব্বা (জ = dz); দুধ = দ্'উদ্; মেঘ = ম্'এগ্; লাভ = = ল্'াব; সভা = স্'অবা; সাঁঝ = স্'ান্জ [s'andz]; প্রাচীন বাঙ্গলা দেঢ় = দেড়্' = দ্'এড়্।

ডাহিন > ডাহিন = ড্'াইন; তহবিল = ত্'অবিল; ডাহুক = ড্'াউক; বহিন = ব্'অইন্; বাহির = ব্'াইর; শহর = শ্'অঅর, শ্'অর; মহল = ম্'অঅল; সাহস = শ্'াওশ্; বাহুল্য = ব্'াউইল্ল; সন্দেহ = স্'অন্দেঅ; ইত্যাদি।

হ-কারের বা মহাপ্রাণের উষ্ম অংশের বিকারে জাত কণ্ঠনালীয়-স্পৃষ্ট-ধ্বনিকে শব্দের আদিতে এইরূপে আগাইয়া দেওয়া, পূর্ব্ব-বঙ্গের কথিত ভাষার একটি আশ্চর্য্য বা লক্ষণীয় রীতি।

§ ১০। পূর্ব্ব-বঙ্গের ভাষায়, মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের প্রাণ বা উষ্মার পরিবর্ত্তে কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট বর্ণের আগমনের ফলে, সংস্কৃতে অজ্ঞাত, নূতন কতকগুলি কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট-মিশ্র বা আভ্যন্তর-স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণের উদ্ভব ঘটিয়াছে : যথা—ক' গ', চ' (= ts'), জ' (= dz'), ট', ড', ত', দ', ন', প', ব', ম', র', ল', শ'। এগুলি সাধারণ ক গ চ (ts) জ (dz) ট ড ত দ ন প ব ম র ল শ হইতে পৃথক, এবং ইহাদের যথাযথ উচ্চারণেব উপর পূর্ব্ব-বঙ্গের ভাষায় শব্দের অর্থ নির্ভর করে।—যথা—

কাঁদ্	=	কান্দ্,	কিন্তু	ক'ান্দ্ (ক্'আন্দ্) =	কাঁধ;
গা	=	দেহ,	কিন্তু	গ'া (গ্'আ) =	ঘা;
গুরা	=	গোরা,	কিন্তু	গু'রা (গ্'উরা) =	ঘোড়া;
জর	=	জ্বর,	কিন্তু	জ'র (জ্'অর) =	ঝড় (জ = dz);
ডাইন	=	ডাকিনী,	কিন্তু	ড'াইন (ড্'আইন) =	ডাইন = দক্ষিণ;
তারা	=	নক্ষত্র,		ত'ারা (ত্'আরা) =	তাহারা (সাধু ভাষার);
দান	=	দান,		দ'ান (দ্'আন) =	ধান;

পাকা = পক্ক, প'াকা (প্'আকা) = পাখা ;
বাত = বাত-ব্যাধি, ব'াত (ব্'আত্) = ভাত ;
মৈদ্দ = মদ্য, মৈ'দ্দ (ম্'অইদ্দ) = মধ্য ;
আইল্ = ক্ষেত্রের আলি, 'আইল্ = নৌকার হাইল ; ইত্যাদি।

§ ১১। মহাপ্রাণ বর্ণের বা হ-কারের বিকারে পূর্ব্ব-বঙ্গের ভাষায় যেখানে কণ্ঠনালীয়-স্পৃষ্টধ্বনি মিশ্র ব্যঞ্জন বর্ণ বা কণ্ঠনালীয় স্পর্শ আইসে, সেখানে সংশ্লিষ্ট অক্ষরে স্বরাঘাত ঘটে, এবং স্বরও উদাত্তে উঠে। ইহা একটি বিশেষ নিয়ম। যথা—তার গা'অৎ [বা 'ক'ান্দে] 'গ'া 'ঐছে বলি হেতে কান্দে (=তার গায়ে বা কাঁধে ঘা হয়েছে ব'লে সে কাঁদে) ; পরা=পড়া, পতন, কিন্তু পঢ়া > 'প'রা=পাঠ করা। ইত্যাদি।

§ ১২। এইরূপ উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালাদেশে—পূর্ব্ব-বঙ্গে—কত দিন হইল আসিয়াছে? এ বিষয়ে কেহ প্রাচীন উচ্চারণ লক্ষ্য করেন নাই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের, এমন কি শ্রীচৈতন্যদেবের সময়েও পূর্ব্ব-বঙ্গের উচ্চারণ গৌড়িয়া লোকের কাছা তামাসার বিষয় ছিল। কবিকঙ্কণের সময়ে পূর্ব্ব-বঙ্গে শ-স্থলে হ বলিত—শুকুতা=হুকুতা; অনুমান হয়, মূল হ-কার কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-বর্ণে পরিণত না হইলে, শ-কার নূতন করিয়া হ-কার হইত না; অন্যথা মূল হ-কার এবং শ-জাত নবীন হ-কার লইয়া ভাষার ধ্বনি বিষয়ে অনিশ্চিততা এবং দুর্বোধ্যতা আসিয়া যাইত। হ-কারের কণ্ঠনালীয় স্পর্শে পরিণতি স্বীকার করিলে, মহাপ্রাণগুলির পরিবর্ত্তনও স্বীকার করিতে হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে পূর্ব্ব-বঙ্গের ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক হইবে না।

এই বৈশিষ্ট্য সম্ভবতঃ আরও প্রাচীন, এবং হয় তো পূর্ব্ব-বঙ্গে আর্য্য ভাষার প্রচারের সময় হইতেই ভাষায় এইরূপ উচ্চারণ-রীতি প্রবেশ করিয়াছে। ভোটগণ (বা তিব্বতীরা) কাশ্মীর-অঞ্চল হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রথমে গ্রহণ করে, কিন্তু বাঙ্গালা-দেশের সঙ্গে তিব্বতীদের পরে ঘনিষ্ট যোগ হয়—বাঙ্গালাদেশের শিক্ষকদের তিব্বতীরা মানিয়া লয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের একখানি প্রাচীন তিব্বতী পুঁথিতে কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র উদ্ধৃত আছে, সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ তিব্বতী অক্ষরে লিখিত আছে; এই পুথিতে যেরূপ বর্ণবিন্যাস আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ-র গ' জ' ড' দ' ব' উচ্চারণই যেন তখন তিব্বতীরা শিখিয়াছিল,—পুঁথিখানিতে পরবর্ত্তী কালের মত এই মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিকে তিব্বতী অক্ষরে $\frac{গ}{হ}$ $\frac{জ}{হ}$ $\frac{ড}{হ}$ $\frac{দ}{হ}$ $\frac{ব}{হ}$ রূপে লিখিবার প্রয়াস করা হয় নাই, অন্য উপায়ে অবলম্বিত

হইয়াছে (Joseph Hackin—Formulaire Sanskrit-Tibétain du Xe siècle, Paris, 1924)। এ কোথাকার উচ্চারণ? বাঙ্গালার অংশ-বিশেষেরই উচ্চারণ বলিয়া মনে হয়। কারণ অন্য কতকগুলি সংস্কৃত অক্ষরের উচ্চারণ যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহার দ্বারা বাঙ্গালা-দেশেরই বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়।—যথা—ঋ=রি, অন্তস্থ ব-এর স্থলে বর্গীয় ব পড়া, এবং ক্ষ-র উচ্চারণ 'খ্য' রূপে লেখা।

সুতরাং, মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের ঈদৃশ অ-সংস্কৃত উচ্চারণ সুপ্রাচীন যুগেই বাঙ্গালা ভাষার মাতা বা মাতামহী স্থানীয়া প্রাকৃতে আসিয়া থাকা অসম্ভব নহে।

§ ১৩। পূর্ব্ব-বঙ্গের উচ্চারণের সহিত এই বিষয়ে আশ্চর্য্য মিল পাওয়া যায় ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের অনেকগুলি আধুনিক আর্য্য-ভাষায়—গুজরাটীতে, রাজস্থানীতে, দখ্‌নী হিন্দুস্থানীতে এবং কতকগুলি পাহাড়ী ভাষায়। এবং § ১১-তে উল্লিখিত হ-কারের পরিবর্ত্তনজাত কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-বর্ণের সহযোগে স্বরের যে উদাত্ত ভাব পূর্ব্ব-বঙ্গে পাওয়া যায়, তদনুরূপ ব্যাপার পাঞ্জাবীতেও মেলে। এই সমস্ত বিষয় অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন আর্য্য ভাষায় এই প্রকারের সাদৃশ্য কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ রূপে স্বাধীন ভাবে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়।

মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের এইরূপ বিপর্য্যয় বা বিকার আধুনিক আর্য্য ভাষায় একটি লক্ষণীয় বিষয়; এবং এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুরাষ্ট্রনীতিতে ষড়্‌গুণের প্রয়োগ

বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়ে সুবিধার জন্য হিন্দু রাজনীতিশাস্ত্রকারগণ বারটি রাজ্য লইয়া এক রাজমণ্ডলের কল্পনা করিয়াছেন। এই মণ্ডলবর্ত্তী রাজ্যগুলির অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য ও বিশদ পরিচয় অন্যত্র বিবৃত করিয়াছি।[১] এই সকল রাজ্যের অধিপতিগণ স্ব স্ব রাজ্যের মঙ্গলার্থ পরস্পরের উদ্দেশ্যে যে ছয়প্রকার নীতি প্রয়োগ করিতে পারেন বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই রাষ্ট্রনৈতিক ষড়্‌গুণ। এই ষড়্‌গুণ—সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব—বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। রাজ্যের উপকারক বলিয়া ইহাদিগের নাম 'গুণ'।[২]

কোনরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নাম সন্ধি।[৩] ইহা সাধারণতঃ দ্বিবিধ। যুদ্ধ-বিরতির জন্য বিবদমান পক্ষের মধ্যে যে সর্ত্ত হয়, তাহা সন্ধি (treaty of peace); আবার পরস্পর অবিরোধী দুই পক্ষের মধ্যে উভয়ের অনুকূল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে চুক্তি হয়, তাহাও সন্ধি (alliance)[৪]। 'প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ' নামক গ্রন্থে সন্ধির স্বরূপ ও নানাবিধ ভেদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বিগ্রহ

বিগ্রহের সাধারণ লক্ষণ—"অপকারো বিগ্রহঃ"।[৫] ইহা দুই অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে। অস্ত্রচালনার পূর্ব্বে যুদ্ধ ঘোষণা দ্বারা বৈরভাব প্রকাশের নাম 'বিগ্রহ', আবার প্রকৃত যুদ্ধক্রিয়াও 'বিগ্রহ'। প্রথম অর্থটি 'বিগৃহ্যাসন' শব্দ বিশ্লেষণ করিলেই পরিস্ফুট হইবে। কারণ, শত্রুতা ঘোষণার পর (বিগৃহ্য) শত্রুর প্রতি বাহ্যতঃ নিষ্ক্রিয় আচরণের নাম 'বিগৃহ্যাসন'। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থেই সচরাচর শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

---

১ প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ, পৃ ১-১২।

২ গুণা রাজ্যোপকারকাঃ—অমরকোষ, ক্ষীরস্বামি-কৃত টীকা, ২, ক্ষত্রিয় বর্গ, ১৮।

৩ পণবন্ধঃ সন্ধিঃ—অর্থশাস্ত্র, ৭।১।

৪ সন্ধয়ো দ্বিবিধঃ অনভিযোক্তা অভিযোক্তা চ।—শঙ্করার্য্য-কৃত কামন্দকীয় নীতিসারের টীকা ১৪।২ (ত্রিবেন্দ্রাম সংস্করণ, পৃ ১২৪)।

৫ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ৭।১, পৃ ২৬৩; কামন্দকীয় নীতিসার, ১০।১ এবং নীতিবাক্যামৃত, ষাড়্‌গুণ্যসমুদ্দেশ ৪৪ দ্রষ্টব্য।

আসন

রীতিমত শত্রুতা ঘোষণার পর বাহ্যতঃ শান্ত ও নিষ্ক্রিয় ভাব প্রদর্শনকে 'আসন' বলা হয়। যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষায় বসিয়া থাকাকে যে 'আসন' বলা চলে না, তাহা কামন্দকীয় নীতিসারের উক্তি হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। ঐ গ্রন্থের মতে 'আসন' 'বিগ্রহের'ই রূপান্তর মাত্র।[৬]

যান

'যানের' অর্থ শত্রুর সম্মুখীন হইবার জন্য যাত্রা করা। যে সময়ে স্বপক্ষ ও বিপক্ষের শক্তি তুলনা করিয়া যুদ্ধ করা সমীচীন মনে হইবে, তাহাই 'যানে'র উপযুক্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।[৭]

সংশ্রয়

প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার আশায় অন্য এক বা একাধিক প্রবলতর রাজার আশ্রয় গ্রহণের নাম 'সংশ্রয়'। এইরূপ আশ্রয়ের বিনিময়ে আশ্রয়দাতা বহুপরিমাণ অর্থাদি দাবী করিতে পারেন এবং আশ্রিতকে অধীনে আনিবার চেষ্টা করিতে পারেন। এই জন্যই নিরুপায় হইলে 'সংশ্রয়'-নীতি অবলম্বন করা উচিত।

যদি দুর্ব্বল রাজা কুত্রাপি আশ্রয় না পাইয়া আক্রমণকারী শত্রুর নিকটেই বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে, তাহার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া থাকে। তখন ধন-রত্ন, স্বর্ণ, ভূমি প্রভৃতি উপঢৌকন দ্বারা শত্রুর সন্তোষ বিধান করিয়া আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হয়। যদি এইরূপ উপহারেও শত্রু নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। এইরূপ আত্মসমর্পণকারী দুর্দ্দশাপন্ন রাজার নাম 'দণ্ডোপনত' এবং যে প্রবল রাজার বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়, তাহার নাম 'দণ্ডোপনায়ী'।

যখন দুইজন প্রবল রাজা একই সময়ে কোন রাজাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তখন উহাদের মধ্যে যে রাজার রাজ্য নিকটবর্ত্তী তাহার সহিত 'সংশ্রয়' অবলম্বন করিবার উপদেশ আছে। অথবা উভয়ের সহিত 'কপাল-সংশ্রয়' করা যাইতে পারে; অর্থাৎ প্রত্যেককেই এই কথা বলিতে হইবে যে, যদি তাহাকে কৃপা প্রদর্শন করা না হয়, তাহা হইলে অন্যের দ্বারা বিনষ্ট হইবে। এই উপায়ে

৬ যানাসনে বিগ্রহস্ত রূপম্—কামন্দকীয়, ১১।৩৫।

৭ গুণাতিশয়যুক্তো যায়াৎ—কৌটিল্য, ৭।১, পৃ ২৬৩।

আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে, মণ্ডলের অন্তর্গত 'মধ্যম', 'উদাসীন' অথবা অন্য কোন প্রবল রাজার কাছে সাহায্য ভিক্ষার জন্য যাইতে হইবে।[৮]

দ্বৈধীভাব

অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানের উক্তি হইতে 'দ্বৈধীভাবে'র অর্থ বুঝা যাইতে পারে। 'দ্বৈধীভাব'— 'সন্ধি' ও 'বিগ্রহ' উভয়ের সম্মিলনের ফল। যখন কেহ একদিকে একজনের সহিত 'সন্ধি' করিয়া বিরোধ নিবারণ করে এবং অন্যদিকে অন্যের সহিত 'বিগ্রহ' করিয়া বিরোধে ব্যাপৃত হয়, তখন 'দ্বৈধীভাবে'র উদ্ভব হইয়াছে, বলা যাইতে পারে।[৯] কখন এই প্রকার পথ অবলম্বন করিতে হইবে? যখন দুই প্রবল রাষ্ট্রের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, তখনই কোন রাষ্ট্র 'দ্বৈধীভাব' অবলম্বন করিতে পারে। সেই অবস্থায় 'দ্বৈধীভাব' অবলম্বনকারী রাষ্ট্রের লাভের সম্ভাবনা কিরূপ, তাহা বিচার করিয়া দেখা দরকার। কামন্দকীয়ের (১১,২৩-২৬) মতে দুই আক্রমণকারী রাজার সহিত কপট আচরণের নাম 'দ্বৈধীভাব'। এই মত অনুসারে বাহ্যতঃ প্রত্যেকের কৃপার উপর নির্ভরের ভাব দেখাইয়া প্রকৃত পক্ষে একজনের সহিত অপরের বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা বা অন্য কোন উপায়ে উভয়ের ক্ষতি করাই দ্বৈধীভাবের উদ্দেশ্য। দুইজন শত্রুর মধ্যে একজন যাহাতে অপরের নিকট আত্ম-সমর্পণের কথা কিছুমাত্র জানিতে না পারে, এরূপ সাবধানে কাজ করিতে হয়। এইরূপ 'দ্বৈধীভাব' কৌটিল্য-বর্ণিত 'দ্বৈধীভাব' হইতে ভিন্নরূপ; কিন্তু কামন্দকীয়ের (১১,২৩-২৬) ভাষ্যকার শঙ্করার্য্য বলেন যে, কৌটিল্যও কামন্দক-বর্ণিত 'দ্বৈধীভাবে'র কথা বলিয়াছেন। যে বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া তিনি এ কথা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

পার্শ্বস্থো বা বলস্থয়োরাসন্নভয়াৎ প্রতিকুর্ব্বীত।
দুর্গাপাশ্রয়ো বা দ্বৈধীভূতস্তিষ্ঠেৎ।
সন্ধিবিগ্রহহেতুভির্বা চেষ্টেত। কৌটিলীয়, ৭.২, পৃ ২৬৭।

কামন্দকীয়ে প্রথম প্রকার 'দ্বৈধীভাবে'র উল্লেখ নাই। শঙ্করার্য্যের ব্যাখ্যা এই যে, ইচ্ছা করিয়াই উহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, 'দ্বৈধীভাবে' 'সন্ধি' ও 'বিগ্রহের' উপাদান থাকাতে এই দুইটি গুণের দ্বারাই উহা সূচিত হইয়াছে; সুতরাং উহার পৃথক্ উল্লেখের আবশ্যকতা হয় নাই; কিন্তু অনুল্লেখের এইরূপ কারণ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সমস্ত গুণাবলীকে শেষ পর্য্যন্ত 'সন্ধি' ও 'বিগ্রহে' পর্য্যবসিত করা যাইতে পারে; তথাপি কামন্দকীয়ে 'দ্বৈধীভাব' ব্যতীত অপর

---

৮ 'সংশ্রয়' সম্বন্ধে কৌটিল্য, ৭।২ দ্রষ্টব্য।

৯ কৌটিল্য, ৭।১, পৃ ২৬৩, ২৬৬।

'গুণ'গুলি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পাঁচটি 'গুণে'র বিশদ আলোচনা করিয়া ষষ্ঠ 'গুণ' সম্বন্ধে নীরব থাকিবার ঐরূপ কোন কারণ থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ একজন শত্রুর সহিত 'সন্ধি' ও অন্যের সহিত 'বিগ্রহ'রূপ 'দ্বৈধীভাবে'র গুরুত্ব উত্তরকালে গৌণ হইয়া পড়িয়াছিল। তখন উহার দ্বিতীয় রূপটি প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকিবে।

মনু-স্মৃতির ৭ম অধ্যায়ের ১৬৭ ও ১৭৩ শ্লোকে 'দ্বৈধীভাব' বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, যখন প্রবল রাজা দুর্ব্বল রাজাকে আক্রমণ করেন, তখন আক্রান্ত রাজা আপনার কতক অংশ সৈন্য পশ্চাতে রাখিয়া অবশিষ্টাংশ শত্রুর সম্মুখীন হইবার জন্য পাঠাইয়া দেন। অগ্নিপুরাণে "বলার্দ্ধেন প্রয়াণম্" অর্থাৎ অর্দ্ধ সৈন্যের সহিত আক্রমণ করিবার উপদেশ আছে।

'দ্বৈধীভাবে' 'সন্ধি' ও 'বিগ্রহের' অঙ্গসমূহ থাকা চাই।[১০] এই উক্তি দ্বারা মনু-স্মৃতি ও অগ্নিপুরাণে বর্ণিত 'দ্বৈধীভাবে'র ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সুতরাং সম্পূর্ণ অর্থ এইরূপ হইবে,—আক্রান্ত রাজা তাঁহার সেনানীর কিয়দংশ শত্রুর সম্মুখীন হইবার জন্য পাঠাইয়া দেন, আর পশ্চাৎ দিক্ রক্ষার্থ ও নূতন সন্ধিবদ্ধ রাজার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য অবশিষ্টাংশের সহিত নিজে থাকেন। কৌটিল্য ও মেধাতিথির উক্তি অনুসারে এই প্রকার ক্রিয়ায় 'দ্বৈধীভাবে'র দুই মূল উপাদান, 'সন্ধি' ও 'বিগ্রহ' বর্ত্তমান থাকে।

বিভিন্ন গুণের উপযোগী অবস্থা-নির্ণয়

কোনও রাজা অন্য রাজার সহিত ব্যবহারকালে কোন অবস্থায় কোন 'গুণে'র বা 'গুণ'দ্বয়ের আশ্রয় লইবেন, তাহা স্থির করিতে হইলে, তাঁহাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে,—

(১) বৃদ্ধি (লাভ),
(২) ক্ষয় (ক্ষতি),
(৩) স্থান (না-লাভ, না-ক্ষতি অর্থাৎ স্থির অবস্থা)।

কোন 'গুণ' অবলম্বনের ফলে রাজা নিজে কিংবা তাঁহার প্রজারা কোন না কোন রকমে লাভবান্ হইলে, ঐ 'গুণ' 'বৃদ্ধি'র অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হয়। এই লাভ নানারূপে ঘটিতে পারে। দুর্গ, সেচকার্য্য, বাণিজ্য-পথ, খনি এবং কাষ্ঠবহুল বা হস্তিবহুল বন অধিক পরিমাণে ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা যায় এবং অনধ্যুষিত দেশে বসতি স্থাপন করার সুযোগ ঘটে। উহাতে শত্রুর ক্ষতি হয়, এবং শত্রু ও শত্রুর প্রজারা নির্ব্বিঘ্নে দুর্গাদি ব্যবহারে অসমর্থ হয়। যখন কোন প্রকার 'গুণ' অবলম্বনের পরিণামে নিজের পক্ষে দুর্গাদি ব্যবহারে বাধা ঘটে এবং শত্রুর পক্ষে সুবিধা হয়, তাহা

---

১০ মনুর মেধাতিথি-কৃত ভাষ্য, ৭।১৬০।

'ক্ষয়'-প্রস্থ 'গুণ'। যখন কোন 'গুণ' আশ্রয়ের ফল লাভ-জনকও নয়, ক্ষতিজনকও নয়, এমন অবস্থা অর্থাৎ 'স্থান' উদ্ভূত হয়, তখন সে 'গুণ' পরিত্যাজ্য।

লাভ ও ক্ষতির পরিমাপ

এমন অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে, যখন শত্রুর 'বৃদ্ধি' কিংবা নিজের 'ক্ষয়' বা 'স্থান' উপেক্ষা করা চলে। যেমন যখন,—

১। (ক) উভয়ের লাভ সমান হয়, কিন্তু নিজের লাভ শত্রু অপেক্ষা পূর্ব্বে হয়;
   (খ) উভয়ের লাভ যুগপৎ হয়, কিন্তু নিজের লাভ শত্রুর অপেক্ষা অধিক হয়;
   (গ) নিজের লাভ বর্ত্তমানে শত্রুর সমান হইলেও ভবিষ্যতে অধিক হইবার আশা থাকে।

২। (ক) উভয়ের ক্ষতি সমান হয়, কিন্তু শত্রুর ক্ষতি পূর্ব্বে হয়;
   (খ) উভয়ের ক্ষতি যুগপৎ হয়, কিন্তু শত্রুর অপেক্ষা অনেকটা কম হয়;
   (গ) নিজের ক্ষতি বর্ত্তমানে শত্রুর সমান হইলেও ভবিষ্যতে বেশি লাভের সম্ভাবনা থাকে।

৩। (ক) নিজের 'স্থান' শত্রুর 'স্থানে'র অপেক্ষা অল্পকাল স্থায়ী হয়;
   (খ) নিজের 'স্থান' উত্তীর্ণ হওয়ার পর যে লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহা পরিশেষে শত্রুর অপেক্ষা অধিক হয়।

যদি কোন রাজার ও তাঁহার শত্রুর 'বৃদ্ধি' বা 'ক্ষয়' যুগপৎ এবং সমান হয়, অথবা যদি তাঁহাদের 'স্থান' যুগপৎ হয় ও ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ দেখা না যায়, তবে তাঁহাদের 'সন্ধি' অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।[১১]

কৌটিল্য সমগ্র রাজ্যের 'বৃদ্ধি', 'ক্ষয়' ও 'স্থান'কে 'শম' (বিঘ্ন-বিঘাতক কর্ম্ম) ও 'ব্যায়ামের' (উদ্যোগ) ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পার্থিব দ্রব্যাদি লাভ (যোগ) ও রক্ষা (ক্ষেম) করিবার জন্য জীবন ও সম্পত্তির নির্ব্বিঘ্নতা অত্যাবশ্যক, উহা 'শম' ও 'ব্যায়াম' দ্বারা সম্ভবপর হয়। এই 'শম' ও 'ব্যায়াম' ষড়্‌গুণের যথাযথ প্রয়োগের উপর নির্ভর করে।[১২]

কখন সন্ধির ফলে বৃদ্ধি হয়?

কি অবস্থায় কোন 'গুণ' অবলম্বন করিলে 'বৃদ্ধি'র সম্ভাবনা, তাহা কৌটিল্য সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। যে যে অবস্থায় 'সন্ধি' 'বৃদ্ধি'র সহায়তা করে, তাহা এই—

---

১১ কৌটিল্য, ৭।১, পৃ ২৬৩।

১২ কৌটিল্য, ৬।২, পৃ ২৫৯, ২৬০।

যখন কোন রাজা মনে করেন,—

(১) স্বকার্য্যের দ্বারা শত্রুর চেষ্টার শুভ ফলসমূহ বিনষ্ট করিতে পারিবেন ;

(২) বিনা বাধায় নানারূপ কল্যাণকর অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে পারিবেন ;

(৩) শত্রুর কার্য্যের শুভ ফলও নিজে ভোগ করিতে পারিবেন ;

(৪) গুপ্তচর দ্বারা অথবা অন্য কোন গুপ্ত উপায়ে শত্রুর কাজ বিনষ্ট করিতে পারিবেন ;

(৫) শত্রুর সহায়তাকারী লোকদিগকে পুরস্কার প্রদান বা খাজানা রেহাই বা মকুফের লোভ দেখাইয়া স্বপক্ষে আনিতে পারিবেন ;

(৬) অপর কোন বিশেষ শক্তিশালী রাষ্ট্রের সহিত সন্ধির ফলে শত্রুর আরব্ধ কার্য্যগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে ;

(৭) শত্রুর সহিত তাহার এক শত্রুর বিরোধিতা দীর্ঘকাল বজায় রাখিতে পারিবেন ও ফলে, শত্রু তাঁহার সাহায্য চাহিতে বাধ্য হইবে ;

(৮) শত্রুর সহিত মিত্রতা করিয়া তাহার দ্বারা অপর শত্রুকে বিপন্ন করিতে পারিবেন ;

(৯) শত্রুর প্রজারা তাহার কোন শত্রুর দ্বারা উৎপীড়িত হওয়ায় স্বপক্ষে আসিবে এবং নিজ কার্য্য সাধনে সহায়তা করিবে ;

(১০) শত্রু কোন বৃহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারিবে না ;

(১১) শত্রুর সহিত সন্ধি করিলে তাহার সহকারী রাজার সহিতও মিত্রতা হইবে এবং তাহার ফলে লাভ হইবে ;

(১২) শত্রুর সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়া শত্রু ও মণ্ডলবর্ত্তী অন্য রাজাদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটাইবার সুযোগ হইবে এবং এইরূপ বিরোধের ফলে, অসহায় শত্রু ক্রমে ক্রমে বশে আসিতে বাধ্য হইবে ; এবং

(১৩) ভয় প্রদর্শন করিয়া অথবা অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়া শত্রুকে মণ্ডলের রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা হইতে বিরত রাখিতে পারিবেন ও এইরূপে তাঁহাদের সংস্পর্শচ্যুত করিয়া মণ্ডলের সাহায্যে তাহাকে ধ্বংস করিতে পারিবেন।[১৩]

বিগ্রহ হইতে বৃদ্ধি

নিম্নলিখিত অবস্থায় 'বিগ্রহ' অবলম্বন করিলে 'বৃদ্ধি' লাভ হইতে পারে। যখন কোন রাজা মনে করেন,—

১৩ কৌটিল্য, ৭।১, পৃ ২৬৫।

(১) তাঁহার রাষ্ট্রের অধিবাসী সমরনিপুণ যোদ্ধৃজাতির সাহায্যে শত্রুকে বিতাড়িত করিতে পারিবেন এবং তাঁহার রাজ্যে দুর্ভেদ্য দুর্গ থাকার দরুণ শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিবেন ;

(২) রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত দুর্ভেদ্য দুর্গকে নিজ কার্য্যের ভিত্তি করিয়া শত্রুর কার্য্যের সুফলসমূহ বিনষ্ট করিতে পারিবেন ;

(৩) অন্য রাজ্য আক্রমণ করার ফলে সেই রাজ্য হইতে শত্রুর প্রজাদিগকে প্ররোচিত করিয়া স্বপক্ষে আনিতে পারিবেন ; অথবা

(৪) বিপন্ন শত্রু নিরুৎসাহ হইয়া পড়ায় তাহার আরব্ধ কার্য্যসমূহ বিনষ্ট হইবে ;[১৪]

আসন হইতে বৃদ্ধি

রাজা 'আসন' অবলম্বন করিয়াও 'বৃদ্ধি' লাভ করিতে পারেন,—

(১) যখন তিনি অথবা তাঁহার শত্রু পরস্পরের কার্য্যের অনিষ্ট করিতে পারেন না ;

(২) যখন যুদ্ধের ফল উভয়ের পক্ষেই সমান ক্ষতিজনক বলিয়া মনে হইবে ; অথবা

(৩) যখন তিনি আক্রমণাদি না করিয়া অপ্রতিহত ভাবে নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন।

যান, সংশ্রয় অথবা দ্বৈধীভাব হইতে বৃদ্ধি

যখন রাজা দেখেন যে, তাঁহার নিজের কার্য্যাবলী রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা হইয়াছে এবং 'যান' অবলম্বন করিয়া শত্রুর কার্য্যাবলী বিনষ্ট করা যায়, তখন তিনি 'যান' অবলম্বন করিলে 'বৃদ্ধি' লাভ করিবেন।

যখন কোন রাজা এমন এক পরাক্রান্ত শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন যে, আক্রমণ প্রতিহত করা অথবা আক্রমণকারীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, তখন 'সংশ্রয়' অবলম্বন করিলে, তাঁহার 'বৃদ্ধি' লাভ হয়। এই অবস্থায় রাজার 'সংশ্রয়' দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এইরূপে ক্রমে ক্রমে 'ক্ষয়' হইতে 'স্থানে' ও 'স্থান' হইতে 'বৃদ্ধি'র অবস্থায় উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কোন রাজা যদি একই কালে এক রাজার সহিত মিত্রতা করিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন ও তাহার কার্য্যাবলী বিনষ্ট করিতে পারেন, তবে তাঁহার পক্ষে 'দ্বৈধীভাব' অবলম্বন করা 'বৃদ্ধি'র কারণ হইতে পারে।[১৫]

---

১৪ কৌটিল্য, ৭।১, পৃ ২৬৫, ২৬৬।

১৫ কৌটিল্য, ৭।১, পৃ ২৬৬।

সুতরাং কোন 'গুণ' অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে উহার ফলে 'বৃদ্ধি', 'স্থান' কিংবা 'ক্ষয়ে'র সম্ভাবনা আছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ 'বৃদ্ধি'ই প্রত্যেক নীতি অবলম্বনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; তাহার পর 'স্থান' অর্থাৎ লাভ বা ক্ষতিশূন্য অবস্থা। কিছুতেই 'ক্ষয়ে'র হাত হইতে অব্যাহতির সম্ভাবনা না থাকিলে, ক্রমে ঐ 'ক্ষয়' পূরণ করিয়া উত্তরোত্তরবর্ত্তী অবস্থায় পৌঁছিবার চেষ্টা করা উচিত।

কৌটিল্যের শান্তিপ্রিয়তা

কৌটিল্যের মতে যথাসম্ভব যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়াই রাজার কর্ত্তব্য। কারণ, যুদ্ধে সাংঘাতিক লোকক্ষয়, অর্থনাশ ও শক্তি ক্ষয় হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, যুদ্ধে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। সুতরাং 'সন্ধি' ও 'বিগ্রহের' মধ্যে 'সন্ধি' অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। তদ্রূপ 'আসন' ও 'যানের' মধ্যে 'আসন' ভাল; কারণ, 'আসনে' যুদ্ধের ভীষণতা সম্পূর্ণ প্রকট হয় না। স্বার্থ ও ধর্ম্ম—উভয় দিক্ হইতেই কৌটিল্য শান্তি সমর্থন করিতেছেন।

কোন 'গুণ' অবলম্বন করিবার ফলে পূর্ব্বোক্ত 'বৃদ্ধি', 'ক্ষয়' ও 'স্থান' এবং উপরি উক্ত শান্তির উপযোগিতার কথা বিবেচনা করিতে হইবে; তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত ছয়টি বিষয়ের কোনটি সেই অবস্থায় প্রযোজ্য কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।[১৬]

(১) যখন কাহারও অবস্থা শত্রুর অপেক্ষা হীন, তখন তাঁহার 'সন্ধি' অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।[১৭]

(২) যখন কোন রাজা নিজেকে শত্রুর অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী মনে করিবেন, তখন তিনি 'বিগ্রহ' করিতে পারিবেন।[১৮]

(৩) যখন দেখা যায় যে, শত্রুর অনিষ্ট করাও সম্ভব নয়, আবার শত্রুও অনিষ্ট করিতে সমর্থ নহে, তখন 'আসন' অবলম্বন করাই উচিত।[১৯]

(৪) যখন শক্তির প্রাচুর্য্য ঘটে, তখন শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করা (যায়াৎ) যাইতে পারে।[২০]

(৫) প্রবল শত্রু আক্রমণ করিতে আসিলে, দুর্ব্বল রাজার 'সংশ্রয়' অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।[২১]

(৬) যখন সাহায্য ব্যতীত সফলতা লাভ হইবে না অর্থাৎ একাকী দুই শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ

---

১৬ কৌটিল্য, ৭।১, পৃ ২৬৩।

১৭ পরস্মাদ্ধীয়মানঃ সন্দধীত।

১৮ অভ্যুচ্চীয়মানো বিগৃহ্লীয়াৎ।

১৯ ন মাং পরো নাহং পরমুপহন্তুং শক্তঃ ইত্যাসীত।

২০ গুণাতিশয়যুক্তো যায়াৎ।

২১ শক্তিহীনঃ সংশ্রয়েত।

করা অসম্ভব মনে হইবে, তখন এক শত্রুর সহিত মিত্রতা করিয়া অপরের সহিত 'বিগ্রহ' দ্বারা 'দ্বৈধীভাব' অবলম্বন করিবে।[২২]

উপরি উক্ত দ্বিতীয় ও চতুর্থ উক্তি হইতে এই ভ্রম জন্মিতে পারে যে, যখন কোন রাজা শত্রুকে বিনষ্ট করিবার পক্ষে নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করেন, তখনই তাঁহার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা অথবা অভিযান করা উচিত। 'প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ' নামক পুস্তকের ৩০শ ও ৩১শ পৃষ্ঠায় আমি বিস্তৃত ভাবে দেখাইয়াছি যে, যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বে আক্রমণকারী ও আক্রান্ত এই উভয় পক্ষের মধ্যে পরস্পরের স্বার্থে স্বার্থে বিরোধ হওয়া আবশ্যক। কখন কখন হয়ত অন্যায়রূপে মিথ্যা কারণ দেখাইয়া কোন রাজা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু কেবল শক্তিশালী হইয়া বিনা কারণে যুদ্ধ করিলে মণ্ডলের অন্যান্য রাজারা ক্রুদ্ধ হইতেন। শক্তিমান্ রাজার পক্ষে শক্তি প্রদর্শনের জন্য এবং অপরাপর রাজাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ অবস্থায় তিনি রাজসূয় বা অশ্বমেধ যাগানুষ্ঠানের দ্বারা নিজ সামর্থ্য বিস্তার করিতেন। সঞ্চিত ক্ষমতা এইরূপে প্রকাশ করা হইত।

আরও একটি কথা। কৌটিল্য কোন কোন ক্ষেত্রে উপরি উক্ত ছয়টি উক্তির কোন কোনটির বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। দ্বিতীয় ও চতুর্থ উক্তি "অভ্যুচ্চীয়মানো বিগৃহ্ণীয়াৎ", "গুণাতিশয়যুক্তো যায়াৎ" দেখিয়া যদি কেহ এই সিদ্ধান্ত করেন যে, এক রাজা অন্য রাজা অপেক্ষা অধিক বলশালী হইলেই তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন ও যুদ্ধ ব্যতীত অন্য উপায়ে বিবাদ নিষ্পত্তির চেষ্টামাত্র করিবেন না, নিম্নলিখিত বিপরীত সূত্রগুলি দ্বারা তাঁহার সে ভ্রম দূর হইবে।

(১) জ্যায়ানপি সন্ধীয়েত (অপেক্ষাকৃত বলশালীরও 'সন্ধি' করা কর্ত্তব্য);

(২) জ্যায়ানপি আসীত (অপেক্ষাকৃত বলশালীরও 'আসন' অবলম্বন করা কর্ত্তব্য);

(৩) জ্যায়ানপি সংশ্রয়েত (অপেক্ষাকৃত বলশালীরও 'সংশ্রয়' অবলম্বন করা কর্ত্তব্য)।

সুতরাং অন্যান্য কারণ ও অবস্থা প্রভৃতি বিবেচনা না করিয়া কৌটিল্যের উপদেশগুলি সর্ব্বত্র প্রযোজ্য মনে করিলে ভুল হইবে। অবস্থা-বিশেষেই 'গুণ'বিশেষের প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায়। এই কথা মনে রাখিয়া বিচার করিলে, বুঝা যাইবে যে, কৌটিল্যের কোন কোন উপদেশ আপাতদৃষ্টিতে অকল্যাণকর বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে সেরূপ নহে। যেমন অবস্থা অনুসারে নিম্নলিখিত উপদেশও উপযোগী হয়।—

(৪) হীনোঽপি বিগৃহ্ণীয়াৎ (অপেক্ষাকৃত কম বলশালী হইলেও শত্রুতা করা কর্ত্তব্য);

২২ সহায়সাধ্যে কার্য্যে দ্বৈধীভাবং গচ্ছেৎ।

(৫) হীনোঽপি অভিয়ায়াৎ (অপেক্ষাকৃত কম বলশালী হইলেও শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিবে।);

(৬) জ্যায়ানপি দ্বৈধীভূতস্তিষ্ঠেৎ (অপেক্ষাকৃত অধিক বলশালী হইলেও 'দ্বৈধীভাব' অবলম্বন করা কর্ত্তব্য)।[২৩]

কোন অবস্থায় উপরি উক্ত উপদেশগুলি প্রযোজ্য, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে,—

(১) জ্যায়ানের পক্ষে 'সন্ধি'—

(ক) যখন কোন শক্তিশালী রাজা দেখিতে পান যে, শত্রুর প্রজাগণ লোভী, দরিদ্র ও নিপীড়িত অথবা যুদ্ধভয়ে ভীত হইলেও তাঁহার দিকে আসিতেছে না অর্থাৎ শত্রুর প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছে, তখন শত্রুর অপেক্ষা বলশালী হইলেও তাঁহার শত্রুর সহিত মিত্রতা করা উচিত।

(খ) যখন কোন শক্তিশালী রাজা অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী রাজার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া দেখিতে পান যে, যদিও উভয়েই ব্যসন বা বিপদে পতিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার নিজের বিপদ্ শত্রুর অপেক্ষা গুরুতর ও শত্রু নিজ বিপদ্ শীঘ্র দূর করিয়া বললাভ করিতে সমর্থ হইবে, তখন বড় রাজা হইলেও তাঁহার শত্রুর সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য।

(২) জ্যায়ানের পক্ষে 'আসন' — যখন কোন রাজা দেখেন যে, সন্ধিই করুন বা যুদ্ধই করুন, কোনরূপেই তাঁহার লাভ হয় না কিংবা শত্রুরও ক্ষতি হয় না, তখন অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হইলেও তাঁহার 'আসন' অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

(৩) জ্যায়ানের পক্ষে 'সংশ্রয়'— যখন কোন রাজার বিপদ্ বা ব্যসনসমূহের প্রতিকার করা অসম্ভব মনে হয়, তখন তিনি পরাক্রান্ত রাজা হইলেও 'সংশ্রয়' অবলম্বন করিবেন।

(৪) হীনের পক্ষে 'বিগ্রহ'— যখন কোন দুর্ব্বল রাজা দেখেন যে, তিনি যে-রাজার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহার প্রজারা দারিদ্র্য বশতঃ লোভী, এবং নিপীড়ন বশতঃ অসন্তুষ্ট হইয়া রাজা কর্ত্তৃক উন্মূলিত হইবার আশঙ্কায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হইলেও ঐ শক্তিশালী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারেন।[২৪]

---

২৩ কৌটিল্য, ৭।৩, পৃ ২৬৯, ২৭০।

২৪ এই দুর্ব্বল রাজা প্রবল রাজার নিকট অপমানজনক বশ্যতা স্বীকার করিয়া 'দণ্ডোপনত' অবস্থায় আছেন। সুতরাং মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত থাকায় তাঁহার পক্ষে সুযোগ পাইলেই ঐ প্রবল রাজার বিরুদ্ধাচরণ করা স্বাভাবিক।—প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ, পৃ ৬২-৬৪, ৬৬।

(৫) হীনের পক্ষে 'যান'— যখন কোন রাজা দেখেন যে, শত্রু প্রবল হইলেও তাহার আসন্ন বিপদ্ অনিবার্য্য, তখন নিজে কম শক্তিশালী হইলেও ঐ শত্রুকে আক্রমণ করিতে পারেন।

(৬) জ্যায়ানের পক্ষের দ্বৈধীভাব— কোন রাজা শক্তিশালী হইলেও যদি দেখেন যে, তিনি এক শক্তির সহিত 'সন্ধি' ও অন্য শক্তির সহিত 'বিগ্রহ' দ্বারা লাভবান্ হইবেন, তখন তাঁহার 'দ্বৈধীভাব' অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ষড়্‌গুণের সংমিশ্রণ

'গুণ'সমূহের মিশ্রণ চারি প্রকারের হইতে পারে; যথা,— (১) বিগৃহ্যাসন, (২) সন্ধায়াসন, (৩) বিগৃহ্যযান ও (৪) সন্ধায়যান।

'বিগৃহ্যাসন' ও 'সন্ধায়াসনে'র অক্ষরার্থ যথাক্রমে 'বিগ্রহের পর আসন' এবং 'সন্ধির পর আসন'। যাহাতে খাদ্য-সম্ভার বা যুদ্ধোপকরণ বাহির হইতে শত্রু-নগরে প্রবেশ করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ-ঘোষণার পর 'আসন' অবলম্বন করা হয়; ইহাতে শত্রুর আর্থিক নিপাত সাধন হয়। যখন কোন শত্রু-সেনা দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করে, তখন সেই দুর্গ অবরোধ করিয়া 'আসন' অবলম্বন করিতে হয়।[২৫]

বিগৃহ্যাসন ও সন্ধায়াসন

কৌটিল্য (৭।৪, পৃ ২৭২) বলিয়াছেন,—'অরি' এবং 'বিজিগীষু' যখন যুদ্ধে অশক্ত হইয়া পড়ে, তখন 'বিগৃহ্যাসন' বা 'সন্ধায়াসন' অবলম্বন করিতে হয়। কামন্দকীয়ের মতে (১২।১৬) অস্থায়ী ভাবে যুদ্ধ-বিরতির নাম 'সন্ধায়াসন'। কিন্তু এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, 'আসনের' প্রধান উদ্দেশ্য ততটা সিদ্ধ হয় না।

যে ব্যক্তি 'আসন' অবলম্বন করিবে, সে অবকাশ লাভ হেতু আপনার শক্তি বাড়াইতে পারে এবং শত্রুর শক্তি কমাইবার নানারূপ সুযোগ লাভ করে। অস্থায়ীকালের জন্য যুদ্ধ-বিরতিতে সেরূপ সুযোগ লাভের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু কৌটিল্য 'বিগৃহ্যযানে'র যেরূপ অর্থ করিয়াছেন— এক শত্রুর সহিত 'বিগ্রহ' করিয়া অপর শত্রুর বিরুদ্ধে 'যান', 'বিগৃহ্যাসন' সম্পর্কেও সেইরূপ ব্যাখ্যা করিলে অর্থসঙ্গতি হয়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে এক শত্রুর সহিত অপর শত্রুর 'বিগ্রহ' বাধাইয়া নিজে 'আসন' অবলম্বন করাকে 'বিগৃহ্যাসন' বলা হইবে এবং এক শত্রুর সহিত 'সন্ধি' করিয়া অপর শত্রুর সম্বন্ধে 'আসন' করাকে 'সন্ধায়াসন' বলিতে হইবে; কিন্তু কৌটিল্য এইরূপ

---

২৫ কামন্দকীয়, ১১, শ্লো।১৪।

ব্যাখ্যা করেন নাই। কোন অবস্থায় 'বিগৃহ্যাসন' এবং কোন অবস্থায় 'সন্ধায়াসন' অবলম্বন করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কৌটিল্যের মতামত পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, 'বিগৃহ্যাসন' যাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তাঁহার অবস্থা, যিনি 'সন্ধায়াসন' অবলম্বন করিবেন, তাঁহার অবস্থা অপেক্ষা ভাল; কারণ, প্রথম 'আসনে' শুধু আত্মরক্ষার ভাব নয়, আক্রমণের ভাবও রহিয়াছে; কিন্তু দ্বিতীয় 'আসনে' আত্মরক্ষা মাত্র সূচিত হইয়াছে।

কৌটিল্য 'বিগৃহ্যাসন' সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, অবস্থা-বিশেষে 'মিত্র' ও 'পার্ষ্ণিগ্রাহাসারে'র (পশ্চাদ্বর্ত্তী শত্রুর মিত্রের) মধ্যে অথবা 'আক্রন্দ' (পশ্চাদ্বর্ত্তী বন্ধু) ও 'পার্ষ্ণিগ্রাহে'র (পশ্চাদ্বর্ত্তী শত্রুর) মধ্যে 'বিগ্রহ' ঘটাইবার পর শত্রুর বিরুদ্ধে 'যান' অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।[২৬] একজনকে আর একজনের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যটা যে কি, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এইরূপ করিবার পর তাঁহার পক্ষে অধিক সেনা লইয়া শত্রুর সম্মুখীন হওয়া সহজ হয়। যে-সময়ে তিনি অন্যত্র ব্যাপৃত থাকিবেন, তখন তাঁহার রাজ্য অন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। কামন্দকীয় নীতিসারেও এই অর্থে 'বিগৃহ্যযানের' উল্লেখ দেখা যায়।

অরিমিত্রাণি সর্ব্বাণি স্বমিত্রৈঃ সর্ব্বতো বলাৎ।
বিগৃহ্য বারি গমনং বিগৃহ্য গমনং স্মৃতং॥

(শত্রুর মিত্রগণের সহিত নিজ মিত্রগণের 'বিগ্রহ' বাধাইয়া শত্রুকে সমগ্র বলের সহিত আক্রমণ করাকে 'বিগৃহ্যযান' বলে)[২৭]।

কামন্দক তাঁহার নীতিসারের ১১শ প্রকরণের ৩য় শ্লোকে এই শব্দের অন্য একটি অর্থও করিয়াছেন। যথা,—শত্রুর দ্রব্য-সম্ভার লুট অথবা ধ্বংস করিবার কালে শত্রুর বিরুদ্ধে 'যান' অবলম্বন করা। এই স্থলে কামন্দক যে অর্থে 'বিগৃহ্যযান' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, কৌটিল্যও তাঁহার এই গুণসম্বন্ধীয় দুইটি উদাহরণ প্রসঙ্গে ঠিক সেই অর্থেই উহা ব্যবহার করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে কোন 'মিত্র' সংশ্লিষ্ট না থাকায় 'বিগ্রহ' ও 'যান' উভয় 'গুণ'ই এক শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার কথা বলা হইয়াছে। কৌটিল্য 'বিগৃহ্যযানে'র তৃতীয় এক অর্থ করিয়াছেন। এইরূপ 'বিগৃহ্যযান' তখন হয়, যখন রাজা নিজেকে এরূপ শক্তিশালী বিবেচনা করেন যে, তিনি 'পার্ষ্ণিগ্রাহ' ও 'পার্ষ্ণিগ্রাহাসারে'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পরও সম্মুখ-শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে ভীত হন না; কারণ, তিনি আশা করেন যে, তিনি কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে

২৬ কৌটিল্য, ৭।৪, পৃ ২৭৩, ২৭৪।

২৭ কা, ১১।৪। ভাষ্যকার শঙ্করার্য্য শ্লোকটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'বলের দ্বারা নিজ মিত্রগণে সাহায্যে শত্রুর মিত্রগণকে আপনার বশীভূত করা এবং তৎপর শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করা।'

অল্প সময়ের মধ্যে সম্মুখ-শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করিয়া যথাকালে ফিরিয়া আসিয়া উপরি উক্ত পশ্চাৎ-শত্রুদের সহিত যুঝিতে পারিবেন। এই প্রকার 'বিগৃহ্যযানের' বিশেষত্ব এই যে, রাজা বাহিরের কোন সাহায্য গ্রহণ করেন না, একাই সম্মুখ-শত্রু ও পশ্চাৎ-শত্রুর সম্মুখীন হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 'বিগৃহ্যযান' তিন প্রকারের হইতে পারে,—

(১) পশ্চাদ্বর্ত্তী রাজাদের মধ্যে 'বিগ্রহ' ঘটাইয়া দিয়া সম্মুখ ভাগে শত্রুর বিরুদ্ধে স্বয়ং 'যান' করা [এই স্থলে 'বিগ্রাহ্যযান' (বি—গ্রহ্ ধাতুর ণিজন্তরূপ) কথাটি প্রযুক্ত হইলে, প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হইত]।

(২) অন্য কোন রাজা সংশ্লিষ্ট না থাকায় 'বিগ্রহ' এবং 'যান' দুইই শুধু শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা।

(৩) অন্যের সাহায্য না লইয়া রাজাকে উভয় পার্শ্বের বিপদের সম্মুখীন হওয়া। এই প্রকারের 'বিগৃহ্যযানে' রাজা সম্মুখস্থিত শত্রুর বিরুদ্ধে 'বিগ্রহ' শেষ করিয়া তিনি পশ্চাতের শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য ফিরিয়া আসেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন।

যে অবস্থায় 'বিগৃহ্যযান' অবলম্বন করা হইবে, তাহার বিপরীত অবস্থায় 'সন্ধায়যান' অবলম্বন করিবার উপদেশ কৌটিল্য দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বিষয়টি বিশদ হয় নাই। তিনি কোন দৃষ্টান্ত দ্বারাও বুঝাইয়া দেন নাই। 'বিগৃহ্যযানে'র মত, 'সন্ধায়যানে'র 'সন্ধায়' শব্দটি নিম্নলিখিত প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে; পশ্চাদ্ভাগের শত্রুর সহিত সন্ধি করিবার পর সম্মুখ শত্রুর বিরুদ্ধে 'যান' অবলম্বন করা। 'বিগৃহ্যযানে'র 'বিগ্রহ' যেরূপ 'বিগ্রাহ্য' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্রূপ 'সন্ধায়যানে'র 'সন্ধায়' ণিজন্ত অর্থে লওয়া যাইতে পারে। এই ণিজন্ত অর্থ ধরিলে 'সন্ধায়যানে'র অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ,—নিজের বিপদ্ লাঘব করিবার জন্য রাজা তাঁহার পশ্চাৎ-শত্রু ও মিত্রের মধ্যে সন্ধি করাইয়া সম্মুখ-শত্রুর দিকে ধাবিত হন। এই অর্থটি গ্রহণযোগ্য হইলেও, ইহার পরিপোষক দৃষ্টান্ত কোন গ্রন্থেই দেখা যায় না। 'সন্ধায়যানে'র প্রথমোক্ত অর্থটি কামন্দকীয়ে পাওয়া যায়, সেখানে উহা বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্তও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।[২৮] 'বিগৃহ্যাসন' ও 'সন্ধায়াসন' সম্পর্কে উভয় নামেরই প্রথম অংশ ণিজন্ত অর্থে গ্রহণ করিলে কোন গোলযোগ হয় না। বিশেষতঃ 'সন্ধায়াসন' অবলম্বনকালে কোন শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া তাহারই বিরুদ্ধে 'আসন' অবলম্বন করার কথা বলা চলে না। সুতরাং 'সন্ধায়াসন' কথাটির 'সন্ধায়' অংশ ণিজন্ত অর্থে লওয়াই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলে

---

২৮ কা, ১১।৫।

'সন্ধায়াসনে'র অর্থ দাঁড়ায় এই—যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখ-শত্রু ব্যতীত এক বা একাধিক শত্রু থাকিলে, তিনি তাহাদের সহিত নিজ মিত্র বা মিত্রগণের সন্ধি স্থাপন করাইয়া দেন, ও তাহার পর সম্মুখ-শত্রুর বিরুদ্ধে নিজে 'আসন' অবলম্বন করেন। ণিজন্ত করিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে আর একটি সুবিধা এই যে, তাহাতে 'সন্ধায়াসন' (এবং 'সন্ধায়যান') ও 'দ্বৈধীভাবে'র মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট অনুভূত হয়।

'সন্ধায়' শব্দটি সাধারণ অর্থে গ্রহণ করিলে 'সন্ধায়াসনে'র অর্থ হইবে—এক বা অধিক 'পার্ষ্ণিগ্রাহে'র সহিত সন্ধি করিয়া সম্মুখবর্ত্তী অরির বিরুদ্ধে 'আসন'। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 'সন্ধায়াসনে'র তিনটি অর্থ আছে, তাহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সাময়িক যুদ্ধ-বিরতির পর 'আসন' অবলম্বনও একটি। সেইরূপ 'বিগৃহ্যাসনে'র 'বিগৃহ্য' ণিজন্ত ভাবে লইলে অন্য একটি অর্থ পাওয়া যাইবে।

বিগৃহ্যাসন অবলম্বনের উপযোগী অবস্থা

নিম্নে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ অবস্থায় 'বিগৃহ্যাসন' অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে,—

(১) যখন কোন রাজা নিজ সৈন্য, মিত্রসৈন্য ও আটবিক সৈন্যের সাহায্যে সম বা অধিকতর বলশালী শত্রুকে বর্জ্জন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন, তখন তিনি নিজ রাজ্যের বিদ্রোহীদের সহিত সন্ধি করিয়া ও শত্রুরাজ্যের বিদ্রোহীদের মিত্র করিয়া 'বিগৃহ্যাসন' অবলম্বন করিতে পারেন।

(২) যখন রাজা দেখিতে পান যে, তাঁহার প্রজাগণ সাহসী, একতাবদ্ধ ও সমৃদ্ধ এবং অপ্রতিহত-ভাবে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া যাইতে পারিবে, অথবা শত্রুর কার্য্যাবলী নষ্ট করিতে সমর্থ হইবে, তখন 'বিগৃহ্যাসন' অবলম্বন করা যাইতে পারে।

(৩) শত্রুর উপচয় প্রতিহত করিবার জন্য ও নিজ শক্তি বাড়াইবার জন্য নিম্নলিখিত অবস্থায় 'বিগৃহ্যাসন' অবলম্বন করা চলে ;—

(ক) যখন শত্রুর প্রজারা দারিদ্র্যহেতু লোভী ও রাজসৈন্যগণ কর্তৃক নিপীড়িত এবং চোর ও আটবিকগণ কর্তৃক উত্ত্যক্ত হইয়া আপনা হইতে অথবা প্রলোভন ও প্ররোচনার ফলে তাঁহার দলে আসিবার সম্ভাবনা থাকে ;

(খ) যখন তাঁহার নিজ রাজ্যের বার্ত্তা (কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য) শ্রীসম্পন্ন অথচ শত্রুর রাজ্যের বার্ত্তা হতশ্রী হওয়ার দরুণ শত্রুর প্রজাগণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করে ;

(গ) যখন তাঁহার নিজ রাজ্যের বার্ত্তা মন্দ এবং শত্রুর রাজ্যের বার্ত্তা উন্নত হইলেও

তাঁহার নিজের প্রজাদের শত্রুর দলে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই, অথচ তিনি শত্রুর সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাহার রাজ্য হইতে ধান্য, গোধন ও স্বর্ণ লুণ্ঠন করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন;

যখন তিনি মনে করিবেন,

(ঘ) শত্রু রাজ্য হইতে আমদানী পণ্যের বিক্রয় বন্ধ করিয়া নিজ রাজ্যে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হইতে পারে;

(ঙ) যখন যে সকল মূল্যবান্ বস্তু শত্রুর রাজ্যে বিক্রীত হয়, তাহা নিজ রাজ্যেই বিক্রীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে;

(চ) যখন যুদ্ধ ঘোষণার ফলে, শত্রু তাহার রাজ্যের বিদ্রোহী ও আটবিকগণকে বশে রাখিতে পারিবে না কিংবা তাহাদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইবে, এইরূপ সম্ভাবনা থাকে;

(ছ) যখন 'বিজিগীষু' যুদ্ধ ঘোষণা না করিলে তাঁহার কোন মিত্র রাজ্য আক্রমণ করিয়া শত্রু অল্প সময়ের মধ্যে প্রভূত ধন লাভ করিবে, এইরূপ আশঙ্কা থাকে;

(জ) যখন 'বিজিগীষু' পাশ্ববর্ত্তী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার শক্তি উপেক্ষা করিয়া শত্রু অকুতোভয়ে সহজে প্রাপ্য অন্য শত্রুর এক উর্ব্বর রাজ্যের দিকে সমস্ত সৈন্যের সহিত যাত্রা করে।

সন্ধায়াসন অবলম্বনের উপযোগী অবস্থা

কোন কোন অবস্থায় 'সন্ধায়াসন' অবলম্বন করিতে হইবে, সে কথা কৌটিল্য অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যখন 'বিগৃহ্যাসনের' প্রয়োগ দ্বারা প্রতিকূল ফল পাওয়া যায়, তখন 'সন্ধায়াসন' অবলম্বন করা উচিত।

বিগৃহ্যযান ও সন্ধায়যান অবলম্বনের উপযোগী অবস্থা

(১) 'বিগৃহ্যাসনের' ফলে লব্ধসামর্থ্য রাজার 'বিগৃহ্যযান' অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন শক্তিশালী রাজা যদি তাঁহার সমস্ত বলের সহিত শত্রুর সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত থাকেন, তাঁহার বিরুদ্ধে 'বিগৃহ্যযান' সমীচীন নহে। সেস্থলে 'বিগৃহ্যাসন' করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(২) নিম্নলিখিত অবস্থায় 'বিগৃহ্যযান' অবলম্বন করা উচিত,—

(ক) যদি শত্রু ব্যসনগ্রস্ত হয়;

(খ) যদি শত্রুর ব্যসন এরূপ হয় যে, যে-সকল রাজ্যাঙ্গ ব্যসনগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে অবশিষ্ট সুস্থ অঙ্গগুলির সাহায্যেও কার্য্যক্ষম করা দুরূহ হইবে;

(গ) যদি শত্রুর প্রজাগণ তাহাদের রাজার সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া অসন্তুষ্ট ও হীন অবস্থায় পতিত হয় এবং এইরূপ নিরাশ ঐক্যহীন অবস্থায় প্রলোভন দেখাইলে তাহাদের রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য ইচ্ছুক থাকে ;

(ঘ) যদি অগ্নি, জলপ্লাবন, ব্যাধি, মড়ক ও দুর্ভিক্ষে শত্রুর রাজ্য আত্মরক্ষায় অক্ষম হয় এবং ভারবাহী পশু ও শিল্পীর অভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়।

৩। যখন কোন রাজা দেখেন যে, তাঁহার 'মিত্র' ও 'আক্রন্দে'র প্রজাগণ বিশ্বাসী, সাহসী ও সমৃদ্ধ ; কিন্তু 'অরি' এবং 'পার্ষ্ণিগ্রাহ' ও 'পার্ষ্ণিগ্রাহাসারে'র প্রজাগণের অবস্থা উহার বিপরীত এবং তিনি 'মিত্র' ও 'পার্ষ্ণিগ্রাহাসারে'র মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া অথবা প্রয়োজন হইলে, 'আক্রন্দ', ও 'পার্ষ্ণিগ্রাহের' মধ্যে 'বিগ্রহ' ঘটাইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে 'বিগৃহ্যযান' অবলম্বন করিতে পারেন, তখন তাহার তাহাই করা উচিত।

৪। যখন কোন রাজার পক্ষে 'পার্ষ্ণিগ্রাহ' ও 'পার্ষ্ণিগ্রাহাসারে'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর অল্প সময়ের মধ্যে অন্য এক শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া জয়লাভ করা এবং তাহার পরে 'পার্ষ্ণিগ্রাহ' ও 'পার্ষ্ণিগ্রাহাসারে'র সহিত যুদ্ধ করিতে আসা সম্ভব হয়, তখন 'বিগৃহ্যযান' অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ইহার বিপরীত অবস্থায় ঐ রাজার 'সন্ধায়যান' অবলম্বন করা উচিত।[২৯]

শক্তিবর্গের সম্ভূয়যান

যখন কোন রাজা দেখেন যে, একাকী শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা সম্ভবপর নহে, অথচ যুদ্ধ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, তখন তাঁহাকে এক বা অধিক শক্তির সহিত মিলিত হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয়। এই শক্তিসমূহ তাঁহার নিজের সহিত তুলনায় সম, অধিক বা কম বলসম্পন্ন হইতে পারে। নিম্নলিখিত অবস্থায় ঐ শক্তিসমূহ তাঁহার স্বপক্ষে যুদ্ধ করিতে রাজী হইয়া থাকে।—

(১) যখন বিজয়ের সম্ভাবনা খুব বেশী এবং প্রত্যাশিত যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদির একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ তাহাদের জন্য থাকিবে ;

---

২৯ উপরে আলোচিত বিষয়গুলির জন্য কৌটিল্য, ৭।৪ দ্রষ্টব্য। কামন্দক নিম্নলিখিত গুণ-সমবায়ের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা, (ক) প্রসঙ্গাসন, (খ) উপেক্ষাসন, (গ) প্রসঙ্গযান, (ঘ) উপেক্ষাযান, (ঙ) সম্ভূয়াসন এবং (চ) সম্ভূয়যান। এই গুণসমূহ ও তাহাদের তারতম্য তত গুরুতর নহে ; সুতরাং বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই (কা. ১১।৬-১০ ; ১৮-২২ দ্রষ্টব্য)।

(২) অপ্রত্যাশিত যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদির একটা অংশ তাহারা পাইবে, কিন্তু তাহার অংশ প্রথম হইতে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না।

(৩) সাহায্যকারী শক্তি বা শক্তিবর্গের বিপদের সময় রাজা তাহাদের পক্ষে যোগদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

যখন কোন শক্তি যোগ দিতে অস্বীকার করে, তখন তাহাকে কতক সৈন্য ধার দিতে অনুরোধ করা হয় ও কথা থাকে যে, তজ্জন্য জয়লব্ধ দ্রব্যের কিছু অংশ সেই শক্তি গ্রহণ করিবে। এই সকল স্থলে কে কি পরিমাণে সৈন্য যোগাইয়াছেন, কতখানি শ্রম করিয়াছেন, অথবা কি পরিমাণ ক্ষতি ও অর্থব্যয় সহ্য করিয়াছেন, তাহা হইতেই প্রত্যেকের লব্ধ দ্রব্যের ভাগ নির্ণীত হয়। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক শক্তিকে তাহার নিজ বাহুবলে প্রাপ্ত অংশ গ্রহণ করিবারও অধিকার দেওয়া যাইতে পারে।[৩০]

সম্ভূয়যানের প্রকৃতি

একজন অধিকতর শক্তিশালী রাজা অপেক্ষা সমশক্তিসম্পন্ন দুইজন রাজার সহিত মিলিত হওয়া ভাল বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কারণ, অধিকতর শক্তিশালী রাজার সহিত মিলিত হইলে, স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। তারপর, যুদ্ধে লব্ধ দ্রব্যের ভাগ লইয়া যদি সমবল সাহায্যকারীরা মনে করে যে, তাহারা ঠকিয়া যাইতেছে এবং যদি সেই জন্য বিবাদের কারণ ঘটে, তবে রাজার পক্ষে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া সম্ভব হইতে পারে। সমবল দুই শক্তির মধ্যে কেহ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহা হইলে তাহাকে অপরের সাহায্য লইয়া অথবা তাহার রাজ্যের অসন্তুষ্ট লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া দমন করা সহজ হইতে পারে। সমশক্তি-সম্পন্ন রাজা অপেক্ষা দুইজন কম শক্তি-সম্পন্ন রাজার সহিত মিলিত হওয়া ভাল; কারণ, তাহারা বাধ্য থাকে ও তাহাদের দ্বারা ইচ্ছামত বিভিন্ন কাজ করান যায়।

মিলিত হইবার জন্য আহূত রাজার কর্ত্তব্য

সাহায্য প্রদানে ইচ্ছুক সৎ রাজার সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করা উচিত।[৩১] যদি কোন রাজা মিলিত হইবার জন্য আহূত হইয়া যোগদান করিতে রাজী হন, তাহা হইলে, যুদ্ধে বিজয়লাভ

---

৩০ কৌটিল্য, ৭.৪, পৃ ২৭৪।

৩১ কৌটিল্য ৭।৫, পৃ ২৭৭, ২৭৮।

করিবার পর, বিজয়লব্ধ দ্রব্যাদির ভাগ সম্বন্ধে তাঁহার নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে রাখা দরকার। যে রাজা তাঁহাকে সাহায্যার্থ ডাকিয়াছেন, তিনি যদি অধিকতর বলশালী হন এবং আহূত রাজার প্রতি অবিচার করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, সেই রাজা বিজিত দ্রব্যের অংশ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া আসিবেন ; আহ্বানকারী রাজা যদি তাঁহার আচরণে ন্যায়পরায়ণ হন, তাহা হইলে আহূত রাজার পক্ষে নিজ অংশ লাভের নিমিত্ত শেষ অবধি অপেক্ষা করা অসমীচীন হইবে না। যুদ্ধ-ব্যাপারে কৃতকার্য্যতা লাভের পরে বিজয়ীর পক্ষে অহঙ্কারী হওয়া বিচিত্র নয়। নবলব্ধ ক্ষমতা বিজয়ীকে উদ্ধত করিয়া তুলে, তাহার ফলে তিনি সমশক্তি-সম্পন্ন সাহায্যকারী রাজগণের প্রতি সুবিচার না করিতে পারেন। সুতরাং কোন কম শক্তিশালী রাজা অংশ-লাভ বিষয়ে মনে মনে অসন্তুষ্ট থাকিলেও, অর্থাৎ যাহা পাইবার কথা ছিল, তাহা মোটে না পাইলে কিংবা তাহা অপেক্ষা কম পাইলে, অধিক শক্তিশালী রাজার নিকট মৌখিক সন্তোষ প্রকাশ করিয়া চলিয়া আসিবেন। পরে এমন সুবিধা আসিতে পারে যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহার প্রাপ্য না পাওয়ার দরুণই তিনি ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উহার দ্বিগুণ পাইতে পারেন।[৩২] বিক্রম হেতু (অর্থাৎ তাঁহার ক্ষতি করিয়া অন্যপক্ষ লাভবান্ হইলে) তিনি যদি অতিশয় ক্লিষ্ট হন, তবে অবস্থায় কুলাইলে, তিনি উপযুক্ত সময়ে নিম্নলিখিত উপায়সমূহের একটি বা অধিক অবলম্বন করিতে পারেন,—

(১) প্রকাশ যুদ্ধ (নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে সম্মুখ-যুদ্ধ) ;

(২) কূটযুদ্ধ (শত্রুর ভয় উৎপাদন, সবলে দুর্গ আক্রমণ, অসতর্ক মুহূর্ত্তে অথবা বিপৎকালে আক্রমণ এবং প্রবঞ্চনাময় সমর-কৌশল) ;

(৩) তুষ্ণীংযুদ্ধ (গুপ্ত উপায় ও গুপ্তচর দ্বারা ক্ষতিকর কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান)।[৩৩]

যে রাজা কার্য্যসিদ্ধির জন্য অপর রাজাদিগকে আহ্বান করিয়া 'সম্ভূয়যান' করেন, তাঁহার পক্ষে কৌটিল্যের উপদেশ এই যে, আহূত রাজাদিগের প্রতি তিনি ভদ্র ও ন্যায় আচরণ করিবেন এবং কার্য্যশেষে প্রত্যেককে তাঁহার প্রাপ্য বুঝাইয়া দিবেন। দরকার হইলে, নিজের অংশের কিছু পরিমাণ ত্যাগ করাও তাঁহার পক্ষে ভাল। এইরূপে তিনি মণ্ডলস্থ অন্যান্য সভ্যের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

---

৩২ কৌটিল্য, ৭।৫, পৃ ২৭৮।

৩৩ কৌটিল্য, ৭।৬, পৃ ২৮০, ২৮৩।

জীবনী-পঞ্জী

বঙ্গাব্দ

১২৬০ ২২এ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ষষ্ঠী, (খ্রীঃ ১৮৫৩, ৬ই ডিসেম্বর)—জন্ম।

১২৬৭ —পিতার মৃত্যু।

খ্রীষ্টাব্দ

১৮৭১—প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স, ১৮৭৩—১ম বিভাগে এফ্‌ এ, ১৮৭৬—অষ্টম স্থান অধিকার পূর্ব্বক বি এ ও ১৮৭৭—এম্‌ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৭৮—ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই বৎসরে সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৮৭৯ অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপক হন।

১৮৮০—নৈহাটী মিউনিসিপালিটির কমিশনার মনোনীত হন। ইহার কিছুদিন পরে ভাইস-চেয়ারম্যান ও তৎপরে চেয়ারম্যান মনোনীত হন।

১৮৮৩—জানুয়ারী মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই বৎসরে সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গীয় রাজসরকারের অনুবাদ-বিভাগে সহকারী অনুবাদক নিযুক্ত হন।

১৮৮৪—নৈহাটী বেঞ্চের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পরে এই বেঞ্চের সভাপতি হন।

১৮৮৫—এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এবং কৃষ্টি, ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব-সমিতির সভ্য ও পরে উহার সম্পাদক মনোনীত হন। সঙ্গে সঙ্গে Bibliotheca Indica-র কার্য্যভার গ্রহণপূর্ব্বক বাইশ বৎসর কাল এই কার্য্য পরিচালনা করেন।

১৮৮৬—বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ হন। খ্রীঃ ১৮৯৪ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

১৮৮৮—সেণ্ট্রাল টেক্সট্‌বুক্‌ কমিটির সভ্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন (আজীবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন)।

১৮৯১—জুলাই মাসে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যু হইলে, এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি-সংগ্রহ-কার্য্যের প্রধান পরিচালক হন।

১৮৯৪—ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৮৯৫—Buddhist Text and Research Society-র সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৮৯৬—(বঙ্গাব্দ ১৩০৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

১৮৯৭—প্রথমবার নেপাল গমন করেন। এই বৎসরে (১৩০৪ বঙ্গাব্দ) তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এবং এই পদে তিনি ১৩০৫, ১৩০৬, ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩০৯, এবং ১৩১৮, ১৩১৯, ১৩২৩, ১৩২৪, ১৩২৫, ১৩৩১, ১৩৩৭ ও ১৩৩৮ মোট ১৩ বৎসর কাল নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৮৯৮—'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি-প্রাপ্তি।

১৮৯৮-৯৯—দ্বিতীয়বার নেপাল গমন করেন।

১৯০০—ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত পরীক্ষার রেজিষ্ট্রার হন।

১৯০৩—বোধগয়া-মন্দিরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য গভর্ণমেণ্ট যে কমিশন নিয়োগ করেন, পরলোকগত সারদাচরণ মিত্রের সহযোগে তিনি সেই কমিশনের সভ্য নিযুক্ত হন।

১৯০৪—এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে তিনি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই-শাখার শতবার্ষিক-উৎসবে যোগদান করেন।

১৯০৬—এশিয়াটিক সোসাইটির আজীবন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

১৯০৭—তৃতীয়বার নেপাল গমন করেন।

১৯০৮—নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য (১৩১৫ বঙ্গাব্দ) নির্ব্বাচিত হন। গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে অক্সফোর্ডের সংস্কৃত অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল সাহেবের সহিত উত্তর ও মধ্য ভারত পরিভ্রমণ করেন। এবং ম্যাক্সমূলার স্মৃতি-ভবনের জন্য কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য বৈদিক পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই বৎসরেই তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হয়।

১৯১১—গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে 'সি আই ই' উপাধি প্রাপ্ত হন। সিমলায় প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌গণের যে সম্মিলনী হয়, তাহার সদস্য মনোনীত হন। এই বৎসরেই শাস্ত্রী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য (জয়পুর কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ) পরলোকগমন করেন।

১৯১৩—(বঙ্গাব্দ ১৩২০) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই পদে তিনি (১৩২১, ১৩২২, ১৩২৬, ১৩২৭, ১৩২৮, ১৩২৯, ১৩৩০, ১৩৩২, ১৩৩৩, ১৩৩৪, ১৩৩৫ ও ১৩৩৬) আরও বার বৎসর নির্ব্বাচিত হন। এই বৎসরেই কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

১৯১৪—(বঙ্গাব্দ ১৩২১) বর্দ্ধমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে মূল ও সাহিত্য-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

১৯১৮—(বঙ্গাব্দ ১৩২৪) মেদিনীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে (মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে) সভাপতি হন।

১৯১৯-২০ }
১৯২০-২১ } এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

১৯২০—(বঙ্গাব্দ ১৩২৬, ৪ঠা মাঘ) হেতমপুরে অনুষ্ঠিত বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতি হন।

১৯২১—রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির বিশিষ্ট সদস্য হন। এই বৎসরেই ১৮ই জুন হইতে (১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০এ জুন পর্য্যন্ত) তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯২২—চতুর্থবার নেপাল-যাত্রা। (বঙ্গাব্দ ১৩২৯) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার সংবর্দ্ধনা হয় এবং এই বৎসরেই তিনি কলিকাতা মহানগরীতে আহুত ভারত-হিন্দু-সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

১৯২৪—(বঙ্গাব্দ ১৩৩১) রাধানগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনের মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই বৎসরে সংস্কৃত কলেজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড লিটন বাহাদুর কর্ত্তৃক সংস্কৃত কলেজে শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈলচিত্র-প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯২৭—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি সম্মান-সূচক 'ডি লিট্' উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯২৮—লাহোরে অনুষ্ঠিত 'ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স'-এর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

১৯৩০—বৃহত্তর-ভারত-পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

১৯৩১—(১৩৩৮, ১৪ই ভাদ্র) তাঁহার পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষ উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে হরপ্রসাদ-বর্দ্ধাপন-সমিতি কর্ত্তৃক লেখমালার মুদ্রিত প্রথম খণ্ড ও অমুদ্রিত দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধাবলী সমর্পণ ও তদুপলক্ষে তাঁহার বাটীতে বন্ধু-সম্মিলন হয়। এবং (বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২রা জ্যৈষ্ঠ) 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উদ্বোধন-সভার সভাপতিরূপে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

১৯৩১—১৭ই নভেম্বর (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ ১লা অগ্রহায়ণ) মঙ্গলবার, রাত্রি ১১টার সময় তিনি পরলোকগমন করেন।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

লেখ-পঞ্জী

বাঙ্গালা গ্রন্থ

১। ভারত মহিলা (২য় সংস্করণ, ১২৮৯)

২। বাল্মীকির জয় (১২৮৮)

৩। মেঘদূত (১৩০৯)

৪। কাঞ্চনমালা (১৩২২)

৫। বেণের মেয়ে (১৩২৬)

৬। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য

বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থ

১। প্রসাদ-পাঠ (১ম ও ২য় ভাগ)

২। ভারতবর্ষের ইতিহাস

বাঙ্গালা পুস্তিকা

১। কলিকাতা মহানগরীতে আহুত ভারত-হিন্দু-সভার প্রথম মহাধিবেশনে সভাপতি মহোদয়ের সম্বোধন। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় কর্তৃক ইহা ইংরেজীতে অনূদিত হয় (১৯২৩)।

২। অখিল ভারতীয় সংস্কৃত মহাসম্মেলনে (মথুরার অধিবেশনে) সভাপতির অভিভাষণ

ইংরেজী গ্রন্থ ও পুস্তিকা

১। History of India.

২। Malavikagnimitra (1907).

৩। Vernacular Literature of Bengal before the Introduction of English Education (1891).

৪। Bird's Eye view of Sanskrit Literature (1917).

৫। Discovery of Living Buddhism in Bengal (1897).

৬। The Study of Sanskrit.

৭। The Educative Influence of Sanskrit (1916).

৮। Magadhan Literature (1923).

৯। Lokayata (1925).

১০। Absorption of the Vratyas (1926).

১১। Sanskrit Culture in Modern India (Presidential Address, 5th Oriental Conference, Lahore, 1928).

সম্পাদিত বাঙ্গলা গ্রন্থ

১। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল (১৩১২)

২। বৌদ্ধগান ও দোঁহা (১৩২৩)

৩। কাশীরাম দাসের মহাভারত, আদিপর্ব্ব (১৩৩৫)

সম্পাদিত মৈথিলী গ্রন্থ

১। বিদ্যাপতি প্রণীত কীর্ত্তিলতা (১৩৩১)

সম্পাদিত সংস্কৃত ও বৌদ্ধ গ্রন্থ

১। বৃহদ্ ধর্ম্মপুরাণ (১৮৮৮-১৮৯৭)

২। বৃহৎ স্বয়ম্ভূপুরাণ (১৮৯৪-১৯০০)

৩। সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম-চরিত (১৯১০)

৪। আর্য্যাদেবের চতুঃশতিকা (১৯১৪)

৫। আনন্দভট্টকৃত বল্লাল-চরিত (১৯০৪)

৬। ছয়খানি বৌদ্ধ ন্যায়ের পুথি (১৯১০)

৭। অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্য (ঐ)

৮। শৈনিক শাস্ত্র (ঐ)

বিবরণ-সম্বলিত পুথির তালিকা

১। Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Mss. belonging to the Darbar Library, Nepal vol. I (1905).

২। ঐ vol. II (1905)

৩। A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Government Collection under the care of the Asiatic Society of Bengal
vol. I—Buddhist Manuscripts (1917)
৪। ঐ vol. II—Vedic Manuscripts (1923)
৫। ঐ vol. III—Smriti Manuscripts (1925)
৬। ঐ vol. IV—History & Geography (1923)
৭। A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Collections of the Asiatic Society of Bengal
vol. V.—Purana Manuscripts (1928)
৮। ঐ vol. VI—Vyakarana Manuscripts (1931)

সংস্কৃত পুথি-অনুসন্ধান সম্বন্ধীয় বিবরণ

১। Report on the Search of Sanskrit Manuscripts (1895-1900)
২। ঐ (1901-1902 to 1905-1906)
৩। ঐ (1906-1907 to 1910-1911).

বঙ্গদর্শন

১২৮২ সাল হইতে ১২৮৮ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গদর্শনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি বাহির হয়,—

১। আমাদের গৌরবের দুই সময় (দুইটি প্রবন্ধ)
২। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ
৩। শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন ?
৪। বেদ ও বেদব্যাখ্যা
৫। কালিদাস ও সেক্ষপীয়ার
৬। বাঙ্গালা ভাষা
৭। সমাজের পরিবর্ত্ত কয় রূপ ?
৮। একজন বাঙ্গালী গবর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব
৯। বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি
১০। মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য

১১। এক্সচেঞ্জ

১২। তৈল

১৩। স্বাধীন বাণিজ্য ও রক্ষা-কর

১৪। খাজনা কেন দেই ?

১৫। শিক্ষা

১৬। হৃদয়-উদাস

১৭। কালেজী শিক্ষা

১৮। নূতন খাজনার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউএর মত

১৯। ভট্টাচার্য্য-বিদায় প্রণালী

২০। বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য

২১। নূতন কথা গড়া

২২। সাবেক "মনুষ্যত্ব" ও হালের "সাইন করা"

২৩। বাঙ্গালা ভাষার পরিণতি

২৪। কালিদাসের রঘুবংশ

২৫। স্বায়ত্ত শাসন

এই প্রবন্ধগুলি ব্যতীত ভারত মহিলা, বাল্মিকীর জয় ও কাঞ্চনমালা গ্রন্থ তিনখানি পর্য্যায়ক্রমে চতুর্থ, সপ্তম ও নবম বর্ষের (১২৮৯ বঙ্গাব্দ) বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক ভাবে বাহির হয়। মেঘদূতও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিভা

১২৯৪ সালের বিভায় নিম্নলিখিত তিনটি প্রাবন্ধ বাহির হইয়াছিল,

১। মুসলমানী বাঙ্গালা (শুর্জ্জু উজ্জালবিবির কেচ্ছা)

২। ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার (বোধিসত্তাবদান কল্পলতা)

৩। কুশীনগর

আর্য্যদর্শন

১। যৌবনে সন্ন্যাসী

২। প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ

কল্পনা

১২৮৭ সালে কল্পনাতে শাস্ত্রীমহাশয়ের নিম্নলিখিত লেখা দুইটি বাহির হয়,

১। মোহিনী (খণ্ডকাব্য)

২। স্ত্রী-বিপ্লব

সাহিত্য

১৩০০ সাল হইতে ১৩২৬ সাল পর্য্যন্ত সাহিত্যে নিম্নলিখিত দুইটি প্রবন্ধ বাহির হয়,

১। কবি কৃষ্ণরাম

২। রামেন্দ্র বাবু

মানসী, এবং মানসী ও মর্ম্মবাণী

১। কলিকাতা-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

২। ঐ অভিভাষণের পরিশিষ্ট

৩। অর্দ্ধেন্দু-কথা

৪। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে শোক-সভা

৫। রাধানগর সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ

প্রবাসী

১৩২২ সাল হইতে ১৩৩৬ সাল পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল,

১। কান্তকবি রজনীকান্ত

২। লাইব্রেরী

৩। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের গতি

৪। বাঙ্গালার প্রাচীন গৌরব

৫। হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের কথা

৬। কালিদাসের অভিধান

মাসিক বসুমতী

১৩২৯ সাল হইতে ১৩৩৮ সাল পর্য্যন্ত মাসিক বসুমতীতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি বাহির হয়,

১। নাট্টকলা

২। বঙ্কিমচন্দ্র (দুইটি প্রবন্ধ)

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যে চিত্তরঞ্জন

৪। কামন্দকীয় নীতিসার (আলোচনা)

৫। গুরুদাস-স্মৃতি (দুইটি প্রবন্ধ)

৬। "এস এস বঁধু এস আধ আঁচরে বস"

৭। ভবভূতি (দুইটি প্রবন্ধ)

৮। মহামহোপাধ্যায় মহাকবি মুরারিদান

বার্ষিক বসুমতী

১। পাঁচ ছেলের গল্প

২। ব্যানোগী টিব্বা (ভ্রমণ)

আগমনী

১। বামুনের দুর্গোৎসব

পঞ্চপুষ্প

১৩৩৬ সাল হইতে ১৩৩৯ সাল পর্য্যন্ত পঞ্চপুষ্পে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি বাহির হয়,—

১। ভারতের নাট্যশাস্ত্র

২। ভরতমল্লিক

৩। সিংহল-দ্বীপ

রংপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ

ভারতী

১। স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার

নাচঘর

১। অর্দ্ধেন্দু-স্মৃতি

সুবর্ণবণিক্ সমাচার

১। সাহিত্য-সংবাদ (৺দেবেন্দ্রবিজয় বসুর কথা)

২। ৺অধরলাল সেন

নব্যভারত

১। কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৪ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর তালিকা,—

১। কাঁটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন-পিত্তল-ফলক
২। রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল,
৩। ধোয়ী কবির পবন-দূত
৪। বাঙ্গালা ব্যাকরণ
৫। বৌদ্ধ ঘণ্টা ও তাম্র-মুকুট
৬। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ
৭। সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতির সম্বোধন
৮। হিন্দুর মুখে আওরঙ্গজেবের কথা
৯। সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সাহিত্য-শাখার সভাপতি সম্বোধন
১০। সম্বোধন
১১। সম্বোধন
১২। চণ্ডীদাস
১৩। বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর
১৪। ব্রহ্মা প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা
১৫। মহাদেব
১৬। সভাপতির অভিভাষণ (২৮শ বার্ষিক)
১৭। চণ্ডীদাস
১৮। প্যারীচাঁদ মিত্র
১৯। হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ
২০। আমাদের ইতিহাস
২১। বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করিতেন ?
২২। ৺ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

২৩। সভাপতির অভিভাষণ

২৪। বাঙ্গালার বৌদ্ধ সমাজ

২৫। সভাপতির অভিভাষণ (৩৬শ বার্ষিক)

২৬। চিরঞ্জীব শর্ম্মা

২৭। কাশীনাথ বিদ্যানিবাস

২৮। রত্নাকরশান্তি

২৯। বৃহস্পতি রায়মুকুট

৩০। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার

৩১। রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার

নারায়ণ

নারায়ণ পত্রিকায় শাস্ত্রী মহাশয়ের কালিদাস সম্বন্ধে চব্বিশটি, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনটি, অন্যান্য প্রবন্ধ সাতটি, মোট ৩৪টি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। এগুলি ব্যতীত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর সতেরোটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

(ক) কালিদাস সম্বন্ধে,—

১। কালিদাসের বসন্তবর্ণনা

২। ইরাবতী, মালবিকাগ্নিমিত্র

৩। পার্ব্বতীর প্রণয়

৪। উর্ব্বশী-বিদায়

৫। বিরহে পাগল

৬। কোমলে কঠোর

৭। কণ্বের কোমল মূর্ত্তি

৮। কণ্বের কঠোর মূর্ত্তি

৯। শকুন্তলার মা

১০। দুষ্মন্তের ভাঁড় মাধব্য

১১। দুর্ব্বাসার শাপ

১২। শকুন্তলার হিঁদুয়ানী

১৩। এক এক রাজার তিন তিন রাণী

১৪। অগ্নিমিত্রের ভাঁড়

১৫। কুমারসম্ভব—সাত না সতেরো সর্গ ?

১৬। রঘুবংশের গাঁথুনি

১৭। রঘুতে নারায়ণ

১৮। রঘু আগে কি কুমার আগে ?

১৯। অজ-বিলাপ ও রতি-বিলাপ

২০। রঘু-কাব্য বড় কিসে ?

২১। রঘুবংশের বাল্যলীলা

২২। রামের ছেলেবেলা

২৩। রঘুবংশে প্রেম

২৪। রঘুবংশে প্রেম-বিরহ

(খ) বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে,—

১। বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়

২। বঙ্কিম বাবু ও উত্তরচরিত

৩। বঙ্কিমচন্দ্র

(গ) অন্যান্য প্রবন্ধ,—

১। রাধামাধবোদয় (দুইটি প্রবন্ধ)

২। তীর্থ-ভ্রমণ (ঐ)

৩। দুর্গাপূজা

৪। মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা

৫। দুর্গোৎসবে নব-পত্রিকা

(ঘ) বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে—

১। বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে ?

২। নির্ব্বাণ

৩। নির্ব্বাণ কয় রকম ?

৪। কোথা হইতে আসিল (দুইটি প্রবন্ধ)

৫। হীনযান ও মহাযান

৬। মহাযান কোথা হইতে আসিল ?

হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা

৭। সহজযান

৮। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপাত

৯। বৌদ্ধধর্ম্ম কোথায় গেল ?

১০। এখনও একটু আছে

১১। উড়িষ্যার জঙ্গলে

১২। জাতক ও অবদান

১৩। দলাদলি

১৪। মহাসঙ্ঘিক মত

১৫। থেরবাদ ও মহাসঙ্ঘিক

১৬। মানুষ ও রাজা

বিজয়া

অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ

প্রাচী

১। ডাক ও খনা

২। বিদ্যাপতি

৩। ব্রাত্য

৪। পালবংশের রাজত্বকালে বাঙ্গালার অবস্থা

নবযুগ

১। কয়টী তারিখ

Journal of the Asiatic Society of Bengal

এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে ১৮৯০ খ্রীঃ হইতে ১৯২৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি বাহির হয়,—

১৯। On a manuscript of the Astasāhasrikā Prajñāpāramitā written in Nālandā and discovered in Nepal.

২০। Scientific attainments of Pandit Vishnu Prasad Rajbhandari.

২১। On a Turquoise Ganesa.

২২। On the manuscript of a work on the biography of one of the Pāla Kings of Magadha, Rāma Pāla (the Rāmacarita by Sandhyākara Nandi).

২৩। On a manuscript of Kulālikāmnāya, a Tantric work in Gupta characters of the 7th century.

২৪। On a supplement of the celebrated lexicon Amarakosa by a Buddhist author in very ancient Bengali Character.

২৫। Antiquities of the Tantras and the introduction of Tantric rites in Buddhism.

২৬। On the authenticity of the two newly discovered manuscripts of the Vāllala-carita by Ananda Bhatta, and their importance in tracing the history of the caste-system in Bengal.

২৭। A note on the existence of the Magii (Median Priesthood) in India at the present day.

২৮। Bābhan.

২৯। Dhalai Chandī, a form of tree-worship.

৩০। On the organisation of caste by Vallāla Sena.

৩১। For inscriptions of Mahāsiva Gupta and Mahābhāvagupta of Kalinga and Kosala.

৩২। The identification of Rāmagiri the starting point of the cloud in the Cloud-messenger of Kālidāsa with Rāmgad hill in the Sirguja State.

৩৩। Obituary notice of the Late Professor E. B. Cowell.

৩৪। Scientific attainments of Dr. Ramkrishna Gopal Bhandarkar.

৩৫। History of Nyāya-sāstra from Japanese sources.

৩৬। An examination of the Nyāyasūtra.

৩৭। A Kharosthi copper-plate inscription from Taxila.

৩৮। A new manuscript of the Buddhacarita.

৩৯। The recovery of a lost epic by Asvaghosa.

৪০। The origin of the Indian Drama.

৪১। Causes of the dismemberment of the Maurya Empire.

৪২। A refutation of Max Mueller's theory of the renaissance of Sanskrit Literature in the 4th century A. D. after a lull of seven centuries from the time of the rise of Buddhism.

৪৩। The Bhāsāpariccheda.

৪৪। Discovery of Abhisamayālamkāra by Maitreya Nātha.

৪৫। The Rāmacarita by Sandhyākara Nandi.

৪৬। Notes on the newly found manuscript of Chatussatikā by Āryadeva.

৪৭। The Bardic Chronicles.

৪৮। Who were the Sungas ?

৪৯। A note on Bhatti.

৫০। Theories to explain the origin of the Visen family of Majhawali.

৫১। Exhibition of the genealogical tree of the Rathor family and of a photograph of Sihoji the founder of the family.

৫২। Exhibition of some manuscripts of the 12th century.

৫৩। Relics of the worship of Mud Turtles (Trionichidæ) in India and Burma, with a note by H. E. Stapleton on the Chittagong Turtles.

৫৪। Obituary notice of the late Pandit Vishnu Prasad Rajbhandari.

৫৫। Literary attainments of Bada Kaji Marichiman Sinha.

৫৬। Chatussatikā by Aryadeva.

৫৭। Annual Address (A. S. B.).

৮৫। Annual Address (A. S. B.).

৫৯। Lord Curzon (Obituary Notice).
৬০। Sir R. G. Bhandarkar (").
৬১। Manomohan Ganguli (").
৬২। Sir Alfred Croft (").
৬৩। F. E. Pargiter (").
৬৪। Rigveda in the making.

Calcutta Review

১। Bengali Buddhist Literature.
২। Topography of Govinda Dāsa's Diary
৩। The Review of Vernacular Literature.

Dacca Review

১। The works of Bhāsa.
২। Buddhists in Bengal.

Indian Antiquary

১। Sāntideva, 1913.
২। Dakshini Pandits at Benares, 1912.
৩। King Chandra of the Meherauli Iron Pillar Inscription, 1913.
৪। Mandasore Inscription of the time of Naravarman.

Epigraphia Indica

১। Mandasore Inscription of Naravarman.
২। Susunia Inscription of Chandravarman.

Bihar and Orissa Research Society's Journal

১। The Search of Manuscripts.
২। Kālidāsa—his home.
৩। Kālidāsa.—his age.

৪। Kālidāsa—His education, and the chronology of his works.

৫। Seven Copper Plates from Dhenkanal.

৬। Reply to B. C. Mazumdar's note on 'Kalidasa—his age'.

৭। Chronology of the works of Kālidās.

৮। Tezpur Rock Inscription.

৯। Pumsavana ceremony.

১০। Gazetteer Literature in Sanskrit.

১১। Grant of Ranastambhadeva.

১২। Khandadeuli Inscriptions of Ranabhañja Deva.

১৩। Tekkali Inscriptions of Madhyamarāja, the son of Petavyālloparāja.

১৪। Literary history of the Pāla period.

১৫। Two eternal cities in the province of Bihar and Orissa.

১৬। Contribution of Bengal to Hindu Civilization.

১৭। Two Copper-plates from the State of Bonai.

১৮। Chaturangam.

১৯। Chronology of the Nyāya system.

২০। Chronology of the Sāmkhya Literature.

২১। The Mahā-purānas.

Bhandarkar Commemoration Volume

১। Bombay in the eleventh century.

Buddhistic Studies

১। Chips from a Buddhist workshop.

The Indian Historical Quarterly

১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত Indian Historical Quarterly তে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি বাহির হয়,—

১। The Northern Buddhism—(in three issues).

২। Bhadrayāna.

৩। A copper-plate grant of Viśvarūpa Sena of Bengal.

৪। The Malla Era of Vishnupur.

Buddhist Text and Research Society's Journal

১। Notes on the Svayambhū Purāna.

২। Ashta Sāhasrikā, chapter xviii (translation). The Evolution of Sunyatā.

৩। English translation of 'Bhaktisataka' with Sanskrit text.

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী,

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত